সাধারণ বিজ্ঞান

ষষ্ঠ শ্রেণী

सामान्य विज्ञान इयत्ता सहावी (बंगाली माध्यम)

টেলি-মানস হেল্পলাইন

Tele MANAS (Tele Mental Health Assistance and Networking Across States)

(১৪৪১৬ / ১৮০০-৮৯-১৪৪১৬)

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচির অধীনে টেলি-মানস, এই কেন্দ্র সরকার সমর্থিত একটি প্রকল্প, যা মহারাষ্ট্র রাজ্য অক্টোবর ২০২২ থেকে কার্যকর হয়েছে। টেলি-মানস কর্মসূচির মাধ্যমে হেল্পলাইন নম্বর ১৪৪১৬ এ ফোন করে ২৪×৭ বিনামূল্য এবং সবার জন্য মানসিক স্বাস্থ্য পরিসেবা পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে বিভিন্ন মানসিক সমস্যার জন্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। টেলি-মানস হেল্পলাইনে ফোন করার পর যে তথ্য দেওয়া হয় তা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়। তাই শিক্ষার্থীরা নির্ভয়ে তাদের সমস্যা এই হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে জানাতে পারে এবং নিজের সমস্যার জন্য সাহায্য চাইতে পারে। অন্যদেরও সাহায্য নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা যেতে পারে।

মনোদর্পণ

মনোদর্পণ (৮৪৪৮৪৪০৬৩২) এর মাধ্যমে দূরভাষ পরিসেবা জুলাই ২০২০ থেকে শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষাগত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (NCERT) এর মনোদর্পণ কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের মানসিক দিকনির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করা হয়। এই পরিসেবা প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত, সপ্তাহের সব দিন উপলব্ধ। শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকেরা প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ পাওয়ার জন্য এই হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করতে পারে।

প্রস্তুত পাঠ্যপুস্তকটি রাজ্য শিক্ষাগত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, মহারাষ্ট্র, পুণে কর্তৃক পাঠ্যক্রম অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তাদের দ্বারাই পাঠ্যপুস্তকটি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

শাসন নির্ণয় ক্রমাঙ্ক : অভ্যাস - 2116/(প্র.ক্র.43/16) এসডী-4 তারিখ-25.04.2016 অনুযায়ী স্থাপিত করা সমন্বয় সমিতির তারিখ-01.06.2026-এর সভায় এই পাঠ্যপুস্তক শিক্ষাগত বর্ষ 2026–27 থেকে নির্ধারিত করার জন্য মান্যতা দেওয়া হয়েছে।

সাধারণ বিজ্ঞান

ষষ্ঠ শ্রেণী

মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে-411004

ছকের মধ্যে দেওয়া Q.R. Code টি স্মার্টফোন দ্বারা স্ক্যান করলে তোমার কাছে ডিজিটাল পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া উপাদানগুলির সাথে সম্পর্কিত দৃশ্য, শ্রাব্য ও শ্রাব্য-দৃশ্য শিক্ষণ সামগ্রী উপলব্ধ হবে।

First Edition : 2026

© মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে-411004

এই পুস্তকের সর্ব অধিকার মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডলের অধীনে সুরক্ষিত আছে। এই পাঠ্যপুস্তকের কোনো অংশ সঞ্চালক, মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডলের লিখিত অনুমতি ছাড়া উদ্ধৃতি করা যাবে না।

বিজ্ঞান বিষয় সমিতি

প্রা. ব্য. গো. গম্ভীর (অধ্যক্ষ)
ডা. সুলভা বিধাতে, সদস্য
শ্রীমতী অশ্বিনী পাটীল, সদস্য
ডা. সুবর্ণা গায়কবাড়, সদস্য
শ্রী. প্রবীণ শিন্দে, সদস্য
শ্রীমতী মঞ্জিরী পাটীল, সদস্য
শ্রী. গজানন মানকর, সদস্য
শ্রীমতী সুজাতা কেলকর, সদস্য
শ্রী. ময়ূর সাবলে, সদস্য
শ্রীমতী বৈশালী গোসাবী, সদস্য
ডা. প্রাজক্তা খাড়ে, মেঢেকর, সদস্য
শ্রীমতী জরীনা পারকর, সদস্য
শ্রী. প্রশান্ত চিপকর, সদস্য
শ্রীমতী প্রিয়া লাগবণকর, সদস্য
শ্রীমতী সোনাল শাহ, সদস্য
শ্রীমতী সরস্বতী সূর্যবংশী
শ্রীমতী গৌরী দিঘে, নিমন্ত্রিত সদস্য (পাঠ্যক্রম সমন্বয়ক)
শ্রীমতী নিরঙ্কা মুলে, নিমন্ত্রিত সদস্য
ডা. সন্দীপ নিকম, প্র. বিশেষাধিকারী (শাস্ত্র)

কেন্দ্রীয় সমিতি

শ্রীমতী শোভনা ভিডে
শ্রীমতী নিরজা দশপুত্রে
শ্রী প্রকাশ পোতদার
শ্রীমতী নিশ্চলা মন্যাম

সংযোজক

ডা. সন্দীপ নিকম
প্র. বিশেষাধিকারী বিজ্ঞান

গুণমান সমীক্ষক

ডা . পণ্ডিত বিদ্যাসাগর
অ্যাড. শ্রীকান্ত দলবী
ডা . শর্মিষ্ঠা ওক

বাংলা ভাষান্তর সংযোজক

ডা. অলকা পোতদার,
বিশেষাধিকারী, হিন্দী ভাষা (বি.কা.)
শ্রী কৃষ্ণপদ গোপাল বিশ্বাস,
সহায়ক বিশেষাধিকারী, বাংলা ভাষা (বি.কা.)

নির্মিতি

শ্রীমতী মিতালী শিতপ
প্র. মুখ্য নির্মিতি অধিকারী
শ্রী প্রশান্ত হরণে
নির্মিতি অধিকারী

ভাষান্তর বিষয়তজ্ঞ

শ্রী অনিমেশ বিশ্বাস
শ্রী মহাদেব দে
শ্রী রাজেশ সরকার
শ্রী বিজয় মল্লিক

প্রকাশক

শ্রী হেমন্ত বাবর
প্র. নিয়ন্ত্রক
পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী মণ্ডল,
প্রভাদেবী, মুম্বাই-২৫

মুখপৃষ্ঠ ও চিত্রকার : শ্রী. বিবেকানন্দ পাটীল
অক্ষরাঙ্কন-ডিজাইনিঙ্গ : **সমর্থ গ্রাফিক্স্,** নারায়ণ পেঠ, পুণে-30
কাগজ : 70 জী.এস.এম. ক্রিমবোভ
মুদ্রণাদেশ :
মুদ্রক :

ভারতের সংবিধান

উদ্দেশিকা

''আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়,
বিচার, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম
এবং উপাসনার স্বাধীনতা,
সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন
ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা
এবং তাদের সকলের মধ্যে

ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য
ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে
তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব

গড়ে ওঠে তার জন্য

সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে আমাদের গণপরিষদে, আজ ১৯৪৯ সালের ২৬ শে নভেম্বর, (তিথি মাঘ শুক্ল সপ্তমী, সম্বত দুই হাজার ছয় বিক্রমী) এতদ্দারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।''

ভারতের সংবিধান

ভাগ ৪ক

নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য

অনুচ্ছেদ ৫১ ক্র.

মৌলিক কর্তব্য - ভারতের প্রতিটি নাগরিকের এই কর্তব্য থাকবে যে তাকে -

(ক) সংবিধানকে মান্য করতে হবে এবং সংবিধানের আদর্শ, প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে।
(খ) যে সকল মহান আদর্শ দেশের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেগুলিকে পোষণ এবং অনুসরণ করতে হবে।
(গ) ভারতের সার্বভৌমিকতা, ঐক্য এবং সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করতে হবে।
(ঘ) দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবাকার্যে আত্মনিয়োগের জন্য আহুত হলে সাড়া দিতে হবে।
(ঙ) ধর্মগত, ভাষাগত, অঞ্চলগত বা শ্রেণীগত বিভেদের উর্ধ্বে থেকে সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব-বোধকে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং নারীজাতির মর্যাদা হানিকর সকল প্রথাকে পরিহার করতে হবে।
(চ) আমাদের দেশের বহুমুখী সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্যপ্রদান ও সংরক্ষণ করতে হবে।
(ছ) বনভূমি, হ্রদ, নদী, বন্যপ্রাণী-সহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নতি এবং জীবজন্তুর প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ করতে হবে।
(জ) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবিকতাবোধ, অনুসন্ধিৎসা, সংস্কারমূলক মনোভাবের প্রসার ঘটাতে হবে।
(ঝ) জাতীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও হিংসার পথ পরিহার করতে হবে।
(ঞ) সকল ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নতির উৎকর্ষ এবং গতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল কাজে চরম উৎকর্ষের জন্য সচেষ্ট হতে হবে।
(ট) মাতা-পিতা বা অভিভাবকদের ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের প্রত্যেক শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

রাষ্ট্রগীত

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে
ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাত মরাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিষ মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণ মঙ্গলদায়ক জয় হে,
ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে,
জয় জয় জয় জয় হে।।

প্রতিজ্ঞা

ভারত আমার দেশ। সমস্ত ভারতবাসী আমার ভাই-বোন।

আমি আমার দেশকে ভালবাসি। আমার দেশের সমৃদ্ধি এবং বিবিধতায় বিভূষিত পরম্পরার উপর আমার গর্ব।

ওই পরম্পরার সফলতা অনুসারে চলার জন্য আমি সর্বদা ক্ষমতা অর্জন করতে চেষ্টা করবো।

আমি আমার মা-বাবা, গুরুজন এবং বড়দের প্রতি সম্মান ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করবো।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি আমার দেশ ও দেশবাসীর প্রতি নিষ্ঠাবান থাকবো। তাদের কল্যাণ এবং সমৃদ্ধিতেই আমার সুখ নিহিত।

राज्यगीत

जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा ।।धृ।।

भिती न आम्हा तुझी मुळी ही गडगडणाऱ्या नभा
अस्मानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिभा
सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिव शंभू राजा
दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा ।।१।।

काळ्या छातीवरी कोरली, अभिमानाची लेणी
पोलादी मनगटे खेळती, खेळ जीवघेणी
दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला
निढळाच्या घामाने भिजला
देश गौरवासाठी झिजला
दिल्लीचे ही तख्त राखितो, महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा ।।२।।

প্রস্তাবনা

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর অনুসরণে প্রস্তুতকৃত রাজ্য পাঠ্যক্রম কাঠামো (স্কুল শিক্ষা) এবং তার উপর ভিত্তি করে স্কুল শিক্ষা পাঠ্যক্রম ২০২৫, ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা হবে। শিক্ষার্থীরা ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে সাধারণ বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে বিজ্ঞান বিষয়টি স্বতন্ত্রভাবে অধ্যয়ন করতে পারবে। এই বিষয়ের পূর্বপ্রস্তুতি তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত 'আমাদের চারপাশের জগৎ : ভাগ-১' পাঠ্যপুস্তক থেকে হয়েছে। সেই অনুযায়ী ষষ্ঠ শ্রেণীর বর্তমান পাঠ্যপুস্তকটি তৈরী করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ শিক্ষার সামগ্রিক কাঠামোতে বড়ো পরিবর্তন এনেছে। শিক্ষা মানে শুধু তথ্য সংগ্রহ নয়, বরং কীভাবে চিন্তা করতে হয় তা শেখানোর মাধ্যম হওয়া উচিত, এটাই এই নীতির মূল কথা। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ অনুসারে শিক্ষকের ভূমিকা, তথ্য দেওয়ার চেয়ে সহায়ক হিসেবে বেশি। অর্থপূর্ণ বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য শ্রেণীকক্ষে আলোচনায় উৎসাহ দেওয়া, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিভিন্ন প্রয়োগ ও কৃতিতে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব দেওয়া এবং বিজ্ঞানকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করা প্রয়োজন।

বিজ্ঞানের সংজ্ঞা মুখস্থ করার চেয়ে 'ভেবে দেখো', 'করে দেখো', 'পর্যবেক্ষণ করো', 'চিন্তা করো'-এর মতো কৃতি শিক্ষার্থীদের জ্ঞানগ্রহণ ও আনন্দের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়নের জন্য ভার বা বোঝা তা নয়, বরং তাদের চারপাশের জগতের রহস্য উন্মোচনের একটি চাবিকাঠি। শিক্ষার্থীদের মনের শব্দ ও প্রশ্ন বিজ্ঞানের জন্য প্রয়োজনীয়। তাই ভয় না পেয়ে মনের প্রশ্ন, সন্দেহ-শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করা উচিত। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দেওয়া হোক। জলবায়ু পরিবর্তন, শাশ্বত উন্নয়ন, আধুনিক প্রযুক্তিতে পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন করে তোলার মতো অধ্যায় এই পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিজ্ঞান বিষয়ের সঙ্গে ভূগোল, ইতিহাস, গণিত ও দৈনন্দিন জীবনের সম্পর্ক কীভাবে, তা পাঠ্যপুস্তকে সহজভাবে তুলে ধরা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের মনে কৌতূহল জাগানো এবং তাদের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত চিন্তা করার ক্ষমতা বিকাশ করা এই পাঠ্যপুস্তকের প্রধান উদ্দেশ্য। উদ্ভিদ, প্রাণী সম্পর্কিত কৃতি, পর্যবেক্ষণ করার সময় পরিবেশের প্রতি যত্নশীল হওয়া প্রত্যাশিত। তাদের আঘাত না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখা তো আবশ্যকই।

পাঠ্যপুস্তকটি যাতে সর্বোচ্চ নির্ভুল ও মানসম্পন্ন হয়, সেই লক্ষ্যে মহারাষ্ট্রের সকল অঞ্চলের শিক্ষক এবং বিষয় বিশেষজ্ঞদের দিয়ে এই বইটি পর্যালোচনা করানো হয়েছে। তাঁদের পরামর্শ ও মতামত সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করে এই পাঠ্যপুস্তকটিকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক মণ্ডলের বিজ্ঞান বিষয় সমিতি ও চিত্রকারগণ অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে এই পাঠ্যপুস্তকটি তৈরী করেছেন। মণ্ডল সকলের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ!

শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবক এই পাঠ্যপুস্তকটিকে স্বাগত জানাবেন, এই আশা করি।

(অনুরাধা ওক)
সঞ্চালক,
মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও
অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে

পুণে
তারিখ : 01-05-2026
ভারতীয় সৌর : বৈশাখ 11,
শকে 1948, মহারাষ্ট্র দিন

সাধারণ বিজ্ঞান - ষষ্ঠ শ্রেণী

পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য: CG–১ পদার্থের বিশ্ব, তার উপাদান, বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃতি অধ্যয়ন করা।

ক্র.	পাঠ্যক্রমের দক্ষতা	অধ্যয়ন ফলাফল	পৃষ্ঠ সংখ্যা
১	C–১.১ : পর্যবেক্ষণযোগ্য ভৌত গুণধর্ম (যেমন - কঠিন, তরল, গ্যাস, আকার, আয়তন, ঘনত্ব, স্বচ্ছ, অস্বচ্ছ, অর্ধ-স্বচ্ছ, চৌম্বকীয়, অচুম্বকীয়, সুপরিবাহী, কুপরিবাহী) এবং রাসায়নিক ধর্ম (যেমন - বিশুদ্ধ, অশুদ্ধ, অম্ল, ক্ষার, ধাতু, অধাতু, মৌলিক পদার্থ ও যৌগ) এর উপর ভিত্তি করে পদার্থের শ্রেণীবিভাগ করে।	• বস্তু দ্রব্য দিয়ে তৈরী তা বলে।	৫০, ৫১, ৫৩
		• দ্রব্যের অবস্থা উদাহরণসহ স্পষ্ট করে।	৫১, ৫২, ৫৩
		• বিভিন্ন দ্রব্যের অবস্থা অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করে।	৫২, ৫৩
		• দ্রব্যের আকার এই গুণধর্ম স্পষ্ট করে।	৫১, ৫২, ৫৩
		• আকার অনুসারে দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ করে।	৫১, ৫২, ৫৩
		• দ্রব্যের আয়তন এই বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করে।	৫৪
		• তরল অবস্থায় থাকা পদার্থের পরিমাপকের সাহায্যে আয়তন মাপে।	৫৪
		• দ্রব্যের (পদার্থের) ভর এই গুণধর্ম স্পষ্ট করে।	৫৪
		• দ্রব্যের (পদার্থের) ঘনত্ব এই গুণধর্ম স্পষ্ট করে।	৫৪
		• প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এমন উদাহরণের মাধ্যমে দ্রব্যের অবস্থা স্পষ্ট করে।	৫৩
		• ভিন্ন ঘনত্বের পদার্থের মধ্যে গুণধর্মের খোঁজ করে।	৫৪
		• দ্রব্যের স্বচ্ছতা এই গুণধর্ম স্পষ্ট করে।	৫৫, ৫৬, ৫৭
		• স্বচ্ছতার উপর অন্যান্য উপাদানের প্রভাব বলে।	৫৫, ৫৬, ৫৭
		• দ্রব্যের অস্বচ্ছতা এই গুণধর্ম স্পষ্ট করে।	৫৫, ৫৬, ৫৭
		• দ্রব্যের অর্ধস্বচ্ছতা এই গুণধর্ম স্পষ্ট করে।	৫৫, ৫৬, ৫৭
		• দ্রব্যের স্বচ্ছতা, অস্বচ্ছতা ও অর্ধস্বচ্ছতা অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করে।	৫৫, ৫৬, ৫৭
		• দ্রব্যের চৌম্বকীয় গুণধর্ম স্পষ্ট করে।	৫৫, ৮৮, ৮৯, ৯১
		• চৌম্বকীয় পদার্থের উদাহরণ দেয়।	৫৫, ৮৯, ৯৩, ৯৪
		• চুম্বকের ব্যবহার করে খেলনা তৈরী করে।	৯৪,৯৫
		• দ্রব্যের অচৌম্বকীয় এই গুণধর্ম স্পষ্ট করে।	৮৮, ৯২
		• দ্রব্যকে চৌম্বকীয় ও অচৌম্বকীয় পদার্থ এই দুই ভাগে শ্রেণীবিভাগ করে।	৯৩
		• বিভিন্ন ক্ষেত্রে চৌম্বকীয় পদার্থের নতুন ধরনের ব্যবহার স্পষ্ট করে।	৮৮
		• শস্য বাছাই করার পদ্ধতি বলে।	২২, ২৩, ২৮, ২৯
		• শস্য ঝাড়াই করার পদ্ধতি স্পষ্ট করে।	২২, ২৮, ২৯
		• শস্য চালার পদ্ধতি স্পষ্ট করে।	২৩, ২৮, ২৯
		• সমুদ্রের জল থেকে লবণ আলাদা করার পদ্ধতি বলে। অবসাদন ও পরিস্রবণ এই পৃথকীকরণের পদ্ধতি স্পষ্ট করে।	২৬, ২৮, ২৯
		• অবসাদন ও বাছাই নেওয়া এই পৃথকীকরণ পদ্ধতিগুলি ব্যাখ্যা করে পদ্ধতি স্পষ্ট করে।	২৫, ২৯
		• পরিস্রবণ পদ্ধতি স্পষ্ট করে।	২৪, ২৮, ২৯
		• দই মন্থনের পদ্ধতি স্পষ্ট করে।	২৫
		• চৌম্বকীয় পৃথকীকরণ পদ্ধতি স্পষ্ট করে।	২৬, ২৭, ২৮, ২৯
২	C–১.৩ : পারিমাপের গুরুত্ব স্পষ্ট করে এবং দ্রব্যের ভৌত গুণধর্মের পারিমাপ করে (উদাহরণস্বরূপ, আয়তন, ওজন, তাপমাত্রা, ঘনত্ব)। তাছাড়া পরিমাপের জন্য পারস্পরিক অপ্রমাণিত ও প্রমাণিত সহজ উপকরণগুলির ব্যবহার করে।	• দ্রব্যের ভৌত গুণধর্ম বলে।	৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৭,
		• প্রচলিত ও অপ্রমাণিত পদ্ধতিতে বস্তুর দৈর্ঘ্য মাপে।	১০, ১১
		• প্রমাণিত পদ্ধতিতে বস্তুর দৈর্ঘ্য মাপে।	১১, ১২, ১৩, ১৪
		• থার্মোমিটার ব্যবহার করে তাপমাত্রা মাপে।	১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০
		• থার্মোমিটারের গঠন ব্যাখ্যা করে।	১৫, ১৬, ১৭, ২০
		• থার্মোমিটারের প্রতিরূপ তৈরী করে।	২০
		• থার্মোমিটারের প্রকারগুলো বলে।	১৫, ১৬, ১৭, ১৮
		• থার্মোমিটার পঠন করে।	১৬, ১৭, ২০
		• প্রদত্ত পদার্থের তাপমাত্রা মাপে।	১৮
		• প্রদত্ত বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রমাণিত পদ্ধতি দ্বারা পরিমাপ করে।	১১, ১২, ১৩, ১৪
		• ভারতীয় আবহাওয়া বৈজ্ঞানিকদের যোগদান ব্যাখ্যা করে।	১৮

৩	C- ১.৪ : চাপ, তাপমাত্রা ও ঘনত্বের মধ্যে পার্থক্যের কারণে ঘটিত প্রভাবগুলির পর্যবেক্ষণ ও ব্যাখ্যা করে। (উদাহরণস্বরূপ: শ্বাস-প্রশ্বাস, ডোবা, ভাসা, বাড়ির জলের পাম্প, বস্তু ঠান্ডা হওয়া, পবন সৃষ্টি)	• বল এই ধারণাটি স্পষ্ট করে।	৯৬
		• বলের প্রকারভেদ স্পষ্ট করে।	৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১
		• চাপ ও চাপের একক স্পষ্ট করে।	১০১, ১০২, ১০৪
		• বায়ুমণ্ডলীয় চাপের ধারণা স্পষ্ট করে।	১০২, ১০৪

পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য: CG-২ : বৈজ্ঞানিক এবং গাণিতিক দৃষ্টিতে ভৌত জগতের অভ্যাস করা।

ক্র.	পাঠ্যক্রমের দক্ষতা	অধ্যয়ন ফলাফল	পৃষ্ঠ সংখ্যা
১	C-২.১ : একমাত্রিক গতির (সমগতি, অসমগতি, অনুভূমিক সমান্তরাল, অনুভূমিক লম্ব) ভৌত রাশি ব্যবহার করে (দূরত্ব, সময়, গতি ও গতির পরিবর্তন) গাণিতিক ও চিত্রের ভিত্তিতে বর্ণনা করে।	• গতি এই ধারণাটি স্পষ্ট করে।	১০৬, ১০৭
		• একরৈখিক গতি এই ধারণাটি বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্ট করে।	১০৭, ১১০
		• অরৈখিক গতি এই ধারণাটি বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্ট করে।	১০৮, ১১০,১১১
		• বৃত্তাকার গতি এই ধারণাটির বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে বর্ণনা করে।	১০৮, ১১১
		• দোলন গতি এই ধারণাটি বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্ট করে।	১০৮, ১১০
		• চারপাশে দেখা যায় এমন গতির বিভিন্ন প্রকারের শ্রেণীবিভাগ করে।	১০৮, ১১১
২	C-২.৩ : চুম্বকের বিভিন্ন গুণধর্মের বর্ণনা করে। (প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম, পৃথিবী একটি চুম্বক)	• চুম্বক আবিষ্কারের ইতিহাস বলে।	৯১
		• চুম্বকের প্রকার স্পষ্ট করে।	৯০
		• দৈনন্দিন জীবনে চুম্বকের ব্যবহার বলে।	৮৯
		• চুম্বকের গুণধর্ম বলে।	৯০
		• চুম্বকের গুণধর্মের অধ্যয়ন করে।	৯০
		• চুম্বকের গুণধর্মের যাচাই সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে করে।	৯০,৯১
৩	C -২.৪ বিভিন্ন উৎস থেকে আলোর সরলরৈখিক বিস্তার (উদাহরণস্বরূপ, প্রাকৃতিক, কৃত্রিম ও প্রতিফলক পৃষ্ঠ) আলোর বিভিন্ন উৎস ও বস্তু নিয়ে হাতেকলমে পরীক্ষার মাধ্যমে আলোর প্রতিফলনের নিয়ম যাচাই করে। (উদা. সমতল ও বক্র দর্পণ, সূচিছিদ্র ক্যামেরা, ক্যালাইডোস্কোপ, পেরিস্কোপ ইত্যাদি।)	• আলোর ধারণাটি স্পষ্ট করে।	৫৮, ৫৯
		• পরীক্ষার মাধ্যমে আলোর সরলরৈখিক গমন যাচাই করে।	৫৯, ৬০, ৬৪
		• সুচিছিদ্র ক্যামেরার গঠন স্পষ্ট করে।	৬০, ৬১, ৬২
		• আলোর প্রতিফলনের ধারণাটি স্পষ্ট করে।	৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫
		• আলোর প্রতিফলনের প্রকারভেদ (নিয়মিত, বিক্ষিপ্ত) সহজ কৃতির মাধ্যমে স্পষ্ট করে।	৬২
		• সমতল দর্পণ থেকে আলোর প্রতিফলন ও তার নিয়মাবলি অধ্যয়ন করে।	
৪	C -২.৫ : সাধারণ দূরবীণ এবং প্রতিমা/ছায়াচিত্রের ব্যবহার করে রাতের আকাশের মহাজাগতিক বস্তুসমূহের (তারা, গ্রহ, প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উপগ্রহ, নক্ষত্রপুঞ্জ, ধূমকেতু) পর্যবেক্ষণ করে এবং চিনে নেয়। দিকনির্দেশক, দিনপঞ্জি ও অন্যান্য ঘটনায় এগুলোর ভূমিকা (উদা. চাঁদের কলা, গ্রহণ, পৃথিবীতে জীবন) স্পষ্ট করে।	• মহাকাশের ধারণাটি স্পষ্ট করে।	৬৭, ৬৮
		• সাধারণ দূরবীন ব্যবহার করে মহাকাশের জ্যোতিষ্কগুলির (তারা, গ্রহ, প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উপগ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু ইত্যাদি) পর্যবেক্ষণ করে।	
		• আকাশের জ্যোতিষ্কগুলির তথ্য বলে।	৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৭
		• আকাশ পর্যবেক্ষণ এবং জ্যোতিষ্কগুলির অধ্যয়নের মাধ্যমে সমাজের কুসংস্কার ও ভুল ধারণা দূর করে।	৭৩
		• ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অবদান স্পষ্ট করে।	৭৪

পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য: CG-৩ : সজীবসৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ধারণার মাধ্যমে অনুসন্ধান করা।

ক্র.	পাঠ্যক্রমের দক্ষতা	অধ্যয়ন ফলাফল	পৃষ্ঠ সংখ্যা
১	C-৩.১ : আশেপাশের পরিবেশের জীবসমূহের (কীটপতঙ্গ, কেঁচো, শামুক, পাখি, স্তন্যপায়ী প্রাণী, সরীসৃপ প্রাণী, মাকড়সা, বিভিন্ন উদ্ভিদ ও ছত্রাক) এবং অন্যান্য অণুজীবসহ বৈচিত্র্যের বর্ণনা করে।	• পরিবেশের উদ্ভিদ ও প্রাণী চিনে নেয়।	৩০, ৩১, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭
		• উচ্চতা, কাণ্ডের স্বরূপ, পাতার আকার, রং ও গন্ধ অনুযায়ী উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ করে।	৩০, ৩১, ৩২
		• উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাম বলে।	৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪
		• উদ্ভিদের পাতার শিরাবিন্যাসের প্রকার বলে।	৩৩, ৩৪
		• উদ্ভিদের মূলের পার্থক্য বলে।	৩৪, ৩৫
		• উদ্ভিদের কাণ্ডের পার্থক্য বলে।	৩১
		• উদ্ভিদের একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী বীজ চেনে।	৩৩, ৩৯
		• অধিবাস অনুযায়ী প্রাণীদের উদাহরণ দেয়।	৩৬, ৩৭, ৩৯
		• জলে পাওয়া যায় এমন প্রাণীদের নাম বলে।	৩৭
		• স্থলে উপরে ও গর্তে বাস করে এমন প্রাণীদের নাম বলে।	৩৭, ৩৮, ৩৯
		• স্থলে ও জলে উভয় জায়গাতেই বাস করতে পারে এমন প্রাণীদের নাম বলে।	৩৭, ৩৮

২	C-৩.২ : পুষ্টির প্রয়োজন, বৃদ্ধি ও বিকাশ, শ্বাসক্রিয়ার প্রয়োজন, উদ্দীপকে সাড়া দেওয়া, প্রজনন, রেচন, কোষীয় গঠন - এই বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে সজীব ও নির্জীবের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করে।	• সজীবদের বৈশিষ্ট্য পুষ্টির প্রয়োজন, বৃদ্ধি, বিকাশ, চলন, শ্বসন, রেচন, প্রজনন, চেতনা ক্ষমতা, কোষীয় গঠন বুঝতে পারে।	১ থেকে ৯
		• ভারতীয় বিজ্ঞানীদের উদ্ভিদের চেতনার প্রতি সাড়া দেওয়ার বিষয়ে অবদান স্পষ্ট করে।	৬
		• সজীব ও নির্জীবের মধ্যে পার্থক্য লক্ষণ অনুসারে বুঝতে পারে।	১, ২, ৯
		• চারপাশের বস্তুগুলোকে সজীব ও নির্জীব এইভাবে শ্রেণীবদ্ধ করে।	১, ২, ৯
		• উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর গুরুত্ব বলে।	৪
		• উদ্ভিদের বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ করে দেখে।	৬
		• মশা ও ব্যাঙের জীবনচক্র বুঝতে পারে।	৭
		• মশা ও ব্যাঙের জীবনচক্র অধ্যয়ন করে।	৭
৩	C-৩.৩ : জীবজগৎ ও আশেপাশের পরিবেশ কীভাবে একে অপরের উপর নির্ভরশীল এবং একে অপরকে কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেয়, সেই পারস্পরিক সম্পর্কগুলো বিশ্লেষণ করে।	• প্রাকৃতিক সম্পদের ধারণা স্পষ্ট করে।	১১২, ১১৩,১২২
		• মাটির ধারণা স্পষ্ট করে।	১১২, ১১৩
		• মাটি থেকে বিভিন্ন জিনিস তৈরী করে।	১২২
		• মাটির প্রকার অনুসারে বিভিন্ন গুণধর্মের অধ্যয়ন করে।	১১৩
		• প্রাকৃতিক সম্পদ: জলজ জীব সৃষ্টির দৃষ্টিতে গুরুত্ব স্পষ্ট করে।	১১৪, ১২২
		• প্রাকৃতিক সম্পদ: সৌরশক্তির দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার স্পষ্ট করে।	১১৬, ১২২
		• সৌরশক্তি-ভিত্তিক ছোট খেলনা তৈরী করে।	১২২
		• প্রাকৃতিক সম্পদ বায়ু-র ধারণা স্পষ্ট করে।	১১৭
		• জীবাশ্ম জ্বালানির ধারণা স্পষ্ট করে।	১১৮, ১১৯, ১২০, ১২২
		• জীবাশ্ম জ্বালানির বিভিন্ন প্রকারের উদাহরণ দেয়।	১১৯
		• জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ার ভীতিজনক সংকট স্পষ্ট করে	১১৯, ১২২
		• দৈনন্দিন জীবনের বনজ উৎপাদনের তথ্য বলে।	১১৭, ১১৮, ১২২
		• পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বৃক্ষরোপণ ও বনের সংরক্ষণের গুরুত্ব স্পষ্ট করে।	১২২
		• ঔষধি বনস্পতি থেকে তৈরী পণ্যের তথ্য জানায়।	১১৮, ১২২
		• ভারতীয় শাস্ত্রজ্ঞ মহর্ষি চরকের অবদান স্পষ্ট করে।	১১৮
		• ঋগ্বেদের ঋত ধারণার ভিত্তিতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বুঝে নেয়।	৮২
		• দৈনন্দিন জীবনে সামুদ্রিক সম্পদের গুরুত্ব ও ব্যবহার বলে।	১১৫, ১১৬
		• প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক স্পষ্ট করে।	১১৪
		• উপলব্ধ সম্পদকে নবীকরণযোগ্য, অনবীকরণযোগ্য ও শাশ্বত প্রকারে শ্রেণীবিভাগ করে।	১২০, ১২১
		• সম্পদের অতি ব্যবহার ও অপচয়ের দুষ্প্রভাব বলে।	১১৯, ১২০, ১২২
		• উপলব্ধ সম্পদের সীমিত উৎস ও সেগুলোর বিবেকপূর্ণ ব্যবহারের প্রয়োজন স্পষ্ট করে।	১১৯
		• বিভিন্ন উদাহরণসহ দুর্যোগ ধারণা স্পষ্ট করে।	৪০
		• দুর্যোগের প্রকার ১) প্রাকৃতিক ও ২) মানবসৃষ্ট দুর্যোগ স্পষ্ট করে।	৪১, ৪৪
		• ভূমিকম্প এই দুর্যোগের পরিণাম স্পষ্ট করে।	৪১, ৪২, ৪৮
		• বন্যা এই দুর্যোগের পরিণাম স্পষ্ট করে।	৪২
		• ঝড় এই দুর্যোগের পরিণাম স্পষ্ট করে।	৪৩
		• দাবানল এই দুর্যোগের পরিণাম স্পষ্ট করে।	৪৩, ৪৮
		• মানবসৃষ্ট দুর্যোগ বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে স্পষ্ট করে।	৪৪
		• যুদ্ধের পরিণাম স্পষ্ট করে।	৪৪
		• শিল্প ও সড়ক দুর্ঘটনার কারণ ও পরিণাম স্পষ্ট করে।	৪৪, ৪৫
		• সাইবার অপরাধ এর অন্তর্গত প্রতারণার উদাহরণ বলে।	৪৪
		• সাইবার অপরাধজনিত প্রতারণা রোধ প্রয়োজনীয় সতর্কতা স্পষ্ট করে।	৪৫
		• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ধারণা স্পষ্ট করে।	৪১
		• দুর্যোগ আসার আগে ও পরে গ্রহণীয় দক্ষতা স্পষ্ট করে।	৪৫
		• প্রাথমিক চিকিৎসা এই ধারণাটি স্পষ্ট করে।	৪৫, ৪৯
		• বাহ্যিক রক্তপাত হলে করণীয় প্রাথমিক চিকিৎসা স্পষ্ট করে।	৪৬
		• পুড়ে গেলে ঝলসে গেলে করণীয় প্রাথমিক চিকিৎসা স্পষ্ট করে।	৪৬, ৪৮
		• উষ্মাঘাত সম্পর্কিত প্রাথমিক চিকিৎসা স্পষ্ট করে।	৪৬, ৪৮
		• সাপে কামড়ানোর ক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসা স্পষ্ট করে।	৪৬
		• কুকুরে কামড়ানোর পরের প্রাথমিক চিকিৎসা স্পষ্ট করে।	৪৬

পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য: CG-4 : সুদৃঢ়, স্বচ্ছতা, নিরোগী ও নিরাময় আরোগ্যের উপাদানগুলোর গুরুত্ব বুঝে নেওয়া।			
ক্র.	পাঠ্যক্রমের দক্ষতা	অধ্যয়ন ফলাফল	পৃষ্ঠ সংখ্যা
১	C-৪.১ : ভারতীয় ও আধুনিক রন্ধন পদ্ধতি ও বর্তমান খাদ্য সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে পুষ্টির মূল্য বুঝে নেয়। সঠিক পুষ্টির স্বাস্থ্যের উপর কী প্রভাব হয় তা স্পষ্ট করে।	• পাককলা এই ধারণাটি স্পষ্ট করে।	৮০
		• ভারতীয় পাককলা পদ্ধতিতে কাল অনুযায়ী যে পরিবর্তনগুলো হয়েছে তার তথ্য দেয়।	৮০, ৮১
		• ঐতিহ্যবাদী ও আধুনিক খাদ্য সংস্কৃতির তুলনা করে।	৮১
		• সুযোগ্য পুষ্টির জন্য সুষম আহারের গুরুত্ব স্পষ্ট করে।	৮৫
		• পুষ্টি এই বিষয় নিয়ে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের বিচার স্পষ্ট করে।	৮৫
২	C-৪.২ : খাদ্যের বৈচিত্র্যের বিভিন্ন দিকগুলো পরীক্ষা করে। (যেমন খাদ্যের উৎস, পুষ্টি উপাদান, আবহাওয়া, আহার ইত্যাদি।)	• দৈনন্দিন আহারের বৈচিত্র্য সম্পর্কে বলে।	৭৮
		• খাবারের বিভিন্ন উপাদান (যেমন: কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, মেদ ইত্যাদি) চিনে নিয়ে তাদের উৎস বলে।	৮০, ৮১
		• খাদ্য উপাদানের কাজ/গুরুত্ব স্পষ্ট করে।	৮০, ৮১, ৮২, ৮৩
		• ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, আয়োডিন, লোহা ইত্যাদির উৎস বলে।	৮২, ৮৩
		• ভিটামিন (এ, বি, সি ও ডি), ক্যালসিয়াম, আয়োডিন, লোহার কাজ স্পষ্ট করে।	৮৪
		• ভিটামিন (এ, বি, সি ও ডি), ক্যালসিয়াম, আয়োডিন, লোহার অভাবে হওয়া রোগ-গুলোর নাম ও লক্ষণ বলে।	৮৩, ৮৪
		• খাবারে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, স্নেহ পদার্থ চেনার পরীক্ষা করে অনুমান বের করে।	৮৪
		• ভারতীয় পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের অবদান স্পষ্ট করে।	৮৫

পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য: CG-৫ : বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সমাজের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক জেনে নেওয়া।			
ক্র.	পাঠ্যক্রমের দক্ষতা	অধ্যয়ন ফলাফল	পৃষ্ঠ সংখ্যা
১	C-৫.১ : মানব জীবনের মান উন্নত করার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কীভাবে সাহায্য করে। (স্বাস্থ্য সেবা, যোগাযোগ, পরিবহন, খাদ্য নিরাপত্তা, আবহাওয়ার পরিবর্তন, উপলব্ধ সম্পদের বিবেকপূর্ণ ব্যবহার, কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যবহার ইত্যাদি।) এছাড়াও ইতিহাসে বিজ্ঞানের ক্ষতিকর ব্যবহার সম্পর্কে তথ্য স্পষ্ট করে।	• মানব জীবনের মান উন্নত করার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কীভাবে সাহায্য করে (স্বাস্থ্যসেবা, উপলব্ধ সম্পদের বিবেকপূর্ণ ব্যবহার ইত্যাদি) বলে।	সর্ব পাঠ্যপুস্তকে একাত্মিক ভাবে অন্তর্ভুক্ত
২	C-৫.২ : বিজ্ঞানপ্রযুক্তি এবং সমাজের একে অপরের উপর প্রভাব, এই বিষয়ে সংবাদ ও প্রবন্ধের উপর মতামত প্রকাশ করে।	• ইতিহাসে বিজ্ঞানের ক্ষতিকর ব্যবহার সম্পর্কে তথ্য স্পষ্ট করে।	সর্ব পাঠ্যপুস্তকে একাত্মিক ভাবে অন্তর্ভুক্ত

পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য: CG-৬ : বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এই প্রক্রিয়ার বিবর্তন অনুসারে বিজ্ঞানের স্বরূপ ও প্রক্রিয়া বুঝে নেওয়া।			
ক্র.	পাঠ্যক্রমের দক্ষতা	অধ্যয়ন ফলাফল	পৃষ্ঠ সংখ্যা
১	C-৬.১ : বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং কল্পনা সময়ের সাথে সাথে কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা স্পষ্ট করে। (উদা. বস্তু ও গ্রহগুলির গতির বর্ণনা, জীবজগতের সৃষ্টি, গ্রহের সংখ্যা ইত্যাদি) বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিবর্তনের মধ্যে সমান ও অন্তর্ভুক্ত থাকা মূল্যবোধগুলি জেনে নেয়। (বৈজ্ঞানিক মনোভাব, জীববৈচিত্র্য এবং বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ, বিজ্ঞান একটি সমন্বিত প্রচেষ্টা।)	• বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং কল্পনা সময়ের সাথে কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা স্পষ্ট করে।	সর্ব পাঠ্যপুস্তকে একাত্মিক ভাবে অন্তর্ভুক্ত

২	C–৬.২ : কোনো ঘটনার আকৃতিকাঠামো অথবা বস্তুর মধ্যে পরিবর্তন শনাক্ত করার জন্য বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যবহার করে সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক উদাহরণ ব্যবহার করে তথ্য সংকলন করে (প্রাকৃতিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, সহজ পরীক্ষার নকশা তৈরী করা বা সহজ বৈজ্ঞানিক উপকরণের ব্যবহার করে)।	• বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় তথ্য সংগ্রহ করার জন্য মৌলিক বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম এবং উপকরণ কার্যকরভাবে ব্যবহার করে।	৬, ১২, ১৩, ১৪,১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ৮৮, ৮৯,১১৫, ১১৬, ১১৭

পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য: CG–৭ : বিজ্ঞান-সম্পর্কিত প্রশ্ন, পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত বিষয়ে যোগাযোগ স্থাপন।

ক্র.	পাঠ্যক্রমের দক্ষতা	অধ্যয়ন ফলাফল	পৃষ্ঠ সংখ্যা
১	C–৭.১ : মৌখিক, লিখিত ও দৃশ্য মাধ্যমে বিজ্ঞানের ধারণাগুলো নির্ভুলভাবে বলার জন্য বৈজ্ঞানিক শব্দভাণ্ডার ব্যবহার করে।	• ধারণা, ঘটনা এবং প্রক্রিয়া নির্ভুল ও কার্যকরভাবে স্পষ্ট করার জন্য উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক শব্দভাণ্ডার ব্যবহার করে।	সর্ব পাঠ্যপুস্তকে একাত্মিক ভাবে অন্তর্ভুক্ত
২	C–৭.২ : বৈজ্ঞানিক ধারণার দিকদর্শনের জন্য সাধারণ প্রতিকৃতির রচনা ও নির্মিতি করে।	• বৈজ্ঞানিক ধারণার দিকদর্শন করার জন্য সাধারণ প্রতিকৃতির রচনা ও নির্মিতি করে।	সর্ব পাঠ্যপুস্তকে একাত্মিক ভাবে অন্তর্ভুক্ত

পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য: CG–৮ : ঐতিহাসিক কাল থেকে আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানের সমগ্র ক্ষেত্রে ভারতের অবদান বুঝে নেওয়া এবং সে সম্পর্কে গর্ব বোধ করা।

ক্র.	পাঠ্যক্রমের দক্ষতা	অধ্যয়ন ফলাফল	পৃষ্ঠ সংখ্যা
১	C–৮.১ : একাত্মিক পদ্ধতিতে পাঠ্যক্রমে অধ্যয়ন করা সমস্ত বিষয়ে (ধারণা, ব্যাখ্যা ও পদ্ধতিগুলিতে) ভারতের গুরুত্বপূর্ণ অবদান জেনে নেয় এবং স্পষ্ট করে।		সর্ব পাঠ্যপুস্তকে একাত্মিক ভাবে অন্তর্ভুক্ত

পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য: CG–৯ : বিজ্ঞানের সর্ব ক্ষেত্রে বিকশিত নব নবীন আবিষ্কার, কল্পনা, অনুত্তরিত প্রশ্ন এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতনতা জাগিয়ে তোলা।

ক্র.	পাঠ্যক্রমের দক্ষতা	অধ্যয়ন ফলাফল	পৃষ্ঠ সংখ্যা
১	C–৯.১ : বর্তমান অবস্থায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর বিকাশমূলক অবস্থার অনুরূপ এবং মূর্ত থেকে আত্মস্থ হওয়া ধারণাগুলি বলে।	• বিজ্ঞানের ছোট ছোট উপক্রম করে।	সর্ব পাঠ্যপুস্তকে একাত্মিক ভাবে অন্তর্ভুক্ত
		• বর্তমান পরিস্থিতিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের বিকাশমূলক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং মূর্ত থেকে আত্মস্থ হওয়া ধারণাগুলি বলে।	সর্ব পাঠ্যপুস্তকে একাত্মিক ভাবে অন্তর্ভুক্ত
২	C–৯.২ : পাঠ্যক্রমের কোনো ঘটনা সম্পর্কিত বর্তমান পরিস্থিতির অসম্পূর্ণ তথ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করে।		সর্ব পাঠ্যপুস্তকে একাত্মিক ভাবে অন্তর্ভুক্ত

পাঠ্যপুস্তকের অন্তরঙ্গ... কেমন ? এবং কেন ?

ষষ্ঠ শ্রেণীর এই পাঠ্যপুস্তকটি কেবল শিক্ষার্থীদের জন্য যতটা নতুন, কিছুটা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির শিক্ষকদের ঠিক তেমনি। এটি এমন কোনো পাঠ্যপুস্তক নয়, যার মুদ্রিত বিষয়বস্তু বারবার পড়ে হুবহু মুখস্থ রাখতে হবে। এর ভিন্নতা শুধুমাত্র রং-রূপে সীমাবদ্ধ নয়। উপস্থাপনার ধরন, ভাষা, দক্ষতা বিকাশের প্রচেষ্টা এবং সুযোগ - এই সব দিকের ভিন্নতা এই পাঠ্যপুস্তকে লক্ষ্য করা যাবে। জেনে বুঝে করা এই পরিবর্তনগুলি শিক্ষকদের সার্থক অধ্যাপনে আরও আনন্দ ও সন্তোষ প্রদান করবে।

আমরা ঘটনাস্থলেই উপস্থিত আছি, এমন মনে হবে - এই শৈলীতে প্রসঙ্গবর্ণন, কেউ আমাদের সঙ্গে কথা বলছে, আমাদের অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ নিয়ে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করছে, আমরা অন্যদেরও জানাতে চাই-এমন কোনো আকর্ষণীয়, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানাচ্ছে - এই শৈলীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের প্রতি এবং তার সঙ্গে বিজ্ঞান বিষয়ের প্রতিও আগ্রহ ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। পাঠের তথ্য উপস্থাপনার বিভিন্ন স্থানে **'ভেবে দেখো', 'করে দেখো', 'তোমরা জানো কী ?'**- এই ধরণের শিরোনামযুক্ত অংশ এবং পাঠ্যাংশে উত্তর পাওয়া যাবে না এমন প্রশ্নগুলি কেবল 'স্পিড ব্রেকার' নয়... বরং শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ দক্ষতা, অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য, সেগুলি শব্দবদ্ধ করার ভাষাগত দক্ষতা ইত্যাদির বিকাশের উদ্দেশ্যে জেনে বুঝে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 'বড়ো গাছের আশেপাশে দেখা যায় এমন সজীবদের তালিকা তৈরী করো' - এটি বলার সময় সেই গাছের ডাল, পাতা ফুলে দেখা সজীব, গাছের কাণ্ডের খসখসে ছালের খাঁজে, গাছের নীচে ঝরে পড়া শুকনো পাতার স্তূপে, আশপাশের মাটিতে বসবাসকারী জীবগুলিকেও তালিকাভুক্ত করার উদ্দেশ্য কেবল তালিকাকে দীর্ঘ করা নয়। পর্যবেক্ষণ, কৌতূহল বৃদ্ধি, জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে জ্ঞান এইরূপ বিভিন্ন দিকগুলি সহজে উপলব্ধ করা, অন্যদের চোখে না পড়া 'আমার বিশেষ পর্যবেক্ষণ'- এগুলি কিছু শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত, অন্যদেরকে অনুপ্রাণিত করা অভিজ্ঞতা, বন্ধুদের পর্যবেক্ষণ সম্পর্কিত কৌতূহল এগুলি প্রত্যাশিত অধ্যয়ন ফলাফল অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে। শ্রেণীকক্ষে এই প্রতিটি সুযোগের যথাযথ ব্যবহার শিক্ষকদের জন্যও আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা হয়ে উঠবে।

পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত ছবির শৈলী, অনুশীলনী এবং উপক্রম - এর পেছনে দীর্ঘ অভিজ্ঞতাভিত্তিক বৈজ্ঞানিক চিন্তার ভিত্তি রয়েছে। যেখানে প্রয়োজন, সেখানে শুধু রেখাচিত্র, নিজের সমবয়সী শিক্ষার্থী এবং প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন কৃতিতে অংশগ্রহণের ছবি থেকে 'আমরা এটি করে দেখি'এই উর্মী জাগৃত হবে। বিভিন্ন চিত্র দেখে শিক্ষার্থীদের মুখে হাসি ফুটে উঠবে। ছবি, প্রত্যেক পাঠের শুরুতে আকর্ষণীয় ও কৌতূহলবর্ধক নির্দেশ শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক এবং তার মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রতি দক্ষতা বিকাশের সুযোগ প্রদান করবে পারে। কিছু প্রশ্নের **'একটিই নির্দিষ্ট সঠিক উত্তর' এই গন্ডির বাইরে অনেক প্রশ্ন অনুশীলনীতে রয়েছে। যা - সমান্তরাল, বৈকল্পিক চিন্তা, বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা এবং দক্ষতা বিকাশের বীজ রোপণ করতে উপযোগী।** শিক্ষার্থী প্রত্যাশিত উত্তরের পরিবর্তে ভিন্ন উত্তর নির্বাচন করবে, সে কেনো এমনটি ভাবল তা বোঝার চেষ্টা করলে তার চিন্তার শিক্ষাগত গুরুত্ব ও মূল্য উপলব্ধি করা যাবে। যথার্থ ও ভিন্নধর্মী চিন্তার প্রশংসাও অত্যন্ত কার্যকর 'বুস্টারই' হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রথা, পদ্ধতি, পরিবেশ সম্পর্কে 'তথ্য সংগ্রহ করো' এবং তা শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপনা করো, বা 'বন্ধুদের বলো' - এমন নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। এগুলির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশিত নয়। এর জন্য পর্যাপ্ত সময় এবং পরবর্তী পুনরালোচনা প্রয়োজন।

জাতীয় সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদের বিবেকপূর্ণ ব্যবহার বর্তমান সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ। মূল্যবান পাঠ্যপুস্তক পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে পুনর্ব্যবহারযোগ্য রাখাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাই পাঠ্যপুস্তক ভালো অবস্থায় সংরক্ষণ করতে হবে, এর পৃষ্ঠায় কিছু লেখা, দাগ টানা বা উত্তর পূর্ণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এ বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতন থাকার প্রত্যাশা করা হচ্ছে। অনুশীলনীর উত্তর, উপক্রমের নথিভুক্তকরণ এবং মূল্যায়নের জন্য পৃথক খাতা ব্যবহার করা অধিক সুবিধাজনক হবে।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন বিদ্যার্থীদের ক্ষেত্রে অধ্যয়ন-অধ্যাপন প্রক্রিয়া সম্পাদনের সময় সাংকেতিক চিহ্নের ভাষা (Sign Language) এবং অন্যান্য সহায়ক শিক্ষণ-পদ্ধতি ব্যবহার করবেন। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন বিদ্যার্থীদের যেসব পদ্ধতিতে সম্ভব সেই পদ্ধতিতে নিজেদের প্রকাশ করার সুযোগ প্রদান করবেন।

বিজ্ঞানের পথে নতুন যাত্রা আরম্ভের আন্তরিক শুভেচ্ছা!

সূচীপত্র

অ. ক্র.	পাঠের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১	সজীবের বৈশিষ্ট্য (লক্ষণ)	০১
২	পরিমাপ	১০
৩	এসো, উপাদানগুলি পৃথক করি	২১
৪	সজীবের বৈচিত্র্য	৩০
৫	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	৪০
৬	পদার্থের গুণধর্ম	৫০
৭	আলোর যাত্রা	৫৮
৮	আকাশের ওপারে	৬৬
৯	আহার থেকে স্বাস্থ্যের দিকে	৭৮
১০	চুম্বকের দুনিয়ায়	৮৮
১১	বল এবং চাপ	৯৬
১২	গতি ও গতির প্রকার	১০৬
১৩	প্রাকৃতিক সম্পদ	১১২

১ সজীবের বৈশিষ্ট্য (লক্ষণ)

এ হলো আমাদের মোতি। দুই বছর আগে বাড়িতে এনেছিলাম, তখন সে ছিল ছোট্ট কুকুরছানা। ঠিক মতো দাঁড়াতেও পারত না। তখন তাকে বাটিতে দেওয়া দুধ খেত, অনেক সময় পর্যন্ত ঘুমাতো।

এখন মোতি বড়ো হয়েছে। বল দূরে ছুঁড়ে দিলে দৌড়ে যায়, বল মুখে করে আবার নিয়ে আসে। বিস্কুট উপরে ছুঁড়ে দিলে, লাফিয়ে উপরে উঠে ধরে ফেলে। ঘোরাতে নিয়ে গেলে, সেই আমাকে টেনে নিয়ে যায়।

মোতি বড়ো হয়েছে, কিন্তু তখনকার তার বেল্ট, শিকল, তার খেলনা এসবগুলি যেমন ছিল তেমনই আছে। মোতির মতো সেগুলি বড়ো হয়নি। এমন কেনো হলো ?

ছবিতে অনেক জিনিস দেখা যাচ্ছে। তাদের মধ্যে কার খাবারের প্রয়োজন হয় ? বড়ো হয় না এমন কোন কোন জিনিস ছবিতে দেখানো হয়েছে ? উভয়ের আলাদা তালিকা করো।

বিদ্যালয় বা বাড়ির আশেপাশে থাকা কোনো বড়ো গাছের কাছে যাও। সেখানে দেখতে পাওয়া সমস্ত ছোট-বড়ো সজীবদের একটি তালিকা তৈরী করো।

সেই গাছের কাণ্ড, ডালপালা, পাতা, ফুল এগুলি সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করো। গাছের কাণ্ডের খসখসে ছালের খাঁজে, গাছের নীচের মাটিতে, মাটির নীচে কোন কোন জীব দেখতে পেলে? পাতার ওপরে বা গাছের নীচে পড়া পাতার আবর্জনায় কোনো সজীব আছে কি না, তাও দেখো।

তোমার বন্ধুদের পর্যবেক্ষণের তালিকাগুলি দেখো। সেগুলি থেকে একটি একত্রিত তালিকা তৈরী করো। এই তালিকায় গাছের নীচে জন্মানো ঘাস বা ছোট চারাগাছের নাম আছে কি?

কিছু সজীব অনেক দূর থেকে দেখা যায় এতো বড়ো হয়, আবার কিছু অত্যন্ত ছোট হয়। কিছু তো আবার খালি চোখে দেখাও যায় না, এতটাই ছোট অর্থাৎ সূক্ষ্ম থাকে। সজীব ছোট হোক বা বড়, প্রত্যেক সজীবেরই বাতাস, খাদ্য এবং জলের প্রয়োজন হয়।খাদ্য থেকে তারা শক্তি পায়। খাদ্যের মাধ্যমেই তাদের বৃদ্ধি হয়।

◉ **বৃদ্ধি ও বিকাশ** – সজীবদের বৃদ্ধি হওয়ার অর্থ তাদের শরীরের আকার, উচ্চতা এবং ওজোন বৃদ্ধি হওয়া। শিশু যখন বড়ো হয়, তখন সে হামাগুড়ি দেওয়া, উঠে দাঁড়ানো, হাঁটা, লাফানোর মতো দক্ষতাও শেখে। একেই **'বিকাশ'** বলা হয়। খাদ্যের মাধ্যমে শরীরের যে বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে, তাকে সজীবের 'পুষ্টি' বলা হয়।

সকল সজীবদের বৃদ্ধি হলে ও প্রাণীদের বৃদ্ধি একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত হয় । উদ্ভিদের বৃদ্ধি তারা জীবিত থাকা পর্যন্ত হতে থাকে । প্রাণীদের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বৃদ্ধিদেখা যায়, তবে উদ্ভিদের কিছু কিছু অঙ্গের বৃদ্ধি সারা জীবন ধরে চলতে থাকে । যেমন - কান্ডের পরিধী, ডালপালার দৈর্ঘ্য, মূলের দৈর্ঘ্য, ইত্যাদী । আবার কিছু অঙ্গের বৃদ্ধি সীমিত সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন হয় । যেমন - পাতার আকারের বৃদ্ধি ।

অশ্বত্থ, বট, বাঁশ ও আম গাছের বৃদ্ধিতে কী কী পার্থক্য দেখা যায় তার তথ্য প্রাপ্ত করো ।

উদ্ভিদ সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার দ্বারা নিজের খাদ্য নিজেই তৈরী করে । প্রাণীরা খাদ্যের জন্য অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের উপর নির্ভর থাকে । অন্নগ্রহণ এবং তার ফলে জীবের বৃদ্ধি হওয়া এটি সাজীবদের একটি লক্ষণ ।

তাহলে কী হবে?

- *গাছের ডালে মৌমাছির বড়ো মৌচাক আছে। কিছু ছেলে সেই গাছের নীচে আগুন জ্বালিয়েছে।*
- *মুরগি ও তার ছানারা খাবার খুঁটে খাচ্ছে। সেখানে কাছেই একটি বিড়াল বা সাপ এলো।*
- *শুকনো মাটির ঢিবির একপাশে সামান্য জল ঢালা হলো। জীবন্ত কেঁচোকে ভেজা মাটির কিনারে শুকনো মাটির ওপর রাখা হলো।*
- *বিল্ডিংয়ের পাশের মাঠে এবং তারে অনেক পায়রা বসে আছে। সেখানে হঠাৎ বাজির বিকট শব্দ হলো।*
- *দোলনায় রাখা ছোট শিশুর খিদে পেয়েছে বা তার কাপড় ভিজে গেছে।*
- *পদ্মফুলের কুঁড়িগুলি রাতে বন্ধ ছিল। সূর্য ওঠার পর সেই কুঁড়িগুলির ওপর রোদ পড়ল।*
- *সূর্য ডুবে গেল, অনেক পাখি বাসায় ফিরে এলো। সারারাত গাছে শান্ত হয়ে ঘুমালো। ভোর হলো, পূর্ব দিকের দিগন্তে লালচে আলো দেখা গেলো।*

⦿ চেতনা ক্ষমতা – আমরা আমাদের চারপাশের অনেক প্রাণীর বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আচরণ লক্ষ্য করেছি। মাছি বা মশার মতো ছোট পতঙ্গ হোক বা বড়ো প্রাণী, সকলেই চারপাশের পরিস্থিতি ও ঘটনা সম্পর্কে অবগত থাকে। আলো, অন্ধকার বা আর্দ্রতার কারণে কেঁচোর স্থান পরিবর্তন করা, বিপদের আশংকায় প্রাণীদের আচরণ এইরূপ অনেক পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে আমরা দেখেছি যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান এবং সেই অনুযাই তারা আচরণ করে। সজীবদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কিত জ্ঞানকেই 'চেতনা' বলা হয় এবং এই চেতনা প্রাপ্তির ফলে সজীবের আচরণকে **'সাড়া'** বা **'প্রতিক্রিয়া'** বলা হয়।

বিভিন্ন চেতনায় প্রাণীদের সাড়া সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায়। উদ্ভিদেরও চেতনা ক্ষমতা থাকে। তাদের মূল মাটির নীচে আর্দ্রতার দিকে অধিক বৃদ্ধি পায়, আবার পাতাগুলি পর্যাপ্ত আলো পাওয়ার জন্য শাখা-প্রশাখা সেই অনুযায়ী বৃদ্ধি করে। এছাড়া আবহাওয়ার পরিবর্তন, তাপমাত্রা এবং আঘাত সম্পর্কেও উদ্ভিদ অবগত হয়।

চেতনা এবং প্রতিক্রিয়া কী তা নির্ধারণ করো।

⦿ রেচন – সজীবের দেহে অনেক ক্রিয়া চলতেই থাকে। এই ক্রিয়াগুলির ফলে শরীরে কিছু অপ্রয়োজনীয় পদার্থ তৈরী হয়। এই বর্জ্য পদার্থগুলি শরীর থেকে বাইরে বের করে দেওয়াকে **'রেচন'** বলা হয়। নিঃশ্বাসের মাধ্যমে জলীয় বাষ্প ও কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করা, ঘাম ও মূত্র ত্যাগের মাধ্যমে প্রাণী রেচন করে। উদ্ভিদের অপ্রয়োজনীয় পদার্থগুলি গাছের ছাল বা পুরনো পাতায় জমা হয়, সেই পাতা বা ছাল ঝরে পড়লে উদ্ভিদের রেচন ঘটে। কিছু উদ্ভিদের কাণ্ড আঘাতপ্রাপ্ত হলে সেখান থেকে আঠালো পদার্থ বের হয়, যা শুকিয়ে গেলে আঠা তৈরী হয়। এটিও উদ্ভিদের একটি রেচন প্রক্রিয়া। উদ্ভিদের মূলের মাধ্যমেও কিছু পদার্থের রেচন হয়।

⦿ প্রজনন – প্রত্যেক সজীব তার নিজের মতো অন্য একটি সজীব সৃষ্টি করে, একে **'প্রজনন'** বলে। প্রজনন মানে জন্ম দেওয়া। কিছু প্রাণী ডিম পাড়ে এবং তা থেকে বাচ্চা জন্ম নেয়। কিছু প্রাণীর মাদী সরাসরি বাচ্চার জন্ম দেয়। শরীরের কোনো অংশ খণ্ডিত হলে সেই অংশ থেকে পূর্ণাঙ্গ শরীর তৈরী হতে পারে এমন কিছু সজীবও রয়েছে।

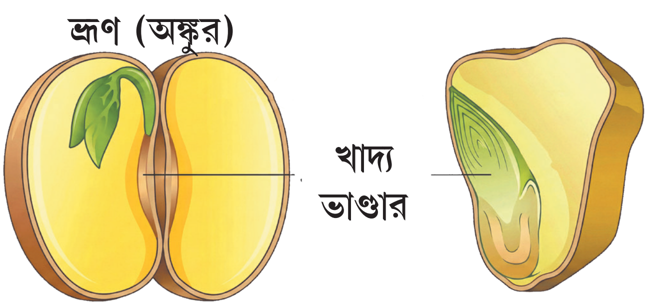

অনেক উদ্ভিদের প্রজনন ঘটে বীজের মাধ্যমে। বীজের ভেতরে একটি ছোট ভ্রূণ (অঙ্কুর) থাকে। বীজ অঙ্কুরিত হলে ভ্রূণ বৃদ্ধি হয়ে ছোট পাতা ও মূলে রূপান্তরিত হয়। বীজ থেকে চারাগাছ তৈরীর এই প্রক্রিয়াকে **'অঙ্কুরোদগম'** বলা হয়। এই বৃদ্ধির জন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয় এবং সেই খাদ্যের ভাণ্ডার বীজের মধ্যেই সঞ্চিত থাকে। শিম, ছোলা বা ডালের মতো বীজের যে দুটি সমান অংশ দেখা যায়, এটাইই হলো খাদ্য ভাণ্ডার। গম বা জোয়ারের মতো বীজেও এমন খাদ্য সঞ্চিত থাকে।

অঙ্কুরিত হওয়া এবং অঙ্কুরোদগম অর্থাৎ উদ্ভিদের বৃদ্ধি আরম্ভ হয়। অঙ্কুরোদগম এবং তারপর উদ্ভিদের ক্রমাগত বৃদ্ধির জন্য আলো, আর্দ্রতা এবং চারপাশে একটু চলাচল করা হাওয়া প্রয়োজন।

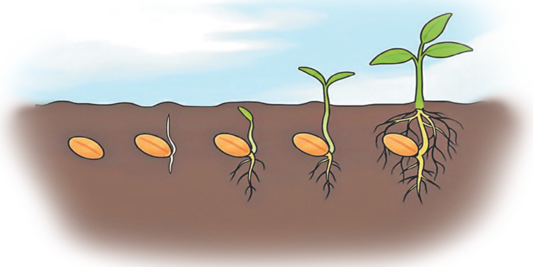

ছোলা, মটকি, মুগের অঙ্কুর বের করার জন্য বাড়িতে কী করা হয় তা পর্যবেক্ষণ করো, তথ্য প্রাপ্ত করো। গোলাপ, বেলি, এই ধরনের উদ্ভিদের চারা কীভাবে তৈরী করে ? তথ্য সংগ্রহ করো, তুমিও এমন চারা তৈরী করো।

বৃদ্ধি এবং প্রজনন হলো সজীবদের প্রধান বৈশিষ্ট্য । সজীব কিংবা নির্জীব নির্ধারণ করার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ।

তোমরা জানো কী ?

অনেক জায়গায় সমুদ্র উপকূলে অনেক দূর পর্যন্ত বালি থাকে। কোকণ অঞ্চলের কিছু সমুদ্র উপকূলের বালিতে ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাসের মধ্যে সামুদ্রিক কচ্ছপ ডিম পাড়ে। অলিভ রিডলে প্রজাতির এই সামুদ্রিক কচ্ছপগুলি বর্তমানে বিরল হয়ে যাচ্ছে। এদের মাদী কচ্ছপ সমুদ্র উপকূলে বালিতে গর্ত খুঁড়ে সেখানে ডিম পাড়ে। সুর্যোদয়ের আলো উপকূলে পড়বে এমন পরিবেশেই এই ডিমগুলি পাড়া হয়।

ডিমের ভেতরে বাচ্চার বৃদ্ধি সম্পন্ন হলে তারা ডিম ফুটে বাইরে বেরিয়ে আসে। ভোরের দিকে প্রায় একই সময়ে শত-শত ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়। এই বাচ্চাদের অল্প সময়ের মধ্যেই সমুদ্রের জলে যাওয়া জরুরি। তা না হলে বাচ্চারা মারা যায়। ভোরের সময় শত-শত ডিম একই সময়ে ফুটে যাওয়া একটি আশ্চর্যজনক বিষয়।

সূর্য ওঠার কিছু সময় আগে পূর্ব আকাশ তামাটে বর্ণের দেখায়। সমুদ্রপৃষ্ঠে এই আলো পড়ার ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠ স্থলভাগের তুলনায় অধিক উজ্জ্বল দেখায়। ডিম থেকে বেরিয়ে আসার সাথে সাথেই প্রতিটি বাচ্চা সেই আলোর অভিমুখে দ্রুত হাঁটতে শুরু করে এবং জলে চলে যায়। এই উপকূলগুলির আশেপাশে রাস্তা তৈরী হওয়ার পর সেখানে বিজলি বাতি লাগানো হয়েছে। তখন থেকে ডিম ফুটে বেরিয়ে আসা বাচ্চারা এই কৃত্রিমআলোর দিকে সমুদ্র থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। বিষয়টি বুঝতে পেরে গ্রামবাসীরা কচ্ছপ জন্মের সময় সমুদ্র উপকূলের ধারের আলোগুলি বন্ধ রাখে এবং উপকূলে পাহারা দিয়ে সমস্ত বাচ্চাদের নিরাপদভাবে সমুদ্র পর্যন্ত যেতে সাহায্য করে। এই সময়ে শত শত গ্রামবাসী ‘কচ্ছপ বন্ধু’ হয়ে ওঠে এবং কিছু গ্রামে ‘কচ্ছপ মহোৎসব’ পালন করা হয়।

- সামুদ্রিক কচ্ছপগুলির জন্য কেনো এই যত্ন নেওয়া হয় ?
- বছরের কোন সময়ে কোকণে কচ্ছপ মহোৎসব কোথায় এবং কখন হয় সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করো।

⦿ শ্বসন – অনেক প্রাণী নাক দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস করে। নাক দিয়ে ফুসফুসে বাতাস নেওয়াকে বলা হয় 'শ্বাস গ্রহণ করা। কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস এবং জলীয় বাষ্প বাইরে বের করে দেওয়াকে বলা হয় 'নিশ্বাস ত্যাগ করা। শ্বাস গ্রহণ এবং নিশ্বাস ত্যাগের এই প্রক্রিয়াটি একের পর এক নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। যেসব প্রাণীর নাক এবং ফুসফুস নেই, তারা অন্য উপায়ে অক্সিজেন গ্রহণ করে।

সজীবের গ্রহণ করা খাদ্য এবং অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় শরীরে শক্তি উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াকে **'শ্বসন'** বলা হয়। কিছু সজীব সরাসরি শ্বাস-প্রশ্বাস না চালালেও তাদের মধ্যেও শ্বসন প্রক্রিয়া চলতে থাকে। উদ্ভিদও সজীব, তাই তাদের কোষেও শ্বসন প্রক্রিয়া চলতে থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাস এবং শ্বসন দুটি ভিন্ন প্রক্রিয়া।

কেঁচো, মাছি, প্রজাপতির মতো প্রাণীদের পর্যবেক্ষণ করো এবং দেখো তারা কীভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস করে।

ভেবে দেখো।

এমন কি কোনো জীব আছে যারা কখনোই নিজেদের স্থান পরিবর্তন করতে পারে না ?

⦿ চলন – উদ্ভিদ নিজে থেকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে না, কিন্তু তাদের চেতন ক্ষমতা রয়েছে। যদি একদিক থেকে সূর্যালোক আসে, তবে ডালপালা সেই দিকেই বেশি বৃদ্ধি পায় । আবার মূলের বৃদ্ধি হয় যেদিকে আর্দ্রতা বা জল থাকে সেদিকে। এর থেকে বোঝা যায় যে, উদ্ভিদও তাদের চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন।

সূর্যাস্তের পর যখন অন্ধকার হতে শুরু করে, তখন কিছু গাছের ডালপালার জোড়া পাতাগুলি হাত জোড় করার মতো বন্ধ হয়ে যায় এবং সকালে সূর্য উঠলে সেগুলি আবার খুলে যায় । এমন কিছু বড়ো গাছ তোমার আশেপাশে কোথায় আছে তা বন্ধুদের সাথে খুঁজে বের করো। উদ্ভিদের ফুলের কুঁড়ি কখন ফোটে ? কুঁড়ি ফোটার সময় পাপড়িগুলি খুলে যায় । এর জন্য সেখানে চলন বা নড়াচড়া প্রয়োজন হয় । উদ্ভিদ নিজের স্থান পরিবর্তন না করলেও সঠিক অভিমুখে মূল, ডালপালার বৃদ্ধি, দিন ও রাতের প্রভাবে পাতার খোলা-বন্ধ হওয়া, কুঁড়ি থেকে ফুল ফোটা এগুলি উদ্ভিদের মধ্যে ঘটিত চলন থাকে।

পাতার অবস্থিতী : দিনে এবং রাতে।

তোমরা জানো কী ?

গাছের শিকড় আর্দ্রতার দিকে বাড়ে এবং ডালপালা আলোর দিকে বাড়ে, এটি অনেক আগে থেকেই সবার জানা ছিল। কিন্তু গাছপালা যে তাপ, ঠান্ডা বা আঘাত অনুভব করতে পারে, সে সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা ছিল না। গাছপালার যে এই ধরনের অনুভূতি হয় এবং সেই সংবেদনা পাঠানোর জন্য তাদের শরীরে যে বিশেষ গঠন থাকে, তা স্যার জগদীশচন্দ্র বোস প্রথম প্রমাণ করেন।

তিনি ছিলেন বিশ্বখ্যাত ভারতীয় পদার্থবিদ এবং উদ্ভিদবিজ্ঞানী। উদ্ভিদের অতি সূক্ষ্ম নড়াচড়া বা চলন, খুব অল্প সময়ে উদ্ভিদের বৃদ্ধি দশ হাজার গুণ স্পষ্টভাবে দেখা যায় এবং পরিমাপ করা যায়, এমন যন্ত্র বোস তৈরী করেছিলেন। লন্ডনের বিজ্ঞানী সভায় তিনি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখান যে উদ্ভিদের ও চেতনক্ষমতা আছে। বিভিন্ন আবিষ্কারের জন্য স্যার জগদীশচন্দ্র বোস অনেক সম্মান লাভ করেন।

- কখনও কখনও কাঁচ বা মাটির পাত্র কিংবা কাঠের জিনিসের গায়ে টোকা লাগে। কোনো অংশের টুকরো ভেঙে যায়। কয়েক দিন পর সেই জিনিসটি কি আবার আগের মতো হয়ে যায় ?
- প্রাণীদের ছোটখাটো ক্ষত সেরে যায়। শরীরের সেই অংশগুলি আগের মতো হয়ে যায়। গাছের কাণ্ড থেকে নতুন মুকুল বের হয়। তা থেকে ডালপালা এবং নতুন পাতা জন্মায়। সেখানে নতুন কোষ তৈরী হতে থাকে।
- হাড়, পেশি, ত্বক এসব বিভিন্ন অংশের কোষের গঠনে কিছু পার্থক্য থাকে।
- সজীবের শরীর কোষ দিয়ে তৈরী। শরীরের প্রতিটি জীবিত কোষের পুষ্টিকর উপাদান এবং অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়।

করে দেখো।

চা, আইসক্রিম দেওয়ার জন্য মোটা কাগজের বা প্লাস্টিকের কাপ ব্যবহার করা হয়। এমন পাঁচ-ছয়টি খালি কাপ অথবা মাটির ছোট গভীর পাত্র জোগাড় করো। ফুলের চারার টবে যে মাটি দেওয়া হয়, সেই মাটি ও সামান্য বালুর মিশ্রণ প্রতিটি পাত্রে ভরো। প্রতিটি পাত্রের মাটিতে এক এক ধরনের দুই-তিনটি বীজ বপন করো। উদাহরণস্বরূপ লাল মরিচ, বেগুন, শিম, টমেটো বা ভুট্টার মতো উদ্ভিদের বীজ। প্রতিদিন সামান্য জল দিয়ে পাত্রের মাটি ভিজিয়ে রাখো।

প্রতিটি পাত্রের বীজ কখন অঙ্কুরিত হলো, তখন পাতা কয়টি, কেমন ছিল সেসব লিখে রাখো এবং ছবি এঁকে রাখো। এরপর প্রতি তৃতীয় দিনে চারার উচ্চতা, পাতার সংখ্যা ও আকার লিখে রাখো। শিম গাছের বীজ মাটিতে রোপণ করলে তার লতা বৃদ্ধি, পাতা এবং শিমের ফলন দীর্ঘ সময় ধরে পর্যবেক্ষণ করা যাবে। এমন লতা লাগিয়ে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করো এবং গাছ থেকে প্রাপ্ত শিম বাড়ির সবাই মিলে আনন্দ করে খাও।

অনেক দিন ধরে পরিষ্কার না করা জলের ট্যাঙ্ক বা সামান্য খোলা থাকা পাত্রে জমে থাকা জলে মাঝে মাঝে মশার লার্ভা দেখা যায়। ঘরের অন্ধকার কোণে যদি জলের পাত্র ঢাকা না দিয়ে রাখা হয়, তবে সেই জলে নিচ থেকে উপরে যাতায়াতকারী ছোট ছোট লার্ভা দেখা যায়। প্রতিদিন লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, কয়েক দিনের মধ্যেই এই লার্ভাগুলি মশায় রূপান্তরিত হচ্ছে। জমা জলের ডোবায় বা পুকুর পাড়ের মতো জায়গায় কেনো এত মশা থাকে ?

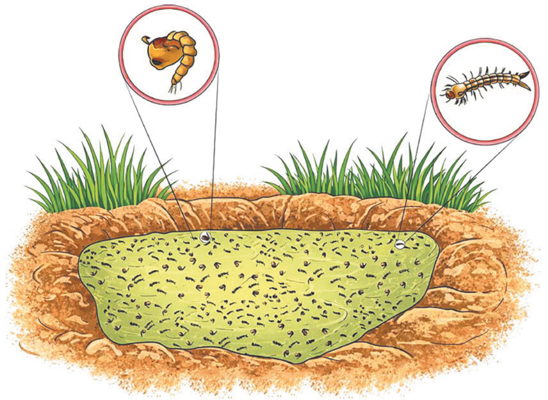

আমরা একটু আলাদা...

গরু, কুকুর, ইঁদুর, আরশোলা এমন অনেক প্রাণীর ছানা তোমরা দেখেছ। মাছ বা পাখির ছানাও হয় তো দেখেছ। কিছু প্রাণীর ছানা ডিম থেকে ফুটে বের হয় আবার কিছু ছানাদের তার মা জন্ম দেয়। এই ছানাগুলি ছোট থাকে, কিন্তু তাদের শরীরের গঠন ও গড়ন অবিকল তাদের বাবা-মায়ের মতোই হয়। বিড়ালের ছানা দেখলেই চেনা যায় যে সেটি বিড়ালেরই বাচ্চা। মহিষ, গরু বা হাতির বাচ্চার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

জন্ম নেওয়া ছানা এবং তাদের বাবা-মায়ের শরীরের মধ্যে অনেক বেশি পার্থক্য থাকে এবং ছানাটি কোন প্রাণীর তা চেনা যায় না এমন কি তুমি কখনও দেখেছ ?

⦿ ব্যাঙের জীবনচক্র – বর্ষাকালের শুরুতে পুকুর পাড়ের জলে থাকা গাছপালার ছোট ডালপালার দিকে লক্ষ্য রাখো। জলের ওপরের অংশে ফেনার মতো ডিমের গুচ্ছ দেখতে পাবে। তার মধ্যে থেকে সামান্য কিছু ডিমসহ সেই ডালটির একটি ছোট অংশ নিয়ে এসো। সেই ডিমগুলি এবং ডালটি একটি বড়ো কাঁচের বয়ামে এমনভাবে রাখো যাতে ডালটি জলের সামান্য উপরে থাকে। সম্ভব হলে ওই পুকুরের জলই ব্যবহার করো। বয়ামের জলে একটি পাতা ফেলে রাখো। এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন তিনবার করে পর্যবেক্ষণ করো। কী দেখলে তার ছবি এঁকে রাখো। প্রতিটি ছবির নীচে সেই দিনের তারিখ লিখতে ভুলো না। বন্ধুদের আঁকা ছবি, পর্যবেক্ষণ করো এবং কত দিন পর কী পরিবর্তন দেখা গিয়েছে, তা নিয়ে একে অপরের সাথে আলোচনা করো।

ডিম ফুটে বের হওয়া ছানাগুলি দেখতে একদম ব্যাঙের মতো হয় না। লম্বাটে লার্ভার মতো দেখতে এই ছানাগুলি বিভিন্ন অবস্থার মাধ্যমে ব্যাঙে রূপান্তরিত হয়। এরা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ফুলকার সাহায্যে শ্বাস নেয়। কিছু সময় এদের শুধু পেছনের দুটি পা এবং একটি লেজ থাকে। এই অবস্থাগুলি বদলাতে বদলাতে অবশেষে তাদের শরীর ব্যাঙের মতো হয়ে ওঠে। এই ধরনের পরিবর্তনকে জীবনচক্র বা অবস্থান্তর বলা হয়। কত দিন পর কী কী পরিবর্তন লক্ষ্য করলে তা লিখে রাখো। বন্ধুদের নোটগুলিও দেখো। পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সময় কি সবার ক্ষেত্রে প্রায় এক, নাকি অনেক পার্থক্য আছে ?

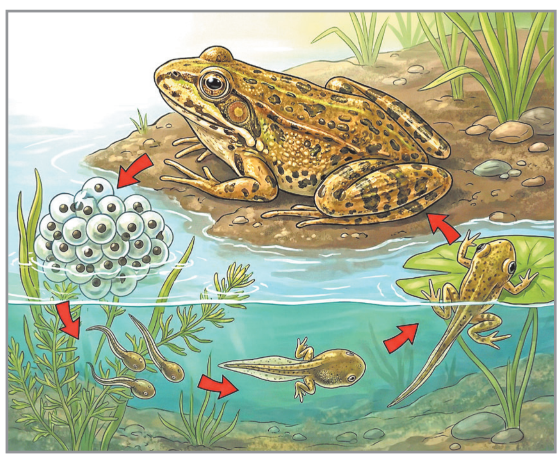

আমরা কী শিখলাম ?

- সজীবদের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র আকার থেকে শুরু করে বিশাল বড়ো শরীর এইরূপ অনেক বৈচিত্র্য দেখা যায়। কিছু জীব এতই ছোট হয় যে তাদের খালি চোখে দেখা যায় না।
- শক্তি এবং বৃদ্ধির জন্য প্রতিটি জীবের খাদ্যের প্রয়োজন হয়। খাদ্যের মাধ্যমেই জীবের শরীরের পুষ্টি হয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর খাদ্য ভিন্ন ভিন্ন হয়, অর্থাৎ তাদের খাদ্যাভ্যাসে বৈচিত্র্য থাকে।
- পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে জীবের সচেতনতা এবং সেই পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদের কৃতি বা প্রতিক্রিয়াকে জীবের চেতনক্ষমতা বলে। সচেতন হওয়া মানে চেতনা, সেই অনুযায়ী তাদের প্রতিক্রিয়া মানে চেতনার প্রতি সাড়া দেওয়া। উদ্ভিদেরও চেতনক্ষমতা থাকে।
- রেচন :

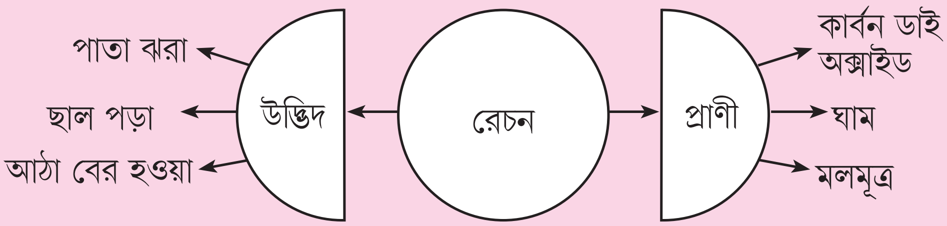

- প্রাণীরা নড়াচড়া করে স্থান পরিবর্তন করতে পারে। উদ্ভিদ নিজে থেকে নিজের স্থান পরিবর্তন করতে পারে না, তবে উদ্ভিদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের চলন বা নড়াচড়া দেখা যায়।
- বীজ অঙ্কুরিত হয়ে নতুন চারাগাছ জন্মানোর প্রক্রিয়াকে অঙ্কুরোদগম বলে।
- বিকাশ, চেতনক্ষমতা, রেচন, শ্বসন, প্রজনন এবং চলন হলো সজীবের লক্ষণ। এর মধ্যে বৃদ্ধি এবং প্রজনন হলো প্রধান লক্ষণ।
- বৃদ্ধির সময় কিছু জীবের শারীরিক গঠনে অনেক পরিবর্তন হয়। এই ধরনের পরিবর্তনকে ওই জীবের জীবনাবস্থা বা জীবনচক্র বলা হয়।

অনুশীলনী

(১) শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ লেখো।

(অ) প্রতিটি সজীব নিজের মতো নতুন সজীব সৃষ্টি করে, একে .... বলে।

(ব) .... এবং .... হলো সজীবের প্রধান লক্ষণ।

(ক) খাদ্যের মাধ্যমে সজীবের বৃদ্ধি এবং বিকাশকে সজীবের .... বলা হয়।

(ড) সজীবের শরীর .... দিয়ে তৈরী।

(২) পাখি, মাছ এবং প্রাণীরা চলাফেরা করে নিজেদের স্থান পরিবর্তন করতে পারে। ঝরা পাতা এবং ট্রাক্টর বা গরুর গাড়ির মতো যানবাহনও তাদের স্থান পরিবর্তন করতে পারে। এই দুই ধরনের চলাফেরার মধ্যে প্রধান পার্থক্য কী ?

(৩) অনেক রোগের জীবাণু অত্যন্ত সূক্ষ্ম থাকে। তাদের খালি চোখে দেখা যায় না এতটাই ছোট থাকে। তোমার কী মনে হয়, এত ক্ষুদ্র সজীবের কি প্রজনন হয় ? এটি কিসের ভিত্তিতে নির্ধারিত করলে তা বলো।

(৪) সজীবদের আশেপাশের পরিবেশ সম্পর্কে চেতনতা থাকে এটি ইঁদুর, বিড়াল ও কুকুরের আচরণের মাধ্যমে স্পষ্ট করো। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তারা কীভাবে আচরণ করে সে সম্পর্কে তোমার অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ লেখো।

(৫) প্রাণীদের চলাফেরার যতগুলি ধরন তোমার জানা আছে এবং সেই পদ্ধতিতে চলাচলকারী প্রাণীদের একটি তালিকা তৈরী করো।

(৬) উদ্ভিদের চেতনা আছে এটি যা থেকে বোঝা যায় এমন তোমার দেখা বা জানা পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতাগুলি লেখো।

(৭) কচ্ছপ দীর্ঘ সময় জলে থাকে। কিছুক্ষণ পর পর তারা জলের উপরে এসে মাথা বের করে। কিন্তু মাছ এমনটা করে না, কেনো ?

(৮) নীচে ব্যাঙের জীবনচক্র উল্টোপাল্টা ক্রমে দেওয়া হয়েছে। সঠিক ক্রম অনুযায়ী সাজানোর জন্য নীচের ছকে সঠিক সংখ্যা লেখো।

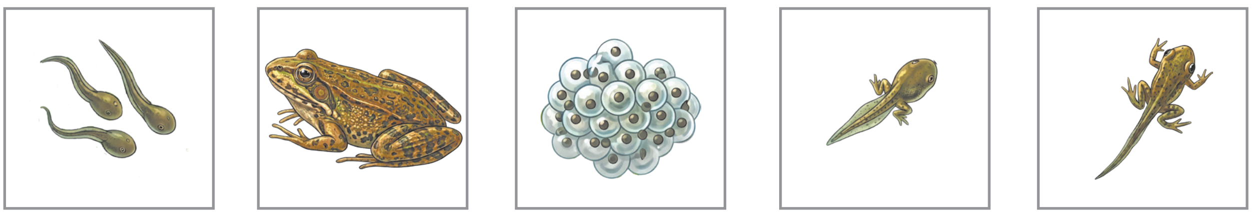

(৯) সজীব ও নির্জীবদের লক্ষণগুলি ভিত্তিতে নীচের উদাহরণগুলিকে সজীব ও নির্জীব এই দুই দলে ভাগ করো।

(পাথর, প্রজাপতি, সাইকেল, বই, মাছ, হাওয়া, গাছ, ঘুড়ি, বাস)

(১০) **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো।**

(অ) খরার সময় পর্যাপ্ত খাদ্য ও জল না পেলে পালিত প্রাণীদের উপর কী প্রভাব পড়ে ?

(আ) বাঘের শাবক বড়ো হয়, তার কি বৃদ্ধি হয় ? উক্তিটি স্পষ্ট করো।

◉ উপক্রম –

প্রাকৃতিক আঠা কোথা থেকে এবং কীভাবে পাওয়া যায় ? এই রূপ আরও কী কী পদার্থ পাওয়া যায় সে বিষয়ে বড়দের সাথে কথা বলে তথ্য প্রাপ্ত করো।

২ পরিমাপ

এই ছবির প্রতিটি ব্যক্তি কিছু না কিছু পরিমাপ করছে। পরিমাপ মানে মেপে নেওয়া। দেখে ঠিক করোতো কে কী পরিমাপ করছে। দুধওয়ালা যখন মাপার পাত্র ভরে দুধ নেয়, তখন ঠিক কিসের পরিমাপ হয়? সামনে কাপড় নিয়ে কাপড় বিক্রেতা টেপ দিয়ে কী মাপছে? হাতের নলির দিকে তাকিয়ে ডাক্তারবাবু কিসের পরিমাপ করছেন? সবজিওয়ালি কিসের পরিমাপ করছে?

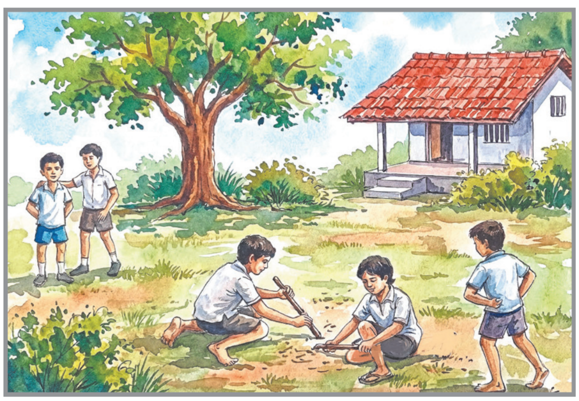

ডাঙ্গুলি খেলায় দূরত্ব মাপার জন্য দুই বন্ধু এল। একজনের হাতে ছিল কিছুটা ছোট কাঠি, আর অন্য জনের কাছে ছিল তার চেয়ে বেশি লম্বা কাঠি। ক্রিকেটের জন্য স্টাম্প থেকে পনেরো কদম দূর থেকে বোলিং করার সিদ্ধান্ত হলো। সামনের দিকের দ্বিতীয় চিহ্নটি কোথায় করা হবে? দুজনেই পনেরো কদম দূরত্ব মাপল। কিন্তু উভয়ের মধ্যে গরমিল দেখা দিল। এই গরমিলের কারণ কী হতে পারে?

তুমি নিজে কোনো টেবিলের বা তোয়ালের দৈর্ঘ্য তোমার বিঘাত বা আঙুলের সাহায্যে মেপে নাও। তোমার বড়ো ভাই-বোন, বাবা-মাকে সেই দৈর্ঘ্যটি মাপতে বলো। সবার পরিমাপ কি সমান হবে ?

আগেকার দিনে দৈর্ঘ্য মাপার জন্য আঙুল, মুষ্টি, হাত, কদম এই ধরনের একক ব্যবহার করা হতো। বয়স, শরীরের গঠন অনুযায়ী ভিন্ন-ভিন্ন ব্যক্তির বিঘাত, হাত, মুষ্টি এই মাপগুলি সমান নয়, তাই এই মাপগুলিও ভিন্ন ভিন্ন হতো। অতয়ব এই পরিমাপকে **'অপ্রমাণিত পরিমাপ'** বলা হয়। এর বিপরীতে, সকলে একটি নির্দিষ্ট এককই যদি ব্যবহার করে,তাহলে ব্যক্তি অনুযায়ী পরিমাপে পার্থক্য হয় না। এই পরিমাপ পদ্ধতিকে **'প্রমাণিত পরিমাপ'** বলা হয়। কাপড়ের দোকান থেকে মিটারপাটি দিয়ে সঠিক পরিমাপ করে এক মিটার কাপড় নিল। ঠাকুরদাদা বাড়িতে পুনরায় সেটিকে পরিমাপ করল। উভয়ের পরিমাপ সমান থাকবে ? না ভিন্ন-ভিন্ন ?

তোমরা জানো কী ?

প্রাচীন মিশরে মানুষের কনুই থেকে মধ্যমা আঙুলের ডগা পর্যন্ত দূরত্বকে দৈর্ঘ্যের একক হিসেবে ব্যবহার করা হতো। একে বলা হতো কিউবিট। যেহেতু ব্যক্তিভেদে এই কিউবিটের মাপ আলাদা হতো, তাই রাজার কিউবিটকেই (Royal Cubit) একক নির্ধারিত করা হয়েছিল।

রোমানদের দ্বারা স্বীকৃত কিউবিট কিছুটা ভিন্ন ছিল। তারা এটিকে দুই ফুটে ভাগ করেছিল। প্রতিটি ফুটকে আবার ১২টি সমান ভাগে ভাগ করা হতো, যাকে বলা হতো ইঞ্চি। দীর্ঘ দূরত্বের জন্য তারা 'মিলি পাসাস' (যার অর্থ এক হাজার কদম) একক ব্যবহার করত। আমরা যাকে মাইল বলি, তা এই দূরত্বের চেয়ে সামান্য বেশি।

⦿ প্রমাণিত পরিমাপ- প্রায় ৭০ বছর আগে পর্যন্ত দূরত্ব, শস্য বা তরল পদার্থ পরিমাপ করার সরঞ্জাম একেক অঞ্চলে একেক রকম ছিল। এমনকি পরিমাপের এককগুলিও আলাদা ছিল! এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যান্য অনেক কাজে সমস্যা সৃষ্টি হতো। এই সমস্যা দূর করার জন্য সবার জন্য সমান পরিমাপ পদ্ধতি এবং একক নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অতএব এই পদ্ধতিকে 'প্রমাণিত পদ্ধতি' বা **'আন্তর্জাতিক একক পদ্ধতি' (SI পদ্ধতি)** বলা হয়। **এক মিটার দূরত্বকে ১০০টি সমান ভাগে ভাগ করলে প্রতিটি ভাগকে বলা হয় এক সেন্টিমিটার** (cm)। ১ মিটার = ১০০ সেমি।

পরিমাপ	একক	সংজ্ঞা
দূরত্ব/দৈর্ঘ্য	মিটার	m
দ্রব্যমান/ভর	কিলোগ্রাম	kg
সময়	সেকন্ড	s

জ্যামিতি বক্সে থাকা ১৫ সেমি দৈর্ঘ্যের স্কেল পর্যবেক্ষণ করো।

সেই স্কেলের ওপর ০ থেকে ১৫ পর্যন্ত দাগ কাটা দেখা যাবে। প্রতি দুটি বড়ো দাগের মধ্যবর্তী দূরত্ব হলো ১ সেমি। **এক সেন্টিমিটার দূরত্বকে পুনরায় দশটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।** সেই প্রতিটি ভাগকে মিলিমিটার (mm) বলা হয়।

এক মিলিমিটার হলো এক সেন্টিমিটারের দশম ভাগ।

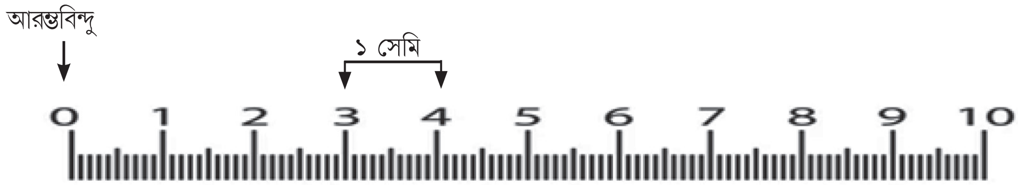

(১ সেন্টিমিটার= ১০ মিলিমিটার)

রেখাংশের দৈর্ঘ্য মাপার জন্য সেন্টিমিটার এককটি সুবিধাজনক। কাপড়ের দৈর্ঘ্য, খেলার মাঠের দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ মাপার জন্য মিটার এককটি সুবিধাজনক। কিন্তু দুটি শহরের মধ্যবর্তী দূরত্ব হাজার হাজার মিটার হয়, তাই তা মাপার জন্য কিলোমিটার (km) এই বড়ো একক ব্যবহার করা হয়। ১ কিমি = ১০০০ মিটার

দৈর্ঘ্যের নির্ভুল পরিমাপ

দৈর্ঘ্য এবং দূরত্ব মাপার জন্য ব্যবহৃত কিছু সরঞ্জাম তোমরা দেখেছ। কাপড় বিক্রেতা, ছুতার বা মাঠ পরিমাপকারী ব্যক্তির ব্যবহৃত বিভিন্ন টেপের দাগগুলি একই রকমের থাকে কি ?

কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী সুবিধামতো দাগগুলি টেপে দেওয়া থাকে। আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক ধরনের টেপ দিয়ে পরিমাপ করা জরুরি।

যেকোনো দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব মাপার জন্য স্কেলের প্রয়োজন হয়। একটি চকের দৈর্ঘ্য মাপার জন্য জ্যামিতি বক্সের ১৫ সেমি স্কেলটি সঠিক হবে। দরজার উচ্চতা মাপার জন্য মিটার-দন্ড বা টেপের প্রয়োজন হবে কিন্তু কোনো বক্র পৃষ্ঠতলের পরিধি মাপার জন্য দর্জিদের ব্যবহৃত মিটার টেপ ব্যবহার করতে হয়।

দৈর্ঘ্যের নির্ভুল পরিমাপ করার সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিন্দু

স্কেলের সঠিক অবস্থান:

- যে বস্তুর দৈর্ঘ্য মাপতে হবে, বস্তুটি যেন স্কেলের সংস্পর্শে থাকে।
- বস্তুর শুরুর প্রান্তে স্কেলের প্রারম্ভবিন্দু অর্থাৎ ০ এর দাগটি রাখতে হবে।
- দুটি বিন্দুর দূরত্ব মাপার সময় প্রথম বিন্দুতে স্কেলের প্রারম্ভবিন্দু রাখো। দ্বিতীয় বিন্দুটি স্কেলের কোন দাগের ওপর পড়ছে তা পর্যবেক্ষণ করো।

- যদি স্কেলের শূন্যবিন্দু বা আরম্ভ বিন্দু অস্পষ্ট হয় অথবা স্কেলটি এক প্রান্তে ভেঙে গিয়ে থাকে, তবে পরের কোনো একটি স্পষ্ট সংখ্যা থেকে পরিমাপ শুরু করা উচিত। পরে মোট দৈর্ঘ্য থেকে সেই সংখ্যাটি বিয়োগ করলে বস্তুর সঠিক দৈর্ঘ্য পাওয়া যায়।

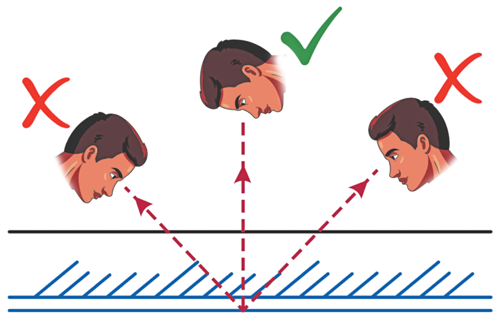

কোন দিক থেকে দেখে মাপ নিতে হয়?

বল, বড়ো বয়ামের পরিধি কি স্কেল দিয়ে মাপা যাবে?

সুতো ব্যবহার করে বক্র অংশের দৈর্ঘ্য মাপা যায়।

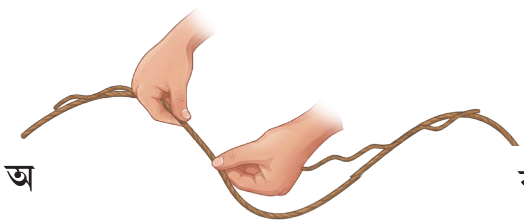

◉ নির্দেশক বিন্দু – ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য মাঠ তৈরী করতে হয়। প্রতিটি খেলার মাঠের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্দিষ্ট থাকে। পাশের চিত্রে দেখানো অনুসারে মিটার টেপ ব্যবহার করে ক্রীড়া শিক্ষকরা মাঠ তৈরী করেন।

যখন কোনো দূরত্ব মাপা হয়, তখন সেটি কোনো একটি স্থির বস্তু বা বিন্দু থেকে মাপা শুরু হয়। একেই **'নির্দেশক বিন্দু'** বলা হয়।

খো-খো খেলায় দুটি খুঁটির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব থাকে। মাঠ তৈরীর সময় প্রথম পোঁতা খুঁটিটি দ্বিতীয় খুঁটির জন্য নির্দেশক বিন্দু হিসেবে কাজ করে।

বড়ো শহরগুলিকে সংযোগকারী মহাসড়কে পরবর্তী গ্রাম কতো দূরে তা নির্দেশক ফলক বা পাথর থাকে। গ্রামের ঠিক কোন জায়গা থেকে এই দূরত্ব মাপা হয়? তথ্য সংগ্রহ করো।

মাঠের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা শার্টের উচ্চতা মাপার সময় এক-দুই মিলিমিটারের পার্থক্য হলে তেমন কোনো বড়ো অসুবিধা হয় না কিন্তু কোনো যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ যা অপরের সাথে যুক্ত হবে তৈরী করার সময় তাদের পুরুত্ব, দৈর্ঘ্য প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক হওয়া অত্যন্ত জরুরি। এর জন্য মিলিমিটারের চেয়ে ও অনেক ছোট সূক্ষ্ম পরিমাপ নির্ভুলভাবে করতে হয়। এই ধরনের পরিমাপের জন্য বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। যন্ত্রাংশ তৈরী করার কারখানায় এমন নিখুঁত পরিমাপের প্রয়োজন হয়। কারখানায় এই যন্ত্রগুলি অধিক ব্যবহৃত হয়।

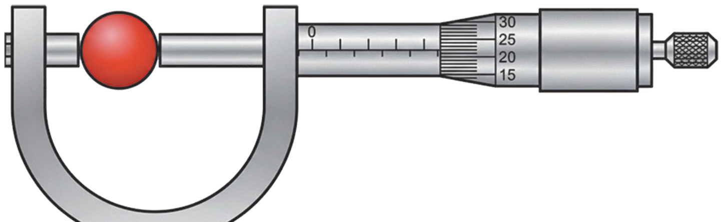

স্ক্রু গেজ

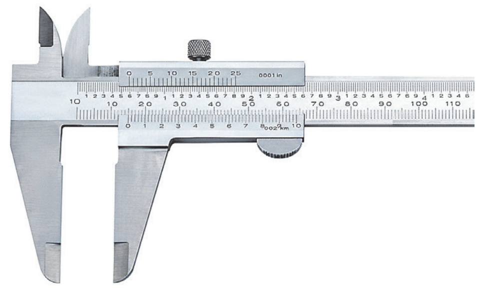

ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স

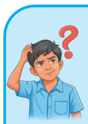

ভেবে দেখো।

শ্রেণীকক্ষ, রুমাল, শাড়ি, খেলার মাঠ এদের দৈর্ঘ্য তোমরা কোন কোন একক দিয়ে মাপবে? খাতা,সংবাদপাত্র ও পেন্সিলের পুরুত্ব মাপার জন্য কোন যন্ত্র ব্যবহার করবে?

◉ তাপমাত্রা ও থার্মোমিটার - একদিন সুরভীর শরীর ভালো না থাকায় সে স্কুলে আসেনি। স্কুল ছুটির পর জিয়া তার সাথে দেখা করতে গেল। সুরভী বলল যে তার জ্বর-জ্বর ভাব লাগছে। জিয়া তার কপালে হাত দিয়ে দেখল। সুরভীর কপাল গরম লাগছে বলে জিয়ার মনে হলো।

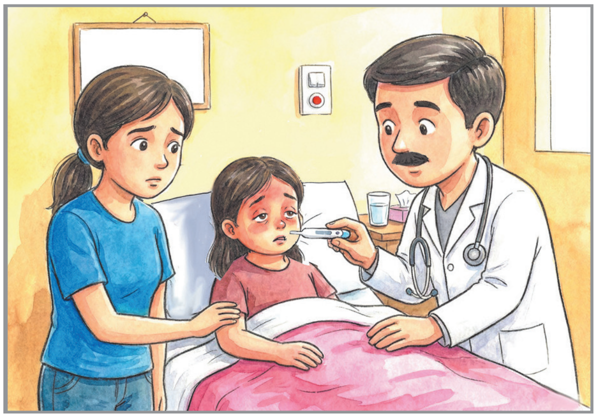

কিছু ক্ষণ পর ডাক্তার এলেন। তিনি থার্মোমিটার ব্যবহার করে তাপমাত্রা মাপলেন। তিনি বললেন, এখন জ্বর কমে গেছে।

আমরা অনেক সময় আমাদের হাতের স্পর্শ দিয়ে কোনো বস্তু গরম নাকি ঠান্ডা তা নির্ধারিত করি। স্নানের জল কতটা গরম তা আমরা এভাবেই আন্দাজ করি। ফ্রিজে রাখা দুধের পাত্রটি ঠান্ডা এ অনুভূতিও আমরা স্পর্শ করলেই পাই। কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই স্পর্শের মাধ্যমে করা আন্দাজ আলাদা আলাদা হতে পারে।

করে দেখো।

(১) কাঁচ বা প্লাস্টিকের তিনটি পাত্র নাও। সেগুলিকে 'অ', 'ব', 'ক' নাম দাও।

(২) আমরা স্নানের জন্য যেমন গরম জল ব্যবহার করি তেমন গরম জল 'অ' পাত্রে নাও। 'ব' পাত্রে ঠান্ডা জল নাও।

(৩) 'ক' পাত্রে 'অ' এবং 'ব' পাত্র থেকে এক-এক কাপ জল নিয়ে মেশাও।

(৪) তোমার ডান হাত 'অ' পাত্রের জলে এবং বাঁ হাত 'ব' পাত্রের জলে কিছুক্ষণের জন্য ডুবিয়ে রাখো।

(৫) এবার দুটি হাতই একসাথে 'ক' পাত্রে ডোবাও।
ডান হাতে 'ক' পাত্রের জল গরম নাকি ঠান্ডা লাগছে তা বলো। বাম হাতে সেইজল ঠান্ডা লেগেছে না গরম ?

সাপেক্ষ সংবেদনা

একজন ব্যক্তির কাছে ঠান্ডা মনে হওয়া কোনো বস্তু অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে গরম মনে হতে পারে। তাই সঠিক তাপমাত্রা পরিমাপ করার জন্য আমাদের থার্মোমিটার ব্যবহার করতে হয়।

স্পর্শের মাধ্যমে কোনো বস্তু কতটা গরম বা ঠান্ডা তা অনুমান করা যায়। এটা তাপমাত্রার পরিমাপ নয়। সঠিক তাপমাত্রা কতো তা পরিমাপ না করলে বোঝা যায় না। তাই তাপমাত্রা পরিমাপ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। তাপমাত্রা পরিমাপ করার জন্য থার্মোমিটার নামক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য সেলসিয়াস বা ফারেনহাইট একক ব্যবহার করা হয়।

আমাদের শরীরের তাপমাত্রা দেখার জন্য ৩৫° সেলসিয়াস থেকে ৪২° সেলসিয়াস পর্যন্ত সীমাবদ্ধতার থার্মোমিটারই যথেষ্ট। গবেষণাগারে ফুটন্ত তরল পদার্থের, বাষ্পের তাপমাত্রা পরিমাপ করা যায় এই ধরনের থার্মোমিটারের প্রয়োজন হয়। তার জন্য ০° সেলসিয়াস থেকে ১১০° সেলসিয়াস পর্যন্ত থার্মোমিটার সুবিধাজনক হয়। কারোর জ্বর হলে ডাক্তারবাবু যে ছোট থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা পরীক্ষা করেন, সেটিকে চিকিৎসা-সংক্রান্ত থার্মোমিটার বলা হয়।

পাশের চিত্রে দেখানো হয়েছে এই ধরনের থার্মোমিটার শরীরে তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য বহু বছর ধরে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ভেতরের পারদের অবস্থান দেখা, সঠিক চিহ্ন দেখে নিখুঁত তাপমাত্রা নির্ণয় করা অনেকের কাছেই বেশ কঠিন মনে হয়। আজকাল তাপমাত্রা সরাসরি সংখ্যায় দেখানো থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয়। একেই ডিজিটাল থার্মোমিটার বলে।

চিকিৎসা-সংক্রান্ত থার্মোমিটার

◉ ডিজিটাল থার্মোমিটার – চিত্রে যে থার্মোমিটারটি দেখা যাচ্ছে সেটি কি তুমি কখনো দেখেছ? একে ডিজিটাল থার্মোমিটার বলা হয়। এটি একটি সিক্কার মত ছোট ব্যাটারির সাহায্যে চলে। এই থার্মোমিটারের সাহায্যে ৩৫° সেলসিয়াস থেকে ৪২° সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা মাপা যায়। মানুষের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা সাধারণত ৩৭° সেলসিয়াস হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী সেলসিয়াস বা ফারেনহাইট যে কোনো এককে তাপমাত্রা জানা যাবে, এমন ব্যবস্থা এই থার্মোমিটারে করা থাকে।

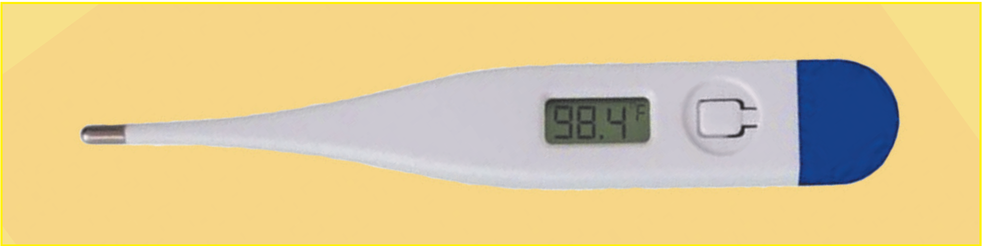

ডিজিটাল থার্মোমিটার ব্যবহার করে শরীরের তাপমাত্রা কীভাবে মাপবে?

(১) সাবান ও জল দিয়ে হাত ভালো করে পরিষ্কার করে নাও।
(২) থার্মোমিটারের রিসেট বোতামটি চাপদাও। এরপর থার্মোমিটারের নীচের অংশটি ত্বক স্পর্শ করবে, সেইভাবে বগলের নীচে রাখো।
(৩) বীপ শব্দ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো। থার্মোমিটারটি বাইরে বের করো এবং তাপমাত্রা লিখে নাও।
(৪) থার্মোমিটারের অগ্রভাগ একটি পরিষ্কার শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে রাখো।

এই থার্মোমিটার ব্যবহার করে তোমার বন্ধু বা পরিবারের সদস্যদের শরীরের তাপমাত্রা দেখো।

◉ ইনফ্রারেড থার্মোমিটার- ছোঁয়াচে রোগাক্রান্ত কোনো ব্যক্তি ভিড়ের মধ্যে যায়, বিমানবন্দরের মতো জায়গায় প্রচন্ড ভিড় থাকে। প্রচন্ডভিড়ের কারণে একেকজন মানুষের তাপমাত্রা পরিমাপ করা বেশ কঠিন কাজ। এই সমস্যা এড়াতে এবং কোনো ব্যক্তিকে স্পর্শ না করেই অবিলম্বে তার শরীরের তাপমাত্রা দ্রুত জানার জন্য এই ধরনের উপকরণের প্রয়োজন হয়।

মুখমন্ডল থেকে কিছুটা দূরত্বে ধরে রাখা এই যন্ত্রটির সাহায্যে সেই ব্যক্তির শরীরের তাপমাত্রা অবিলম্বে জানা যায়। এই উপকরণটি একটু ভিন্ন ধরনের থার্মোমিটার। ইনফ্রারেড নামক রশ্মির সাহায্যে এটি কাজ করে, তাই একে **ইনফ্রারেড থার্মোমিটার** বলা হয়। আজকাল এই থার্মোমিটারের ব্যবহার অনেক জায়গায় করা হচ্ছে।

করোনা মহামারীর সময়ে জ্বর আক্রান্ত ব্যক্তিদের শনাক্ত করার জন্য এই ধরনের থার্মোমিটারের ব্যবহার বিশ্বজুড়ে ব্যাপকভাবে হয়েছিল। এই থার্মোমিটারের সবচেয়ে বড়ো সুবিধা হলো দূর থেকেই সামনের ব্যক্তির শরীরের তাপমাত্রা মুহূর্তের মধ্যে জানা যায়।

তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস (^{0}সে) এটি একক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য ফারেনহাইট (^{0}F), কেলভিন (K) এই এককগুলিও ব্যবহার করা হয়। তাপমাত্রার SI একক হলো কেলভিন এবং এটি K চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

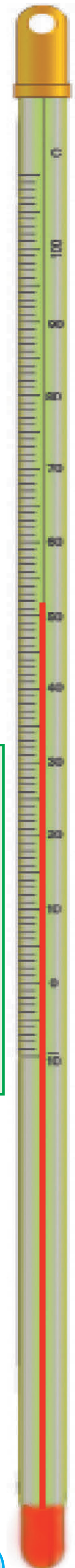

⦿ পরীক্ষাগারের থার্মোমিটার – পরীক্ষাগারে বড়ো থার্মোমিটার থাকে। পাশের চিত্রে দেখানো অনুযায়ী এই থার্মোমিটার এক প্রান্ত বন্ধ একটি লম্বা কাঁচের নলের মতো থাকে। থার্মোমিটারের নীচের প্রান্তে একটি ফাঁপা কাঁচের কুন্ডলী থাকে। এই কুন্ডলীতে পারদ অথবা রঙিন অ্যালকোহল ভরা থাকে। এই কুন্ডলী থেকে শুরু করে দ্বিতীয় প্রান্তপর্যন্ত কাঁচের নলের ভেতরের দিকে চুলের মতো অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটি সরু নল থাকে। কুন্ডলীতে থাকা তরল তাপ পেলে তার আয়তন বৃদ্ধি পায়। কুন্ডলির পারদ বা অ্যালকোহল উত্তপ্ত হলে তা প্রসারিত হয় এবং ফাঁপা নলে উপরের দিকে ওঠে। কুন্ডলীতে থাকা তরল ফাঁপা নলে যে চিহ্নে এসে স্থির হয়, সেই তাপমাত্রা নোট করা হয়। এই থার্মোমিটারের কাঁচের নলে সেলসিয়াস পরিমাপের চিহ্ন থাকে।

পরীক্ষাগারের থার্মোমিটারটি পর্যবেক্ষণ করো এবং নীচের তথ্যগুলি খাতায় লেখো।

(১) থার্মোমিটারে প্রদর্শিত সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ....^{0}সে ।

(২) থার্মোমিটারে প্রদর্শিত সর্বোচ্চ তাপমাত্রা .... ^{0}সে।

(৩) এই থার্মোমিটারের সাহায্যে তাপমাত্রা পরিমাপের ক্ষমতা ... ^{0}সে থেকে ... ^{0}সে ।

(৪) দুটি বড়ো দাগের মধ্যবর্তী ছোট দাগের সংখ্যা ....

(৫) একে অপরের সংলগ্ন দুটি ছোট দাগের মধ্যবর্তী তাপমাত্রার পার্থক্য .... ^{0}সে।

সব সময় মনে রাখবে।

থার্মোমিটারের দুটি বড় চিহ্নের মধ্যবর্তী তাপমাত্রার পার্থক্য যদি ১০° সেলসিয়াস হয় এবং এই দুটি বড় চিহ্নের মাঝে ১০টি ছোট চিহ্ন থাকে, তবে প্রতিটি ছোট চিহ্ন হবে ১° সেলসিয়াস। পরীক্ষাগারে ভিন্ন ভিন্ন সীমার এবং ভিন্নভিন্ন ছোটো চিহ্নের থার্মোমিটার থাকে। থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা পরিমাপ করার আগে তার চিহ্নগুলি ভালো করে দেখে নেবে, প্রতিটি ছোট চিহ্ন কত ডিগ্রী হবে তা আগে থেকেই জেনে নেবে। নির্ভুল ও নিখুঁতভাবে তাপমাত্রা পরিমাপ করার জন্য এটা প্রয়োজনিয়।

থার্মোমিটারের সাহায্যে তাপমাত্রা পরিমাপের সঠিক পদ্ধতি

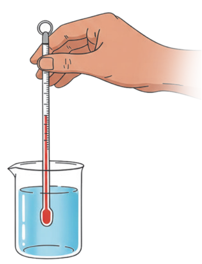

(১) যে বস্তু বা পদার্থের তাপমাত্রা পরিমাপ করতে হবে, সেই বস্তু বা পদার্থের অধিকাধিক স্পর্শ যেন থার্মোমিটারের নীচের কুন্ডলীতে থাকে। এইভাবে ব্যবহার করলে তবেই বস্তুর সঠিক তাপমাত্রা পরিমাপ করা যাবে।

(২) তাপমাত্রা পরিমাপ করার সময় থার্মোমিটারটি সম্ভব হলে সোজা, খাড়াভাবে ধরে রাখবে। থার্মোমিটারের কুন্ডলীটি এমনভাবে ধরবে যেন পাত্রের তলা বা ভিতরের পাশে স্পর্শ না করে।

(৩) তাপমাত্রা সঠিকভাবে দেখার জন্য থার্মোমিটারের ভেতরের তরলের স্তরটি চোখের সমান্তরালে থাকে এমনভাবে থার্মোমিটারটি ধরবে।

? ভেবে দেখো।

তুমি থার্মোমিটার হাতে নিয়ে খেলার মাঠে দাঁড়িয়ে আছ। তুমি কোনো বস্তুর তাপমাত্রা পরিমাপ করছ না, তখন থার্মোমিটারটি কোন তাপমাত্রা দেখাবে ?গাছের পাতার তাপমাত্রা পরিমাপ করার জন্য তুমি কী করবে ?

ঘরের বাতাসের তাপমাত্রা মাপার জন্য দেওয়ালে টাঙানো যায় এমন থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের থার্মোমিটার ব্যবহার করে সেই ঘরের কক্ষ তাপমাত্রা জানা যায়। আসলে সেটি হলো সেই ঘরের বাতাসের তাপমাত্রা।

ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর প্রতিদিন বিভিন্ন জায়গার তাপমাত্রার পরিমাপ নথিভুক্ত করে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য এই নথিগুলি ব্যবহার করা হয়।

প্রতিদিন খবরের কাগজে এবং টিভির সংবাদে দেশের প্রধান শহরগুলির সর্বনিম্ন (সবচেয়ে কম) ও সর্বোচ্চ (সবচেয়ে বেশি) তাপমাত্রা কত ছিল, সেই তথ্য জানানো হয়।

- **পরিচিতি বিজ্ঞানীদের**

আন্না মণি (১৯১৮-২০০১)

আন্না মণি-কে 'ভারতীয় আবহাওয়া নারী' বলা হয়। আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য দরকারী এমন অনেক যন্ত্র তিনি তৈরী করেছিলেন। রেডিওসোন্ড নামক যন্ত্র সাহায্যে উচ্চতায় বায়ুমণ্ডলের চাপ, সেখানকার তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা পরিমাপের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। আন্না মণির গবেষণা ও প্রচেষ্টার ফলেই ভারতে এই যন্ত্রগুলির ব্যবহার শুরু হয়েছে। তিনি পুণের ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর এবং বেঙ্গালুরুতে গবেষণার কাজ করেছিলেন। তাঁর কাজের ফলেই আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতের অন্যান্য দেশের ওপর নির্ভরশীলতা কমে গিয়েছে।

আমরা কী শিখলাম ?

- পরিমাপ মানে কোনো সঠিক উপকরণ ব্যবহার করে মাপা। যে পরিমাপ দিয়ে মাপা হয়, তাকে সেই পরিমাপের একক বলা হয়।
- আগেকার দিনে বিভিন্ন জায়গায় এককগুলি ভিন্ন ভিন্ন ছিল। বিভিন্ন মানুষের পরিমাপ সমান হতো না। এই ধরনের পরিমাপ পদ্ধতিকে অপ্রমাণিত পরিমাপ পদ্ধতি বলা হয়।
- এখন পরিমাপ করার সময় প্রমাণিত একক ব্যবহার করা হয়।
- দৈর্ঘ্যের (SI) একক হলো মিটার।
- ১ কিমি = ১০০০ মি ১ মি = ১০০ সেমি ১ সেমি = ১০ মিলিমিটার
- দূরত্ব বা দৈর্ঘ্য মাপার সময় যে স্থির বিন্দু থেকে মাপা শুরু করা হয়, তাকে নির্দেশক বিন্দু বলা হয়।
- তাপমাত্রা পরিমাপ করার জন্য থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয়।
- তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য সেলসিয়াস, ফারেনহাইট ও কেলভিন একক ব্যবহার করা হয়।
- থার্মোমিটারে পারদ ধাতু অথবা রঙিন অ্যালকোহল ব্যবহার করা হয়।
- শরীরের তাপমাত্রা মাপার জন্য ডিজিটাল থার্মোমিটার বা ইনফ্রারেড থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয়।

অনুশীলনী

(১) শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসাও।

(১) তাপমাত্রা পরিমাপের যন্ত্রকে .... বলে।

(২) মানব দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা .... থাকে।

(৩) কোনো স্থির বিন্দু থেকে দূরত্ব মাপার সময় সেই বিন্দুটিকে .... বলা হয়।

(৪) ১ মিটার =............................ সেন্টিমিটার।

(৫) থার্মোমিটারের কাঁচের কুন্ডলিতে রঙিন .... ভরা থাকে।

(৬) তাপমাত্রার একক হলো ....।

(২) নীচের পরিমাপগুলির জন্য কোন উপকরণ ব্যবহার করবে ?

(১) পেন্সিল বা কলমের দৈর্ঘ্য

(২) নিজের উচ্চতা

(৩) আশেপাশের কোনো বড়ো গাছের গুঁড়ির ঘের

(৪) রবারের পুরুত্ব

(৩) আমার জুড়ি বলো।

‘অ’ সমূহ	‘ব’ সমূহ
(১) দৈর্ঘ্যের একক	(অ) অ্যালকোহল
(২) গবেষণামূলক পরীক্ষা নিরীক্ষায় ব্যবহৃত তাপমাত্রার একক	(আ) অপ্রমাণিত দৈর্ঘ্য পরিমাপ
(৩) হাতের বিঘতের সাহায্যে পরিমাপ করা	(ই) মিটার
(৪) থার্মোমিটারের লাল রঙের তরল	(ঈ) কেলভিন

(৪) নীচের বিবৃতিগুলি সত্য নাকি মিথ্যা তা লেখো।

(অ) ১ কিমি = ১০০ সেমি।

(আ) দৈর্ঘ্য মাপার জন্য স্কেল এবং মিটারটেপ এই দুটি আলাদা উপকরণ ব্যবহার করলে টেবিলের দৈর্ঘ্য আলাদা আলাদা আসবে।

(ই) পরীক্ষাগারে ফুটন্ত জলের তাপমাত্রা মাপার জন্য ডিজিটাল থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয়।

(ঈ) পর্যবেক্ষণের ত্রুটির কারণে তাপমাত্রা নোট করার সময় ভুল হতে পারে।

(উ) কেবল স্পর্শ করেই কোনো বস্তুর নির্ভুল তাপমাত্রা বলা সম্ভব।

(৫) নীচের এককগুলিকে বড়ো থেকে ছোট একক অনুযায়ী সঠিক ক্রমে সাজাও।

(অ) ১ সেমি (ব) ১ কিমি (ক) ১ মিমি (ড) ১ মি

(৬) জ্যামিতি বাক্সের স্কেলের সাহায্যে সবচেয়ে কম কত দৈর্ঘ্য মাপা সম্ভব ?

(৭) নীচের পরিমাপগুলি করার সময় তুমি কোন একক ব্যবহার করবে ?

(অ) বইয়ের দৈর্ঘ্য ....

(আ) চাবির পুরুত্ব............................

(ই) নাগপুর ও মুম্বাই শহরের মধ্যবর্তী দূরত্ব ....

(ঈ) কাপড়ের দৈর্ঘ্য ....

(৮) প্রমাণিত পরিমাপ উপকরণের প্রয়োজনীয়তা কেনো হয় ?

(৯) দূরত্ব, ওজন, আয়তন পরিমাপের জন্য তোমাদের অঞ্চলে আগেকার দিনে ব্যবহৃত পরিমাপ পদ্ধতি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করো।

উপক্রম -

(১) জলের বোতলের বাঁকা অংশের দৈর্ঘ্য মাপো ও নোট করো।

(২) বিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের একটি পাতার পুরুত্ব নিম্ন কৃতির সাহায্যে নির্ণয় করো।

- সম্পূর্ণ পাঠ্যপুস্তকের পুরুত্ব জ্যামিতি বাক্সের স্কেলের সাহায্যে মেপে নাও। পাঠ্যপুস্তকের পুরুত্ব নোট করো।
- পাঠ্যপুস্তকের মোট পাতার সংখ্যা দিয়ে সম্পূর্ণ পাঠ্যপুস্তকের পুরুত্বকে ভাগ করো। ভাগ করার পর যে উত্তরটি পাওয়া যাবে, সেটিই হলো একটি পাতার পুরুত্ব। তা খাতায় নোট করো।

(৩) একশোটি নোটের একটি বান্ডিল দেখতে পাবে, একই পদ্ধতি দ্বারা একটি নোটের পুরুত্ব কত হবে তা নির্ধারণ করো। খাতায় নোট করো।

(৪) প্লাস্টিকের নল, রঙিন সুতো ইত্যাদি সাহিত্য ব্যবহার করে পরীক্ষাগারের থার্মোমিটারের প্রতিরূপ তৈরি করো। শিক্ষকের নির্দেশনায় এই ধরনের প্রতিরূপের প্রদর্শনী আয়োজন করো।

৩ এসো, উপাদানগুলি পৃথক করি

স্কুলের সময় হয়ে গিয়েছিল। দেরি যাতে না হয় সেজন্য সায় না তাড়াহুড়ো করে তৈরী হচ্ছিল। তার জলের বোতলে যেটুকু জল অবশিষ্ট ছিল, তা সে ঘরের একটি বোতলে ঢেলে দিল। নিজের বোতলটি ঘরের জল দিয়ে ভর্তি করে সে স্কুলের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। মা তাকে থামালেন এবং বললেন, সায়না, তাড়াহুড়োর চক্করে কী করেছিস একটু ভালো করে দ্যাখ। তেল রাখার বোতলে তুই জল ঢেলে দিয়েছিস! ওই তেল নষ্ট করা যাবে না। ওর ভেতরের সবটুকু তেল তুই নিজেই আমাকে আলাদা করে দিবি। স্কুল থেকে ফিরে এসে করব, এই বলে সায়না স্কুলে চলে গেল।

স্কুল ছুটি হলো, সায়না বাড়ি ফিরে এলো। তার সামনেই রাখা ছিল সকালের সেই তেল ও জল একসঙ্গে মিশে যাওয়া বোতলটি! বোতলে দুটি আলাদা, ভিন্ন স্তর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। সেগুলিকে একে অপরের থেকে আলাদা করতে হবে। কীভাবে এই কাজ করা যাবে? তোমাদের মাথায় কোনো যুক্তি আসছে কি? বাড়িতে কোনো একটি বোতল বা কাঁচের গ্লাসে আধ কাপ তেল নাও, ওই গ্লাসেই আধ কাপ জল মেশাও। তোমাদের যুক্তি খাটিয়ে দেখো। গ্লাসের তেল ও জল একে অপরের থেকে আলাদা করার সময় কী কী ঘটল তা নোট করে রাখো, তারপর বন্ধুদের সাথে সেই বিষয়ে আলোচনা করো।

বোতলে তরলের দুটি আলাদা স্তর কেনো দেখা যাচ্ছে? তাদের মধ্যে তেলের স্তর কোনটি, তা কীভাবে নির্ধারণ করবে?

উপরের স্তরের তরলটি একটি খালি পাত্রে আস্তে আস্তে ঢেলে নেওয়ার চেষ্টা করো।

মিশ্রণের সবটুকু তেল কি এভাবে আলাদা করা যায়? দুই-তিনবার চেষ্টা করে দেখো।

প্লাস্টিকের নল, সূঁই ছাড়া ইনজেকশনের সিরিঞ্জ ব্যবহার করে সবটুকু তেল আলাদা করার চেষ্টা করো। এই প্রচেষ্টায় কী কী অসুবিধা হলো এবং কেনো হলো, তা ভেবে দেখো।

একটি স্বচ্ছ প্লাস্টিকের বেশ বড়ো মাপের গ্লাস বা বোতল নাও। তার তলায় পেরেক দিয়ে একটি ছিদ্র করো।

সেই ছিদ্রটি একটি আঙুল দিয়ে বন্ধ রেখে তেল ও জলের মিশ্রণ ওই পাত্রে ভরো। আগের মতোই উভয় তরলের স্তর আলাদা আলাদা থাকবে।

এখন এই মিশ্রণ ভরা পাত্রটি অন্য একটি খালি পাত্রের একটু উপরে ধরো। ছিদ্র থেকে আঙুলটি সরিয়ে নাও। কোন তরলের ধারা তলার ছিদ্র দিয়ে নীচে পড়তে শুরু করবে ? ছিদ্রের ওপর আবার দ্রুত আঙুল চাপা দিয়ে ভেতরের তরল বাইরে আসা কখন বন্ধ করতে হবে ? উপরের পাত্রে কোন তরলটি থেকে যাবে এবং নীচের পাত্রে কোন তরলটি জমা হবে ?

দুই বা ততোধিক পদার্থ একসঙ্গে মিশে থাকলে তাকে মিশ্রণ বলা হয়। মিশে থাকা পদার্থগুলিকে মিশ্রণের উপাদান বলে। চানাচুর, ঝালমুড়ি, ভেলপুরি এই ধরনের কিছু মিশ্রণের উপাদানগুলি বেছে বেছে আলাদা করা যায় কিন্তু অনেক মিশ্রণের উপাদান এভাবে সহজে আলাদা করা যায় না। তার জন্য কিছু কৌশল ব্যবহার করতে হয়। মিশে থাকা পদার্থগুলির মধ্যে কী কী পার্থক্য রয়েছে তা খুঁজে বের করতে পারলে, **এক একটি পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে কোনো কৌশল বা পদ্ধতি মাথায় আসতে পারে। এই ধরনের পদ্ধতিগুলিকে পৃথকীকরণ পদ্ধতি বলা হয়।**

করে দেখো।

ভাজা চিনাবাদাম বা ভাজা ছোলা হাতের তালুতে নিয়ে সামান্য রগড়ে নাও। তালু ছড়িয়ে তার ওপর ফুঁ দাও। হাতে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দানা বা ছোলাগুলিই পড়ে থাকবে। শুকনো পাতা, ভুষি এবং শস্যদানা এদের মিশ্রণ থেকে দানা আলাদা করার জন্য কৃষকেরা কীভাবে এই পদ্ধতির ব্যবহার করে ?

◉ ঝাড়াই -

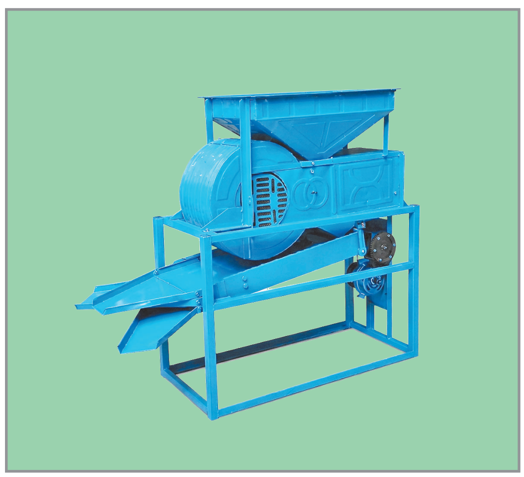

ঝাড়াই করার যন্ত্র

বাতাস থাকলে, ধান্য ও ভুষির মিশ্রণ ওপর থেকে নীচে ছাড়লে ভারী শস্যদানাগুলি নীচে পড়ে। ওজনে হালকা ভুষি এবং অন্যান্য হালকা আবর্জনা বাতাসের টানে দূরে চলে যায়। যন্ত্রের বড়ো পাখার সাহায্যে জোরে বাতাস তৈরী করে এই কাজটিই কম সময়ে করা সম্ভব হয়।

বাতাসের সাহায্যে ভারী ও হালকা পদার্থ আলাদা করার এই পদ্ধতিকে **‘ঝাড়াই’** বলা হয়।

◉ **বাছাই** – শস্যদানার মধ্যে থাকা ছোট ছোট পাথর বা কাঠি তাদের আকার ও রঙ দেখে হাত দিয়ে বেছে আলাদা করা যায়। এই পদ্ধতিকে **'বাছাই'** বলা হয়। শস্যদানা থেকে আলাদা করতে হবে এমন উপাদানের পরিমাণ যদি কম থাকে, তবে এই কাজ সহজ হয়। দুপুরে খাওয়ার ছুটিতে টিফিন খাওয়ার সময় তোমরা তরকারি থেকে লঙ্কাগুলি এই পদ্ধতি ব্যবহার করেই আলাদা করে থাকো।

◉ **চালা** – শস্যদানার চেয়ে আকারে ছোট পাথর চালুনির সাহায্যে আলাদা করা যায়। এইভাবে পরিষ্কার করা শস্যদানা দিয়ে আমরা আটা তৈরী করি। আটার মধ্যে থাকা ভুষি (মোটা অংশ) আলাদা করার জন্য আরও সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত জালের চালুনি ব্যবহার করতে হয়। চালুনির ছিদ্রের চেয়ে ছোট আটার কণাগুলো ছিদ্র দিয়ে নীচে পড়ে যায়। ছিদ্রের চেয়ে বড়ো কণাগুলো চালুনির জালের ওপরই থেকে যায়। অর্থাৎ, যখন দুটি কঠিন পদার্থের মিশ্রণে থাকা উপাদানগুলির আকার আলাদা থাকে, তখন আমরা পৃথকীকরণের জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারি।

বাড়ি তৈরীর জায়গায় বালি এবং কাঁকর যদি ভুলবশত একসঙ্গে মিশে যায়, তবে সেই বালি ও কাঁকর কি আলাদা করা যাবে? ওই বালি থেকে মোটা বালি এবং সরু বালি কীভাবে আলাদা করা হয়?

◉ **পরিস্রবন** – যখন কোনো মিশ্রণ দুটি কঠিন পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত হয় এবং মিশ্রণটিতে থাকা পদার্থ দুটির কণার আকারে পার্থক্য থাকে, তখন সঠিক চালুনি ব্যবহার করে আমরা সেই পদার্থগুলিকে আলাদা করতে পারি। কিন্তু যখন কোনো মিশ্রণে একটি তরল পদার্থ এবং অন্যটি সেই তরলে অদ্রবণীয় কোনো কঠিন পদার্থ থাকে, তখন ? তখন অত্যন্ত সূক্ষ্ম জালের একটি **ছাঁকনি** দিয়ে আমরা সেটিকে আলাদা করতে পারি।

ভেবে দেখো।

চা ছাঁকার সময় ছাঁকনির ওপরে থেকে যাওয়া পদার্থটি কোন অবস্থায় থাকে ? ছাঁকনি দিয়ে নীচে পড়ে যাওয়া পদার্থটি কোন অবস্থায় থাকে ?

ঘোলা জল যদি কাপড়ের টুকরো বা চায়ের ছাঁকনি দিয়ে ছাঁকা হয়, তবে কি পরিষ্কার জল পাওয়া যাবে ?

পরীক্ষাগারে পরিস্রাবক কাগজ নামের এক ধরনের কাগজ ব্যবহার করা হয়। সেই কাগজটি আসলে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত জালের মতোই। এটি ব্যবহার করে ঘোলা জল, ঘোল এইধরনের পদার্থগুলি ছেঁকে নেওয়া যায়।

পরিস্রাবক কাগজের ব্যবহার

ভেবে দেখো।

সংক্রামক মহামারীর সময়ে, ভিড়ের যানবাহনে যাতায়াত করার সময়, বড়ো হাসপাতালে যাওয়ার সময় নাক ও মুখে কেনো মাস্ক পরা উচিত ?

তোমরা জানো কী ?

কিছু ফসল কাটার পর জমিতে থেকে যাওয়া খড় পুড়িয়ে দেওয়া হয়। দিল্লির বিজ্ঞানীরা এই খড় পোড়ানোর পর অবশিষ্ট ছাই ব্যবহার করে একটি পর্দা তৈরী করেছেন। এই পর্দায় অত্যন্ত সূক্ষ্ম ছিদ্র রয়েছে। কারখানার নোংরা জল পরিষ্কার করার জন্য এই পর্দাটি ছাঁকনির মতো ব্যবহার করা হয়।

⦿ অবসাদন এবং অধিপাতন -

একটি গ্লাসে ঘোলা জল বেশ কিছুক্ষণ না নাড়িয়ে রেখে দিলে, তার মধ্যে থাকা মাটির কণাগুলো নীচে জমা হয়। এরপর সেই জল সাবধানে অন্য একটি গ্লাসে ঢেলে নিলে পরিষ্কার জল পাওয়া যায় এবং মাটি নীচে পড়ে থাকে। এইভাবে তরলে অদ্রবণীয় ভারী কঠিন পদার্থ নীচে জমা হওয়াকে **'অবসাদন'** বলা হয়। পাত্রটি সামান্য কাত করে ওপরের তরল পদার্থটি আস্তে আস্তে বের করে নেওয়া যায়। একেই **'অধিপাতন'**বলা হয়।

সব সময় মনে রাখবে।

বর্ষাকালে অনেক সময় নলের জল ঘোলা আসে। এই ঘোলা জল ফিটকিরি ব্যবহার করে পরিষ্কার করা হয়। ঘোলা জলের পৃষ্ঠভাগে ফিটকিরির কিছু অংশ ডোবে এইভাবে সেটি ৪-৫ বার ঘোরালে সামান্য ফিটকিরি জলে গলে যায়। ফিটকিরির সেই কণাগুলো মাটির কণার সাথে আটকে যায়। এইভাবে বড়ো কণাগুলো বেশি ভারী হওয়ার কারণে খুব দ্রুত পাত্রের তলায় জমা হয়ে যায়।

⦿ মন্থন - মন্থনদন্ড ব্যবহার করে কিছুক্ষণ দই ঘুঁটলে মাখন ঘোলের ওপর ভাসতে শুরু করে। দই ঘোঁটার ফলে তার মধ্যে থাকা মাখনের কণাগুলো পাত্রের পাশের দিকে ছিটকে যায়। সেগুলি একে অপরের সাথে লেগে মাখনের বড়ো মণ্ড তৈরী করে। এই মাখন তৈলাক্ত ও হালকা হওয়ায় ঘোলের ওপর ভাসতে থাকে, যা সহজেই আলাদা করা যায়। হাতে ঘোরানো মন্থনদণ্ডের মতোই, যন্ত্র দ্বারা ঘোরানো মন্থনদন্ড এই ক্রিয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়।

বড়ো বড়ো ডেয়ারিতে দুধ থেকে ক্রিম আলাদা করা, ব্লাড ব্যাংকে রক্তের বিভিন্ন উপাদান আলাদা করার জন্য পৃথকীকরণের আলাদা পদ্ধতি এবং আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। তরল পদার্থকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ঘোরানোর যন্ত্র এই সমস্ত জায়গায় থাকে।

◉ বাষ্পীভবন-

করে দেখো।

একটি প্লেটে সামান্য একটু জল নাও। তাতে এক চামচ লবণ গুলিয়ে লবণের দ্রবণ তৈরী করো। এবার এই প্লেটটি রোদে রেখে দাও। এক-দুই দিনের মধ্যে প্লেটের জল আস্তে আস্তে কমে যাবে। এই মিশ্রণের তরল অংশটি বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। কঠিন অবস্থায় থাকা লবণ প্লেটে অবশিষ্ট পড়ে থাকতে দেখা যায়।

সৃষ্টি তার পরীক্ষার প্লেটটি ছায়ায় রাখল, যশ তার প্লেটটি রোদে রাখল এবং সংস্কৃতি তার প্লেটটি অনবরত হাওয়া আসা একটি জানলার ধারে রাখল। কার প্লেটে শুষ্ক লবণ সবচেয়ে তাড়াতাড়ি জমা হবে ? কেনো ?

উত্তাপের কারণে তরলের গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে **'বাষ্পীভবন'** বলা হয়। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে বিশ্বজুড়ে লবণ তৈরী করা হয়। আলাদা করে কোনো জ্বালানি পোড়াতে হয় না। এর জন্য সৌরশক্তি ব্যবহার করা হয়।

সমুদ্রের জল উপকূলবর্তী অঞ্চলের অগভীর জমিতে আটকে রাখা হয়। সূর্যালোকের সাহায্যে জল বাষ্পীভূত হয়ে যায় এবং তলে লবণ পড়ে থাকে। তার মধ্যে পাথর, ময়লা ইত্যাদি অন্যান্য উপাদানও থাকে। পৃথকীকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিষ্কার লবণ পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিলনাড়ু এবং রাজস্থানে এমন অনেক লবণক্ষেত্র রয়েছে, যেখান থেকে আমরা লবণ পাই।

◉ চৌম্বকীয় পৃথকীকরণ- লোহা, কোবাল্ট এবং নিকেল এই ধাতুগুলি চুম্বকের দিকে আকর্ষিত হয়। এদের **'চৌম্বকীয় পদার্থ'** বলা হয়। চুম্বক ব্যবহার করে আমরা চৌম্বকীয় ও অচৌম্বকীয় পদার্থ আলাদা করতে পারি। কিছু জিনিস তৈরীর ক্ষেত্রে লোহা, কোবাল্ট, নিকেলের মতো ধাতু ব্যবহার করা হয়। বড়ো বড়ো গ্রাম বা শহরে জমা হওয়া আবর্জনা থেকে চুম্বকের সাহায্যে এই চৌম্বকীয় পদার্থগুলি আলাদা করা হয়।

ভেবে দেখো।

প্রচুর পরিমাণে জমা করা আবর্জনা থেকে চৌম্বকীয় পদার্থ আলাদা করার প্রয়োজন কেনো পড়ে ?

• **পরিচিতি বিজ্ঞানীদের**

পদ্মশ্রী ডা. উদ্ধব ভরালী হলেন একজন বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় গবেষক। তিনি বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মান এবং পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৮৮ সালে তাঁর পরিবার যখন ঋণের সংকটে ডুবেছিল, তখন তিনি আসামের চা বাগান শ্রমিকদের জন্য প্লাস্টিকের ব্যাগ তৈরীর একটি ছোট কারখানা খোলার সিদ্ধান্ত নেন। সেই সময় এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা দামের একটি বিদেশী যন্ত্র কিনে আনার পরিবর্তে, তিনি নিজে মাত্র ৬০,০০০ টাকায় একটি সম্পূর্ণ নতুন যন্ত্র তৈরী করেন। তখন থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত কৃষি, শিল্প এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ড. ভরালী যে সমস্ত উপযোগী যন্ত্র ও উপকরণ তৈরী করেছেন, তার সংখ্যা ১৬০-এরও বেশি। ফলের খোসা ছাড়ানো এবং বীজ আলাদা করার যন্ত্র, ডালিম থেকে ডালিমের দানা আলাদা করার যন্ত্রের মতো উপকরণগুলি বড়ো কারখানার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বহু পুরস্কারের পাশাপাশি, বিশ্ববিখ্যাত সংস্থা NASA-এর 'ভবিষ্যতের প্রযুক্তি' নামক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কারও ড. ভরালী পেয়েছেন। বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র তৈরী ও গবেষণার জন্য ড. ভরালী একটি বিশেষ কেন্দ্রও শুরু করেছেন।

আমরা কী শিখলাম ?

- একত্রে মিশে থাকা পদার্থগুলিকে মিশ্রণ থেকে আলাদা করাই হলো তাদের পৃথকীকরণ।
- মিশ্রণে থাকা পদার্থগুলির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পেলেই সেগুলি আলাদা করার কৌশল বা উপায় পাওয়া যায়। এই কৌশলগুলিকেই পৃথকীকরণের পদ্ধতি বলা হয়।
- বাছাই এই পদ্ধতিতে রঙ ও আকারের ওপর ভিত্তি করে মিশ্রণের পদার্থগুলিকে বেছে আলাদা করা হয়।
- বাতাসের সাহায্যে ভারী কঠিন পদার্থ থেকে হালকা পদার্থ আলাদা করার জন্য চাষের ক্ষেতে ঝাড়াইপদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
- সঠিক আকারের চালুনির সাহায্যে মিশ্রণের ছোট ছোট কণা আলাদা করার পদ্ধতিকে চালা বলা হয়।
- পরিস্রবন এই পদ্ধতি দ্বারা তরলে দ্রবীভূত না হওয়া কঠিন পদার্থগুলিকে আমরা আলাদা করতে পারি।
- তরলের মধ্যে থাকা অদ্রবণীয় ভারী পদার্থগুলি তরলের নীচে জমে যাওয়াকে অবসাদন বলে।
- তরল পদার্থের গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বাষ্পীভবন বলা হয়।
- সমুদ্রের জল বাষ্পীভূত করে সামুদ্রিক লবণ পাওয়া যায়।
- চুম্বক ব্যবহার করে মিশ্রণ থেকে চৌম্বকীয় পদার্থ আলাদা করা যায়।

অনুশীলনী

(১) সঠিক বিকল্পটি বেছে নাও।

(১) চৌম্বকীয় পৃথকীকরণে .... ব্যবহার করা হয়।

(অ) ঘনত্বের পার্থক্য (ব) আকারের পার্থক্য

(ক) চৌম্বকীয় ধর্ম (ড) দ্রবণীয় তার ধর্ম

(২) গমের মধ্য থেকে ছোট ছোট পাথর আলাদা করার জন্য .... পদ্ধতিটি উপযোগী।

(অ) মাড়াই (ব) বাছাই (ক) ঝাড়াই (ড) চালা

(৩) জলে গুলে থাকা ফিটকিরি নীচের .... পদ্ধতির সাহায্যে আলাদা করা যায়।

(অ) বাষ্পীভবন (ব) অবসাদন (ক) পরিস্রবন (ড) বাছাই

(৪) দুধে জল মেশানো হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তাহলে দুধ এবং জল আলাদা করা .... পদ্ধতির দ্বারা সম্ভব হবে।

(অ) পরিস্রবন (ব) বাষ্পীভবন

(ক) অবসাদন (ড) এর কোনো পদ্ধতি দ্বারা সম্ভব নয়

(২) সত্য নাকি মিথ্যা নির্ধারণ করো। যদি মিথ্যা হয়, তবে কেনো তা লেখো।

(১) তরলে দ্রবীভূত না হওয়া পদার্থ আলাদা করার জন্য পরিস্রবন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

(২) চৌম্বকীয় ধর্মের ব্যবহার করে আবর্জনা থেকে সমস্ত ধাতু আলাদা করা যায়।

(৩) সমুদ্রের জল থেকে লবণ তৈরী করার জন্য অবসাদন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

(৪) শস্য থেকে হালকা ভুষি আলাদা করার জন্য ঝাড়াই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

(৫) ভারী ও হালকা এই দুটি তরল পদার্থ আলাদা করার জন্য বাছাই পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

(৩) পরিস্রবন পদ্ধতি কোন ধরনের মিশ্রণের জন্য উপযোগী এবং কিভাবে ?

(৪) পাত্রের জলে মিশে থাকা কাঠের ভুষি তুমি কীভাবে আলাদা করবে ?

(৫) কাঠের কাজ করার সময় কাঠের ভুষির সাথে লোহার পেরেক মিশে গেলে সুতার কোন কোন পদ্ধতিতে সেগুলি আলাদা করতে পারবেন ? এর মধ্যে কোন পদ্ধতিটি সবচেয়ে সহজ ?

(৬) নীচে শব্দ ধাঁধায় পৃথকীকরণের সাথে সম্পর্কিত কিছু শব্দ দেওয়া হয়েছে। নমুনা হিসেবে একটি শব্দের চারপাশে গোল করা হয়েছে। শব্দ ধাঁধা থেকে এই ধরনের সমস্ত শব্দ খুঁজে বের করো এবং সেগুলি খাতায় লেখো।

ক্ষে	অ	ত	ছ	উ	প	অ	ল	র	ঝ
থ	ন	উ	ট	ম	রি	ন	জ	য়	ত্র
গি	মা	ঘু	স	ক	স্র	নি	আ	ট	অ
ই	ন	দ	নে	জী	ব	গি	ব	নো	ব
ব	অ	থি	পা	ত	ন	ল	না	চা	সা
ঘ	ফ	ঠি	ঢ	দ	ব	বা	ফ	সা	দ
ড	ব	গ	সা	ও	ড	ছা	ম	হ্ব	ন
দ	স	ব	ভ	ঝা	ড়া	ই	নে	ক	গি
ক	অ	পি	হ	ষ	ঔ	সে	ন	স	ল
চৌ	স্ব	কী	য়	পৃ	থ	কী	ক	র	ণ

উপক্রম –

কাগজের নয়টি ত্রিভুজ কেটে নাও। নীচের ধাঁধাটি তার উপর লিখে নাও। দলে বসে এই নয়টি ত্রিভুজ এমনভাবে সাজাও যাতে সেগুলি দিয়ে একটি বড়ো ত্রিভুজ তৈরী হয় এবং প্রতিটি পাশে লেখা পৃথকীকরণ পদ্ধতির সামনে সেটির সঠিক উদাহরণ থাকে। সকলে একসাথে বসে ধাঁধাটি সমাধান করার চেষ্টা করো।

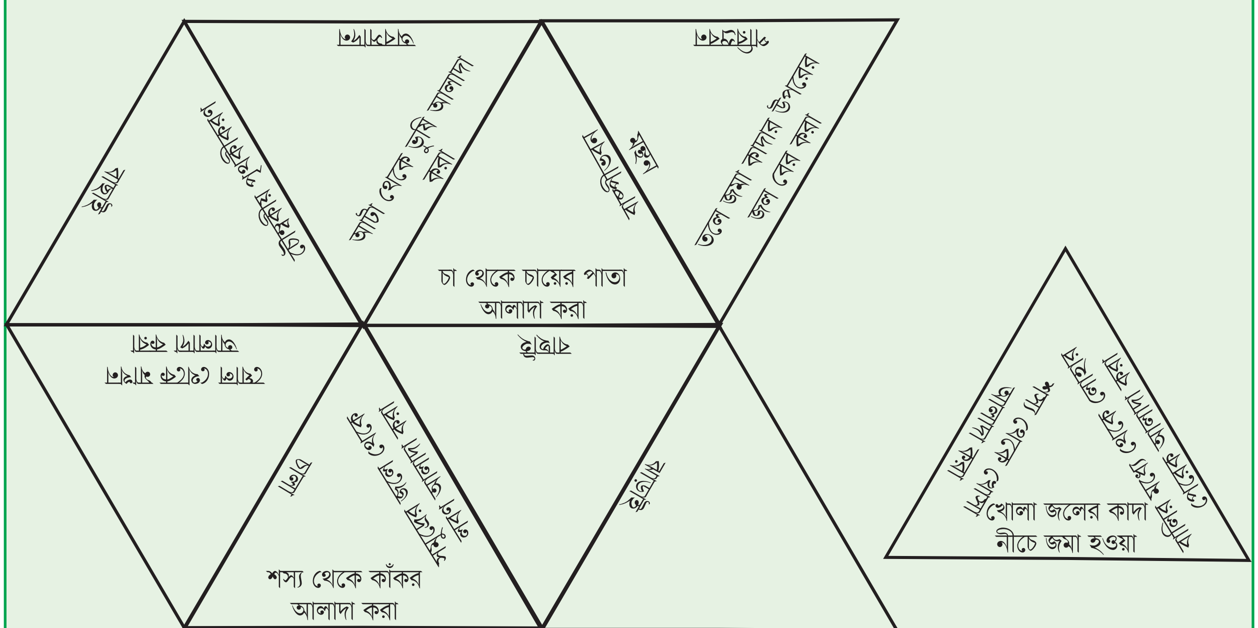

৪ সজীবদের বৈচিত্র্য

এই ছবিটি কোনো জঙ্গলের নয়। এগুলি সব মিলে আসলে একটি মাত্র গাছ! এটি হলো কলকাতার উদ্ভিদ উদ্যানের একটি ২৫০ বছর বয়সি বট গাছ। মাটির পর্যন্ত পৌছে যাওয়া ৩৫০০ থেকে ও বেশি ঝুরির আধার নিয়ে গাছটি দাড়িয়ে রয়েছে। কলকাতার উদ্যানে এই অতি বিশাল গাছটি দেখার জন্য বহু বিদেশী পর্যটক আসেন। ১৯২৫ সালে এই গাছের মূল কান্ডটি কেটে বাদ দিতে হয়েছিল, কারণ তাতে ছত্রাক লেগেছিল। তা সত্ত্বেও এই গাছটি এখনো বেড়েই চলেছে। পৃথিবীর সবচেয়ে বিশাল ৫৫০ বছর বয়সী একটি বট গাছ অন্ধ্র প্রদেশে রয়েছে। এর ছায়ায় একসাথে প্রায় দশ হাজার মানুষ বসতে পারে! কতটা বিশাল এর বিস্তার!

রাস্তার ধারের ঝোপ গাছ কি এই গাছের মতো বড়ো হতে পারে? তুলসী, গোলাপ, করমচা এদের ঝোপগুলি তেঁতুল বা আম গাছের মতো বড়ো হয় কি? আমরা এমন অনেক বড়ো গাছ দেখেছি যেগুলি খুব লম্বা হয় এবং আকারে বিশাল হয়। গোলাপ, করবী, জবা, মেহেদি এমন অনেক উদ্ভিদের উচ্চতা সাধারণত ৫-৬ ফুট পর্যন্ত বাড়ে। এদের আমরা গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ বলি। কিছু জাতের ঘাস মানুষের উচ্চতার চেয়েও বেশি লম্বা হয়, আবার কিছু জাতের ঘাস মাটির সাথে একেবারে লেগে থাকে। বর্ষাকালে ভেজা দেওয়ালের গায়ে মখমলের মতো সবুজ উদ্ভিদ গজাতে দেখো। এদের কোনো ডালপালা থাকে না, মূল থাকেনা এবং ফুল তো থাকেই না। ভেজা মেঝের ওপর জন্মানো শ্যাওলা এর চেয়ে ও আকারে ছোট হয়। চারপাশের উদ্ভিদের দিকে দেখো। বিশাল বৃক্ষ, নারকেল গাছের মতো লম্বা গাছ, নানা ধরনের গুল্ম, ঘাস এমন অনেক বৈচিত্র্য তোমরা দেখতে পাবে। কিছু উদ্ভিদ আবার এতই ছোট যে তাদের খালি চোখে দেখাই যায় না, কেবল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই দেখা যেতে পারে।

আমের বৃক্ষ

মেহেন্দির গুল্ম

ধনেপাতার চারাগাছ

তোমাদের আশেপাশে নীচের দেওয়া কোন কোন প্রকারের উদ্ভিদ রয়েছে ? তাদের একটি তালিকা তৈরী করো।

(অ) শক্ত কাণ্ড এবং ডালপালা থাকা উদ্ভিদ, যার ডালে মানুষ চড়তে পারে, এমন উদ্ভিদ...

(আ) মাটি থেকে শাখা-প্রশাখা বের হয়, যা খুব একটা লম্বা এবং শক্ত হয় না, এমন ঝোপ...

(ই) ডালপালা নেই কিন্তু কাণ্ড সোজা ওপরের দিকে বাড়ে, যার মাথায় পাতা থাকে, এমন উদ্ভিদ...

(ঈ) কাণ্ড এতটাই দুর্বল যে উদ্ভিদ নিজে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। পাশের গাছ, খুঁটি এই ধরনের অবলম্বনের চারিদিকে সবুজকান্ড পেঁচিয়ে ধরে...

কোনো অবলম্বনকে পেঁচিয়ে কিংবা স্প্রিং-এর মতো অংশের সাহায্যে অবলম্বন আঁকড়ে ধরে ওপরের দিকে বাড়ে এই ধরনের লতাকে আরোহী উদ্ভিদ বলে। ওপরের দিকে না বেড়ে মাটির সমান্তরালে ছড়িয়ে পড়া দূর্বা ঘাস এই ধরনের উদ্ভিদ তোমরা দেখেছ কি ? এই ধরনের উদ্ভিদকে লতানো উদ্ভিদ বলা হয়।

উদ্ভিদ বললেই আমাদের মনে পড়ে তাদের মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল এবং ফল। আমাদের চারপাশের উদ্ভিদজগতের প্রতিটি বিষয়ে বৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন উদ্ভিদের পাতাগুলি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করো। তাদের ছোট-বড়ো আকার, আকৃতি এবং পাতার প্রান্তের মধ্যে কী কী পার্থক্য দেখা যায় ?

কিছু পাতার বৈচিত্র্য

এই ধরনের পাতা রয়েছে এমন কোন কোন উদ্ভিদ তোমাদের পরিবেশে আছে? এগুলি ছাড়াও অন্যান্য ভিন্নতার পাতা তুমি দেখেছ কি? সেই পাতাগুলির ছবি আঁকো। প্রতিটি প্রকারের জন্য তোমারজানা অনুযায়ী পাতার নাম লেখো। তার থেকে যতগুলি পাতা পাওয়া যায় ততগুলি পাতা সংগ্রহ করো এবং প্রতিটি পাতা কোন উদ্ভিদের, তা চেনার একটি খেলা বন্ধুদের সাথে খেলো।

প্রত্যেকটি পাতার ওপর হাত বুলিয়ে সেটি মসৃণ নাকি খসখসে তা নির্ধারণ করো। ছোটো-বড়ো আকার, পাতার খসখসে বা মসৃণ ভাব, পাতার ওপরের শিরা, পাতার প্রান্ত, বোঁটার দৈর্ঘ্য এই ধরনের কোন-কোন ভিন্নতা দেখা যায়, তার একটি তালিকা তৈরী করো। এই ভিন্নতাকেই বৈচিত্র্য বলা হয়।

কিছু উদ্ভিদে কখনোই ফুল ফোটে না, কিছু উদ্ভিদে নির্দিষ্ট ঋতুতে ফুল ফোটে, আবার কিছু উদ্ভিদে বারোমাস অর্থাৎ সারা বছর ফুল ফোটে। ফুলের আকার, রঙ, পাপড়ির সংখ্যা এবং তাদের বিন্যাসের মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য থাকে। এই বৈচিত্র্য দেখানোর জন্য বিভিন্ন ফুলের ছবি আঁকো। প্রতিটি ফুল কোন উদ্ভিদের, তা ছবির নীচে লেখো।

কিছু উদ্ভিদের ফুল সুগন্ধী হয়, আবার কিছু উদ্ভিদের ফুলের গন্ধ ভালো লাগে না।

কিছু ফুলের বৈচিত্র্য

পর্যবেক্ষণ করো।

তুলসী, আম, আখ এই উদ্ভিদগুলিতে কি ফুল ফোটে? তোমার কী মনে হয়?
পর্যবেক্ষণ করো এবং তথ্য সংগ্রহ করো।

ফুল থেকে ফল তৈরী হয়। ফলের মধ্যেই সেই উদ্ভিদের বীজ থাকে। আম, জাম, বরই এই ফলগুলির ভেতরে কয়টি বীজ থাকে?কমলা, লেবু, কাঁঠাল এই ফলগুলির ভেতরে অনেক বীজ থাকে। আকার, রঙ, স্বাদ, বীজের সংখ্যা, ফলের খোসার পুরুত্ব এইরকম অনেক বিষয়ে উদ্ভিদের মধ্যে প্রচুর বৈচিত্র্য দেখা যায়।

- এক একটি ফলে ২০-২৫টির বেশি বীজ থাকে এমন কোন কোন ফল তোমার জানা আছে?
- ফল আছে কিন্তু ভেতরে কোনো বীজ নেই, এমন কোন কোন ফল তুমি জানো?

তোমরা জানো কী ?

কাশ্মীরে গোলাপের অনেক জাতের গাছ দেখা যায়। তার মধ্যে কিছু ছোট গুল্মজাতীয় গাছ, আবার কিছু লতানো মতো গাছের মাচা, দেয়ালের ওপর ছড়িয়ে পড়ে। সেখানকার কিছু জাতের গোলাপ গাছে ফলও ধরে।

গম, চাল, জোয়ারী, ভুট্টা, বাজরার দানা এগুলি হলো উদ্ভিদের বীজ। ছোলা, মটরশুঁটি, সরিষা, চীনাবাদাম এগুলিও বীজই। এদের মধ্যে প্রতিটি প্রকারের তিন-চারটি করে বীজ নাও। সেগুলিকে আলতো আঘাত করে দেখো প্রত্যেকটি বীজের ভাঙা অংশগুলি কেমন দেখায়। দুটি সমান ভাগে বিভক্ত হওয়া বীজ কোনগুলি ? আর কোনগুলি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে ? প্রত্যেকটি বীজ দিনভর জলে ভিজিয়ে রাখো। তারপর তার ওপরের খোসাটি ছাড়িয়ে নাও। কিছু বীজের ক্ষেত্রে দেখা যাবে তাদের দুটি সমান ভাগ থাকে। এমন বীজকে দ্বিবীজপত্রী বীজ বলা হয়। 'দ্বি' মানে দুই। যে বীজের দুটি আলাদা ভাগ থাকে না সেগুলিকে একবীজপত্রী বলা হয়।

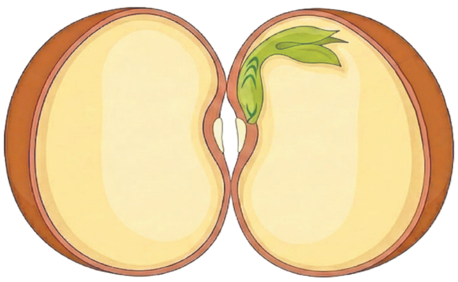

দ্বিবীজপত্রী

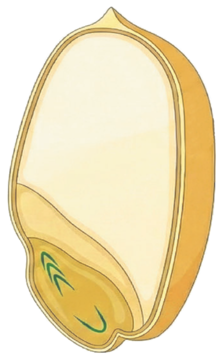

একবীজপত্রী

◉ **শিরাবিন্যাস** – অশ্বত্থ গাছের পাতা কয়েকদিন জলে ভিজিয়ে রাখলে তার নরম অংশটি পচে যায়। শেষ পর্যন্ত কেবল একটি জালের মতো কাঠামো অবশিষ্ট থাকে। এই জালটি কিসের ? অশ্বত্থ, সেগুন গাছ ইত্যাদির পাতা কয়েকদিন জলে থাকলে এমন জালের মতো হয়ে যায়। তুলসী, চন্দ্রমল্লিকা বা অন্যান্য উদ্ভিদের পাতা জলে থাকলে তাদের পাতা এমন জালের মতো হয় না। এই পার্থক্য কেন রয়েছে ? তোমরা নিজেরাই অনুমান করো।

উদ্ভিদের মূল মাটি থেকে সংগ্রহিত জল পাতার সমস্ত অংশে পৌঁছায়। তার সাথে কি এই জালের কোনো সম্পর্ক আছে ?

করে দেখো।

আম, বট, অশ্বত্থ গাছের কিছু পাতা নাও। তার মধ্যে একটা পাতা হাতে নাও। আঙুলের ডগায় সেটির কিনারা ধরে বাইরের দিক থেকে মাঝখান পর্যন্ত পাতাটি একদম সোজা ছেঁড়ার চেষ্টা করো। আরও দুই-তিন বার চেষ্টা করো। একই রকম চেষ্টা অন্যান্য পাতার জন্যও করে দেখো।

এখন কলা অথবা কর্দলী গাছের পাতা নাও। ওপরের নিয়ম অনুসারেই কিনারা থেকে মাঝখানের দিকে সেটি ছেঁড়ার চেষ্টা করো, কিন্তু এইবার পাতাটি আঁকাবাঁকা হয়ে ছিঁড়ে যাওয়া উচিত। এই চেষ্টা বারবার করে দেখো। কী ঘটলো এই দুই ধরনের কৃতির মধ্যে ? কেনো ঘটলো ?

যে পাতাগুলিতে শিরার একটি জটিল জাল তৈরী হয়, সেই পাতাগুলি সোজা ছেঁড়ে না। যেসব পাতার শিরাগুলি খাতার কাগজের লাইনের মতো একে অপরের সমান্তরাল থাকে, সেই পাতাগুলি আঁকাবাঁকা হয়ে ছেঁড়ে না। পাতার ভেতরের শিরার এই বিন্যাসকে **শিরাবিন্যাস** বলা হয়। এটি প্রধানত দুই প্রকারের - **জালিকা শিরাবিন্যাস** এবং **সমান্তরাল শিরাবিন্যাস**। পাতার দিকে তাকিয়েই তার শিরাবিন্যাস কেমন হবে, তা অনুমান করা যায়। আখ, জোয়ারী, গম ইত্যাদি গাছের পাতার শিরাবিন্যাস কী ধরনের হতে পারে, তা তুমি নিজেই নির্ধারণ করো।

◉ **মূল** – উদ্ভিদের মূল ভূমিতে, মাটির নীচে বৃদ্ধি পায়। এগুলি বাইরে থেকে দেখা যায় না। কিন্তু বাজারে পাওয়া কিছু শাকসবজি, আখ, পশুখাদ্যের জন্য আনা জোয়ার-বাজরার খড় মাটি থেকে উপড়ে তোলা হয়। তখন আমরা এদের মূল দেখতে পাই। এমন কিছু উদ্ভিদের মূল ভালো করে দেখো।

- তীব্র ঝড় হলে মাঠের জোয়ারী, বাজরার মতো খাড়া ফসল এবং নারকেল গাছের প্রচুর ক্ষতি হয়। এমন গাছ প্রবল বাতাসে মূলসহ উপড়ে পড়ে যায়। তবে তেঁতুল, আম, জাম ইত্যাদির গাছ সহজে উপড়ে পড়ে না।
- ঘাস এবং আখ সামান্য শক্তি প্রয়োগ করে টেনে তুললে মূলসহ উপড়ে আসে। কিন্তু আম্বাড়ি, ঢ্যাঁড়শ, বেগুন ইত্যাদির চারা সহজে উপড়ে ফেলা যায় না। কাণ্ডের গোড়া থেকে তৈরী হওয়া প্রধান মূল, তার থেকে বের হওয়া শাখা-প্রশাখা এবং তার থেকে আরও ছোট ছোট শাখা এই ধরনের মূলকে **'প্রধান মূল'** বলা হয়। আর কাণ্ডের গোড়া থেকে সুতোর গুচ্ছের মতো বৃদ্ধি পাওয়া মূলগুলিকে **'গুচ্ছমূল'** বলা হয়।

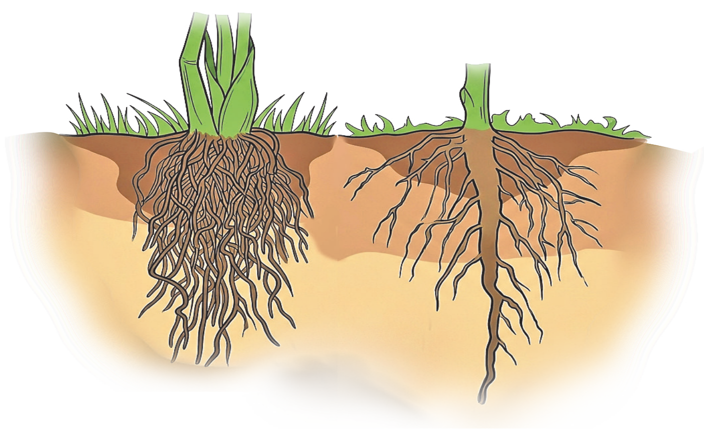

এর মধ্যে কোন মূল উদ্ভিদকে শক্ত আধার দিতে পারবে ?

গম, ধান, জোয়ারী, বাজরা, ভুট্টা হলো একবীজপত্রী উদ্ভিদ। এই উদ্ভিদের পাতার শিরাবিন্যাসগুলি সমান্তরাল নাকি জালিকাযুক্ত ? এদের মূল কোন ধরনের হয়ে থাকে ? এই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করা যায়।

সব ধরনের একবীজপত্রী উদ্ভিদের মূল গুচ্ছমূল প্রকৃতির হয়। এই সমস্ত উদ্ভিদের পাতার শিরাবিন্যাস সমান্তরাল থাকে। জালিকাযুক্ত শিরাবিন্যাস এবং প্রধান মূল হলো দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য।

এখন নির্ধারণ করো যে কলা, আখ, বাঁশ এই উদ্ভিদগুলি একবীজপত্রী নাকি দ্বিবীজপত্রী ?

বট, তুলসী, সরিষা এই উদ্ভিদগুলি কি একবীজপত্রী ?

তোমরা জানো কী ?

উদ্ভিদকে আধার প্রদান করা, মাটির আর্দ্রতা এবং খনিজ পদার্থ শোষণ করা হলো মূলের কাজ। কিছু উদ্ভিদের মূল সেই উদ্ভিদের তৈরী করা খাদ্য সঞ্চয় করার কাজও করে থাকে। এই ব্যবস্থা কেবল কিছু উদ্ভিদের মধ্যেই দেখা যায়।

সূক্ষ্ম সুতোর মতো দেখতে মূলরোমগুলি মাটি থেকে জল শোষণ করে তা উদ্ভিদকে সরবরাহ করে। এই মূলরোমগুলি মূলেরই অংশ। আলু এবং কিছু কন্দজাতীয় উদ্ভিদের খাঁজ থেকে অঙ্কুর বের হয়। এগুলি আসলে কাণ্ডের অংশ।

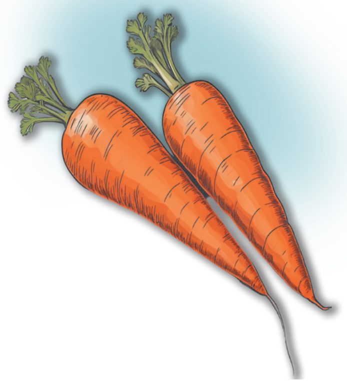

নদী, পুকুরের জলের উপর ভাসমান কিছু উদ্ভিদ খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। নীচে যে জল আছে তা বোঝাই যায় না, এতটাই ঘনভাবে তারা জলের ওপর সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। পদ্মের লতা, জল-ঘাসের মতো উদ্ভিদ কি জমির মাটিতে জন্মাবে ?

হিমালয়ের মতো অতি শীতল, বরফাবৃত অঞ্চলে জন্মানো উদ্ভিদ কি মরুভূমিতে বেঁচে থাকবে ?

উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য অনুকূল পরিবেশকে সেই উদ্ভিদের অধিবাস বলা হয়। পদ্ম এই উদ্ভিদের অধিবাস হলো জলীয়, অন্যদিকে বাবলা, নাগফণির মতো কিছু উদ্ভিদের অধিবাস হলো শুষ্ক অর্থাৎ কম জলের বা মরুভূমি অঞ্চল।

মরুভূমি অঞ্চলের উদ্ভিদ বরফাবৃত অঞ্চলে বেঁচে থাকতে পারে না। একইভাবে, বরফাবৃত অঞ্চলের উদ্ভিদ মরুভূমিতে জন্মায় না।

মাটির প্রকার, তাপমাত্রা, দিনের বেলা সূর্যালোক পাওয়ার মোট সময় এবং সেই স্থানে আসেপাশে থাকা অন্যান্য জীব এমন অনেক বিষয়ের সাথে অধিবাসের সম্পর্ক থাকে।

◉ এই খেলাটি খেলে দেখো -

শ্রেণীর প্রত্যেকেই কাগজ ও কলম নিয়ে তৈরী থাকো। শিক্ষক যখনই টেবিলের ওপর চামচ দিয়ে শব্দ করবেন, প্রত্যেকেই পনেরোটি প্রাণীর নাম লিখবে। তিন মিনিট পর শিক্ষক আবার শব্দ করবেন, তখন লেখা বন্ধ করতে হবে। এরপর প্রত্যেকে নিজের নিজের তালিকা পড়ে শোনাবে। কোন প্রাণীর নাম পুনরায় কতবার এসেছে তা লিখে রাখবে। ভিন্ননাম এলে তা বোর্ডে লিখবে।

সবাই মিলে বলা প্রাণীদের নাম দিয়ে বোর্ডে একটি বড়ো তালিকা তৈরী হবে। সেই তালিকাটি দেখে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজো।

- কোন কোন প্রাণীর নাম সকলেই লিখেছে ?
- তালিকায় থাকা বিভিন্ন প্রাণীদের কটি করে পা আছে, তা মনে করো। চার পায়ের কতোগুলি প্রাণী সকলের মনে পড়েছে ? দু পায়ের প্রাণী কটি ? চার থেকে কম পায়ের এবং চার থেকে বেশি পায়ের কোন কোন প্রাণী তালিকায় আছে ?

রমেশ যখন নিজের তালিকা পড়ে শোনাচ্ছিল, তখন প্রাণীদের নাম বলতে বলতে সে বলল, ‘‘কাক।’’ শ্রেণীকক্ষের সবাই জোরে হেসে উঠল। একজন বলল, ‘‘আরে, কাক তো একটা পাখি, প্রাণীদের তালিকায় ওর নাম কেনো ?’’ সুষমার তালিকায় মশার নাম ছিল। তখনও সবাই হাসল এবং বলল, ‘‘ও তো একটা পতঙ্গ প্রাণী নয়।’’
তোমাদের কী মনে হয় ?

বোর্ডে লেখা নামগুলি দেখলে তোমাদের মনে হবে যে, প্রাণী বললেই অনেকের শুধু চার পায়ের প্রাণীদের কথাই মনে পড়ে। যেমন - গরু, মহিষ, কুকুর, কিংবা কারও কারও হাতি, বাঘ, সিংহের কথা মনে আসে। কিন্তু এই তালিকায় বাদুড়, আরশোলা, কেঁচো, উইপোকার মতো নামগুলি দেখা যায় না।

আসলে এরা সবাই কিন্তু প্রাণীই। প্রাণী এবং উদ্ভিদ হলো জীবজগতের দুটি প্রধান দল। নদী, পুকুরের জলের অণুজীব, খুব ছোট আকারের কীট-পতঙ্গ, পাখি, সরীসৃপ এরা সবাই প্রাণী। এদের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকলেও মিলও রয়েছে। কিছু প্রাণী আমাদের পরিচিত থাকে, আবার কিছু প্রাণী সম্পর্কে আমরা জানলেও তারা আমাদের আশেপাশে থাকে না। জিরাফ, ক্যাঙ্গারু, উটপাখির মতো অনেক প্রাণীর কথা আমরা জানি, কিন্তু তারা আমাদের এখানে নাই। আশেপাশের পরিবেশের সাথে যারা মানিয়ে নিতে পারে সেই ধরনের প্রাণীরাই সেই পরিবেশে পাওয়া যায়। সেটাই হলো তাদের অধিবাস।

হিমালয়ের বরফাবৃত অঞ্চলের ভাল্লুক সেখানকার পরিস্থিতি, সেখানে পাওয়া খাদ্য এবং ঠান্ডার সাথে মানিয়ে নিয়ে সেখানে বেঁচে থাকে। তাদের পক্ষে আমাদের এখানের জঙ্গলে বেঁচে থাকা কঠিন হবে। একই কথা জিরাফ, ক্যাঙ্গারু, উটপাখির মতো অন্যান্য অনেক প্রাণীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যে পরিবেশে প্রাণীরা স্বাচ্ছন্দ্যে বেঁচে থাকতে পারে, সেটাই হলো সেই প্রাণীদের অধিবাস। উটের অধিবাস হলো মরুভূমি অঞ্চল, আর কুমির বা ঘড়িয়ালের অধিবাস হলো বড়ো জলাশয়ের তীরবর্তী অঞ্চল !

বিভিন্ন প্রাণীর অধিবাস পরিবেশের তাপমাত্রা, খাদ্যের প্রাপ্যতা, পরিবেশের অন্যান্য প্রাণীদের ওপর নির্ভর করে।

তোমরা জানো কী ?

কিছু দেশের বড়ো বড়ো চিড়িয়াখানায় মহিষ রাখা আছে। তা দেখার জন্য অনেক মানুষ টাকা খরচ করে সেখানে যায় ! এর পেছনের কারণ কী হতে পারে ?

⦿ কিছু অধিবাস, সেখানকার প্রাণী – আমাদের চারপাশে অনেক প্রাণী মাটিতে থাকতে দেখা যায়। বাঘ, ছাগল, শেয়াল, নেকড়ের মতো অনেক প্রাণীর নাম তুমি বলতে পারবে। ইঁদুর, ঘুঁস, ছুঁচো এদের মতো অনেক প্রাণী গর্তে বাস করে। **মাটিতে বসবাসকারী সব প্রাণীকে স্থলচর প্রাণী বলা হয়।** হাঁটা, দৌড়ানো, লাফানো এই সমস্ত বিভিন্ন উপায়ে এই প্রাণীরা চলাফেরা করে।

মাছেরা সারা জীবন জলেই থাকে। তারা শরীরের দু'পাশে থাকা পাখনা এবং লেজের সাহায্যে জলে সাঁতার কাটে। তারা জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন ফুলকার সাহায্যে গ্রহণ করে। বাতাসের অক্সিজেন তারা নিতে পারে না। সম্পূর্ণ জীবন জলে জীবিত থাকা প্রাণীদের জলচর প্রাণী বলা হয়। কিছু প্রাণীর জীবনচক্রে এমন একটি পর্যায় থাকে যখন তারা পুরোপুরি জলে বাস করে এবং তাদের জীবনের পরবর্তী অংশে তারা মাটিতে ও জলেথাকতে পারে। **উভয় জায়গায় বাস করতে পারে বলে এদের উভচর প্রাণী বলা হয়।** তারা দীর্ঘ সময় জলের নীচে থাকতে পারে। তবে অক্সিজেন নেওয়ার জন্য তাদের মাঝে মাঝে জলের উপর নাক তুলে হাওয়া থেকে শ্বাস নিতে হয়।

পাখিরা দীর্ঘক্ষণ গাছে থাকে, আকাশে ওড়ে। তাই তাদের খেচর (অর্থাৎ আকাশে বিচরণকারী) বলা হয়।

অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে করা পর্যবেক্ষণ বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের পারস্পারিক সম্পার্কের অধ্যয়ন করে ঋষি চরক বহু বছর আগে যে শ্রেণীবিন্যাস করেছিলেন তা 'চরকসংহিতা' নামের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তিনি শুধুমাত্র স্থলচর প্রাণীদেরই নয় বরং মাটির নীচে বসবাসকারী (বিলাশয়া), শুষ্ক ভূমিতে বসবাসকারী (ধন্বাচরা) , কাদাযুক্ত জলাভূমিতে বসবাসকারী বুনোমহিষের মতো প্রাণী (আনূপ), গাছের জলে বসবাসকারী (শাখাদ), জলে বসবাসকারী মাছ সদৃশ(বারিশয়া), জলের পৃষ্ঠাংশে বিচরণকারী হংসের মতো পাখি (বারিচরা) এবং গুহায় বসবাসকারী (গুহাশয়া) এই সকল শ্রেণীবিন্যাস ও সেই প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন।

- **আমাদের এখানকার হাতি এবং আফ্রিকার জঙ্গলের হাতি কি দেখতে একই রকম? বরফের অঞ্চলের ভাল্লুক কি আমাদের চেনা ভাল্লুকদের মতোই হয় নাকি একটু আলাদা?**

তোমরা জানো কী?

মেরুভূমির উট

লাদাখের উট

- *মেরুভূমির উটের পা লম্বা হয়। এর ফলে উটের শরীর গরম বালি থেকে কিছুটা উঁচুতে থাকে, পেটে গরমের ছ্যাঁকা লাগে না। লাদাখের মতো বরফাবৃত অঞ্চলের উটের পা খাটো থাকে। তাদের খুর বেশ ছড়ানো হয় ও বেশী চওড়া হয়। এই কারণে এই উটগুলি বরফের উপর সহজে চলাফেরা করতে পারে। তাদের ঘাড়েও শরীরে থাকা ঘন লোমের কারণে এদের শরীর উষ্ণ থাকে, শরীরে বরফ জমে থাকতে পারে না।*
- *নদী, পুকুরের জলে মাটি ও লতাপাতার কণা থাকে। সাঁতার কাটার সময় এই কণাগুলো যাতে চোখে না যায়, সেজন্য মাছের চোখের উপর স্বচ্ছ পর্দা থাকে।*

আমরা কী শিখলাম ?

- পাতা, ফুল, কাণ্ড, মূল এগুলি উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ।
- উচ্চতা, কাণ্ডের স্বরূপ, পাতার আকার, বীজপত্রের সংখ্যা, ফুল থাকা বা না থাকা, মূলের প্রকার ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়।
- বৃক্ষ, গুল্ম, চারাগাছ, আরোহী লতা, মাটিতে ছড়িয়ে পড়া লতা এগুলি কাণ্ডের প্রকারভেদ অনুযায়ী উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ।
- বীজপত্রের সংখ্যার ভিত্তিতে উদ্ভিদের একবীজপত্রী এবং দ্বিবীজপত্রী এই দুই প্রকারের হয়।
- জালিকা শিরাবিন্যাস এবং সমান্তরাল শিরাবিন্যাস এই দুই প্রকারের শিরাবিন্যাস উদ্ভিদের পাতায় থাকে।
- পাতার শিরাবিন্যাস এবং মূলের প্রকার দেখে উদ্ভিদটি একবীজপত্রী নাকি দ্বিবীজপত্রী তা চেনা যায়।
- বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদ অনুকূল পরিবেশে বসবাস করে। সেই পরিবেশকে তাদের অধিবাস বলা হয়।
- পরিবেশের পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেওয়ার সময় জীবের শারীরিক গঠনও স্বভাবে কিছু পরিবর্তন ঘটে।

অনুশীলনী

(১) সঠিক জোড়া মেলাও।

সমূহ-অ	সমূহ-ব
(১) জলচর	(i) ব্যাঙ
(২) কাদাযুক্ত জলভূমিতে বসবাসকারী	(ii) হংস
(৩) উভচর	(iii) বুনোমহিষ
(৪) জলের পৃষ্ঠে বিচরণকারী	(iv) মাছ

(২) বেমানান শব্দটি খোঁজ করো,কারণ লেখো।

(অ) গরু, ঘোড়া, ছাগল, মাছ

(ব) আম, অশ্বত্থ, পেয়ারা, ধনেপাতা

(ক) ক্যাঙ্গারু, চিতাবাঘ,আরশোলা, হরিণ

(ড) মুগ, জোয়ারী, গম, বাজরা

(৩) সত্য অথবা মিথ্যা লেখো।

(অ) মেহেন্দি হলো গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ।

(ব) প্রধান মূল থাকা বৃক্ষগুলি ছোট ঝড়ে সহজেই ভেঙে পড়ে যায়।

(ক) আম গাছে ফুল হয় না।

(ড) সাদা ভাল্লুক মরুভূমিতে থাকে।

(ই) কিছু প্রজাতির সাপ উভচর থাকে।

(৪) প্রথম জোড়ার সম্পর্ক দেখে দ্বিতীয় জোড়ার সম্পর্ক লেখো।

(অ) গাছের শাখায় বসবাসকারী : বানর :: মাটির নীচে বসবাসকারী : ....

(আ) শুকানো মাটিতে বসবাসকারী : ঘোড়া :: গুহায় বসবাসকারী : ....

(৫) নীচের ছবিগুলি দেখো। এদের দেখে উদ্ভিদগুলির বিষয়ে কী কী তথ্য জানা যায় ? সমস্ত বিন্দুগুলি খাতায় লেখো।

(৬) তুলসী উদ্ভিদটি বৃক্ষ, গুল্ম নাকি চারাগাছ এটি নির্ধারণ করার জন্য তুমি কোন কোন বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচনা করবে ?

(৭) একবীজপত্রী এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করো।

(৮) হাঁস এই প্রাণীর অধিবাস কোনটি এবং কেনো ?

(৯) গর্তে অধিবাস থাকে এমন তিনটি প্রাণীর নাম লেখো।

উপক্রম –

আশেপাশের পরিবেশে পরিবর্তনের কারণে কিছু প্রাণীদের সেখানে জীবিত থাকা কঠিন হয়। তাদের সংখ্যা কমে যেতে থাকে। এইভাবে মহারাষ্ট্র থেকে বিলুপ্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকা কিছু প্রাণীর ছবি ও তথ্য সংগ্রহ করো, তা লিখে রাখো।

৫ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

• ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৩। ভোর ৩টে বেজে ৫০ মিনিটের সময়। সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। লাতুর জেলার কিল্লারী নামের একটি ছোট গ্রামের মাটির নীচের শিলাস্তরে কিছু নড়াচড়া হলো এবং তার ফলে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প হলো। কিল্লারী এবং আশেপাশের এলাকার মাটি দুই মিনিট ধরে কাঁপতে থাকে। **পাথর ও মাটি দিয়ে তৈরী দেড় লক্ষ ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ে। সেখানে শুধু পাথর ও মাটির স্তূপ রয়ে গেল। তার নীচে চাপা পড়ে প্রায় ১০ হাজার গ্রামবাসী মারা যায়।**

• ২৬শে ডিসেম্বর ২০০৪। সকাল আনুমানিক ৭টার সময় ভারত মহাসাগরের তলদেশে ভূমিকম্প হয়। এর ফলে মহাসাগরে প্রচন্ড দানবীয় ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। চারদিকে ধেয়ে যাওয়া এই ঢেউ ১৪টি দেশের উপকূলে আছড়ে পড়ে। সেখানকার রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, শহর সব জলের নীচে! **মৃত মানুষের সংখ্যা ছিল প্রায় দুই লক্ষ কুড়ি হাজার! মৃত্যু প্রাপ্ত পশু, পাখি, ধ্বংস হওয়া গাছপালার তো কোনো হিসাবই নেই।**

• ৩রা ডিসেম্বর ১৯৮৪। ভারতের ভোপাল নামক বিখ্যাত শহরের কাছের একটি কারখানায় বিষাক্ত রাসায়নিক জমা রাখা একটি বড়ো ট্যাঙ্ক থেকে গ্যাস লিক হতে শুরু করে। বাতাসের কারণে এই গ্যাস কয়েক মিনিটের মধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শ্বাস নিতে প্রচণ্ড কষ্ট হওয়া, দম বন্ধ হয়ে আসা, চোখে তীব্র জ্বালাপোড়া ও যন্ত্রণার কারণে যে যার মতো জীবন বাঁচাতে বাইরে দৌড়াতে শুরু করে। পশুপাখিদের অবস্থাও একই রকম হয়েছিল! দুই ঘণ্টার মধ্যে ৪০ টন বিষাক্ত গ্যাস বাতাসে মিশে যায়। প্রথম ঘণ্টার মধ্যেই হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। **এর থেকে বেঁচে যাওয়া হাজার হাজার মানুষ আজও বিভিন্ন শারীরিক কষ্ট সহ্য করছেন।**

• **মেঘভাঙা বৃষ্টি** - আগে থেকে অনুমান করা অসম্ভব, আবহাওয়ার এমন এক ভয়াবহ ঘটনা। কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকায় খুব কম সময়ের মধ্যে, আকাশে যেন বাঁধ ভেঙে গেছে এমন প্রচণ্ড মাত্রায় বৃষ্টি হওয়াকে মেঘভাঙা বৃষ্টি বলে! এই বৃষ্টির পরিমাণ এতটাই বেশি হয় যে কয়েক মিনিটের মধ্যে সেই জলে গ্রাম, জঙ্গল ভেসে চলে যায়। **কাদার এক মহাবন্যা আসে।** বন্যা কমে যাওয়ার পর পেছনে পড়ে থাকে শুধু কাদা। এখানে যে একটা গ্রাম ছিল, তার কোনো চিহ্নও অবশিষ্ট থাকে না। এই বন্যা পরবর্তী গ্রামগুলিতেও গিয়ে পৌঁছায়। কী অবস্থা হয় তখন সেখানকার ঘরবাড়ি, স্কুল, গ্রাম এবং মানুষের ?

এগুলি আকস্মিক বিপদের কিছু উদাহরণ। এ ছাড়া বড়ো রেল দুর্ঘটনা, নদীর বন্যা, জঙ্গলের ভয়াবহ আগুন প্রভৃতি সংকটের খবরও মাঝেমধ্যে আসে। হঠাৎ আসা এই ধরনের সংকটকে **দুর্যোগ** বলা হয়।

কিছু দুর্যোগ প্রকৃতির নানা ঘটনার কারণে ঘটে থাকে। এগুলিকে **প্রাকৃতিক দুর্যোগ** বলা হয়। কিছু দুর্যোগ এড়ানোর জন্য আগে থেকেই ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়। আবার কিছু দুর্যোগ রোধ করা আমাদের হাতে থাকে না। এই ধরনের দুর্যোগ দেখা দিলে তার মোকাবিলা করার জন্য এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে সময় মতো পৌঁছে দেওয়ার জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকা ভালো। এর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা, প্রস্তুতি এবং কাজকে **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা** বলা হয়।

কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগ

◉ ভূমিকম্প – মাটির গভীরে অনেক নীচে পাথরের নড়াচড়ার কারণে একটি বিশাল অঞ্চলের জমি কেঁপে ওঠে, কম্পন সৃষ্টি হয়। একে **'ভূমিকম্প'** বলে। ভূমিকম্প হলে পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে প্রচুর শক্তি নির্গত হয়। মাটির নীচে যে স্থান থেকে এই শক্তি নির্গত হয়, তাকে **'ভূকম্পকেন্দ্র'** বলা হয়। পাথরের স্তরের ফাটল এবং দুর্বল অংশের কারণে সেখানে এমন নড়াচড়া ঘটে। কখনো কখনো এই নড়াচড়া অত্যন্ত তীব্র হয়। ভূমিকম্পের কারণে ঘরবাড়ি বা ভবন ভেঙে পড়ে, মাটিতে ফাটল ধরে। জীবন ও সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি মৃদু বা তীব্র উভয় প্রকারেরই হতে পারে। ভূমিকম্পের তীব্রতা পরিমাপক যন্ত্রকে 'ভূমিকম্পমাপক' বলা হয়। **ভূমিকম্পের তীব্রতা 'রিক্টার স্কেল' এককে মাপা হয়।** এই স্কেল অনুযায়ী ৯ম শ্রেনীর ভূমিকম্প অত্যন্ত ভয়াবহ হয়। এতে পুরো শহর ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

ভূমিকম্পের কেন্দ্র যদি সমুদ্রের তলদেশে থাকে তাহলে ?

ভূকম্পকেন্দ্র যদি সমুদ্রের তলদেশে হয়, তবে সমুদ্রে অত্যন্ত বিশাল আকারের ঢেউ সৃষ্টি হয়। জলের প্রাচীরের মতো এই ঢেউগুলি তীব্র গতিতে সমুদ্র থেকে উপকূলের দিকে ধেয়ে আসে এবং উপকূলে ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি করে। একেই **'সুনামি'** বলা হয়। এই সুনামির ঢেউ উপকূল থেকে স্থলভাগের অনেক দূর পর্যন্ত প্রবেশ করে এবং বিপর্যয় ঘটায়।

ভূমিকম্পের সময় কী করবে, কী করবে না।

কী করবে	কী করবে না
• শান্ত থাকো। আতঙ্কিত হয়ে যেও না। • টেবিল, খাট বা যেকোনো মজবুত আসবাবপত্রের নীচে আশ্রয় নাও। মাথা ও ঘাড় হাত দিয়ে ঢেকে রাখো। • ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি না থামা পর্যন্ত নিরাপদ স্থানে অপেক্ষা করো। যদি বাইরে থাকো, তবে খোলা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াও। • ভূমিকম্পের পর ভবনের অবস্থা পরীক্ষা করো। বিপদ মনে হলে বাইরে বেরিয়ে এসো। • আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দাও। তাড়াহুড়ো করে দৌড়া-দৌড়ি করবে না।	• লিফ্ট ব্যবহার করবে না। • জানালা, আয়না, ফ্যান বা ভারী কোনো বস্তুর পাশে গিয়ে দাঁড়াবে না। • গুজব বিশ্বাস করবে না। • গুজব ছড়াবে না।

ভেবে দেখো।

শহরগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার কেবল্স এবং জল সরবরাহ করার পাইপ মাটির নীচে থাকে। ভূমিকম্প হলে সেই কেবল ও পাইপগুলি যেমন আছে ঠিক তেমনই থাকবে কি? সেতু, রাস্তা, রেলপথের ওপর ভূমিকম্পের কী প্রভাব পড়বে? বড়ো ভূমিকম্প হওয়ার পর নদীর প্রবাহে কি কোনো পরিবর্তন হতে পারে? কুয়ো, নলকূপ ইত্যাদিতে জল নিয়ে আসা ভূগর্ভস্থ জলের উৎসগুলির ওপর কি ভূমিকম্পের প্রভাব পড়ে?

ভূমিকম্পের কারণে হওয়া প্রভাব

- অনেক বাড়ি-ঘর, ইমারত ভেঙে পড়ে।
- রাস্তা ও সেতু ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় সাহায্য পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়ে।
- আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। বিদ্যুৎ সরবরাহকারী কেবল্স ছিঁড়ে যায়।
- মাটির নীচের কেবল বা পাইপ কোথায় ফেটেছে বা ভেঙেছে, তা খুঁজে বের করা কষ্টকর হয়।
- রেললাইন বেঁকে যায়। নদীর গতি পথ বদলে যেতে পারে। এর ফলে কিছু এলাকায় বন্যা এবং কিছু এলাকায় খরা এমন দ্বিমুখী দুর্যোগ দেখা দেয়।

◉ নদীর বন্যা – নদীর তীরবর্তী গ্রামগুলির জন্য বন্যার দুর্যোগ একটি বড়ো বিপদ। নদী তার উৎপত্তিস্থল থেকে অনেক দূর পর্যন্ত বয়ে চলে। এর মধ্যে যেকোনো অঞ্চলে অতিবৃষ্টি হলে নদীতে বন্যা দেখা দেয়। এর ফলে পরবর্তী গ্রামগুলি ও কৃষিজমির ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি হয়। বন্যা যদি খুব বড়ো আকারের হয়, তবে তাকে 'মহাপ্লাবন' বলা হয়। বন্যা বা মহাপ্লাবনের মতো দুর্যোগ কেনো আসে?

(অ) প্রাকৃতিক কারণসমূহ -

- অত্যাধিক বৃষ্টিপাত বা মেঘভাঙা বৃষ্টির কারণে অল্প সময়ে হঠাৎ প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় জমিতে অতিরিক্ত জল জমে যায়। এর ফলে বন্যা আসে। পার্বত্য অঞ্চলের বরফ গলে বিপুল পরিমাণ জল নদীতে চলে আসায় নদীর তীরে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। হিমালয় থেকে উৎপন্ন হওয়া নদীগুলিতে গ্রীষ্মকালে এমন বন্যা বারবার দেখা যায়। এছাড়া প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি এবং অতিবৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণেও ব্যাপক ক্ষতি হয়।

(ব) মানবসৃষ্ট কারণসমূহ -

- নদীর তীরের কাছাকাছি এলাকা ভরাট করা। সেখানে ঘর-বাড়ি, রাস্তা ঘাট তৈরি করার ফলে নদীর জল চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে।
- বড়ো বড়ো বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণে অবহেলা করার কারণে বাঁধ ভেঙে যাওয়া।
- শহরাঞ্চলে নর্দমা সময় মতো পরিষ্কার না করা, প্লাস্টিকের আবর্জনা সঠিক ব্যবস্থাপনা না করার কারণে নর্দমা বন্ধ হয়ে যায় এবং শহরে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

বন্যার জল চারদিকে ছড়িয়ে পড়ায় অনেক বাড়িতে জল ঢুকে যাওয়া, বাড়ির ওপর দিয়ে ও রাস্তার ওপর দিয়ে জল যাওয়ার মতো সমস্যা তৈরী হয়। সেখানে আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধার করা কঠিন হয়ে পড়ে। এর জন্য ছোট নৌকা, লম্বা দড়ি, খাবার, ওষুধ ও পানীয় জল, খাবারের প্যাকেট তৈরী রাখা এবং আগে থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাহসী উদ্ধারকারী দল প্রস্তুত রাখা এই সব কিছুই হলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা।

◉ **ঝড়** – যখন কোনো স্থানের বায়ুমণ্ডলের চাপ কোনো কারণে কমে যায়। তখন উচ্চচাপের অঞ্চল থেকে নিম্নচাপের অঞ্চলের দিকে দ্রুত বাতাস বইতে শুরু করে। এর ফলে ঝড়ের সৃষ্টি হয়। সমুদ্রে সৃষ্ট ঝড়গুলি স্থলভাগের দিকে আসে। সমুদ্রে তৈরী হওয়া ঘূর্ণিঝড় অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক হয়ে থাকে।

ঝড়ের প্রভাব-

(১) জীবন ও সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি হয়।

(২) মাঠের ফসল, ফলের বাগানের প্রচুর ক্ষতি হয়।

(৩) বড়ো বড়ো গাছ এবং বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়ে। এর ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং যাতায়ত ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

বর্তমানে বড়ো ঝড়ের পূর্বাভাস আগেই পাওয়া যায়। রেডিও, টিভি, খবরের কাগজের মাধ্যমে এই বিষয়ে তথ্য দেওয়া হয়। সেই সাথে সতর্কতামূলক নির্দেশনাও দেওয়া হয়। সেগুলি কখনোই অবহেলা করা উচিত নয়।

ঝড়ের সময় কী করবে।	ঝড়ের সময় কী করবে না।
• কোনো নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নাও। • দরজা ও জানালা বন্ধ রাখো। • আবহাওয়া দপ্তরের নির্দেশনা শোনো। • বিদ্যুতের তার, গাছপালা থেকে দূরে থাকো। • পানীয় জল, কিছু খাবার এমন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সাথে রাখো।	• গুজব ছড়াবে না। • গুজবে বিশ্বাস করবে না। • জলে বা নদীর তীরে যাবে না। • গাছের নীচে বা বিদ্যুতের খুঁটির পাশে দাঁড়াবে না। • ঝড়ের মধ্যে ঘরের বাইরে যাবে না।

ভেবে দেখো।

ঝড়, বৃষ্টির বিষয়ে আবহাওয়া দপ্তরের নির্দেশনা পাওয়ার পর কৃষকদের কী করা উচিত ?

◉ **দাবানল** – জঙ্গলে শুকনো গাছের ডালপালা একে অপরের সাথে ঘষা খাওয়ার ফলে জঙ্গলে আগুন লেগে যায়। এই আগুন খুব দ্রুত চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। জঙ্গলের এই ধরনের আগুনকে **'দাবানল'** বলা হয়। দাবানলের কারণে গাছপালা, ঝোপঝাড় এবং বনের পশুপাখিও ধ্বংস হয়। দাবানলের ফলে বনজ সম্পদের ব্যাপক বিনাশ হয়। দাবানলে হাজার হাজার একর জঙ্গল পুড়ে যাওয়ার ঘটনা অনেক দেশে প্রায়ই ঘটে।

দাবানল নেভানোর জন্য হেলিকপ্টার, বিমান ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেও মাসের পর মাস নিয়ন্ত্রণে না আসা জঙ্গলের আগুনের খবর কি তোমরা কখনো পড়েছ ?

তোমরা জানো কী?

২০২৫ সালের ক্যালিফোর্নিয়ার দাবানল ছিল বিশ্বের অন্যতম এক বিধ্বংসী দাবানল। এটি নেভানোর জন্য অনেক হেলিকপ্টার, বিমান এবং শত শত মানুষ কয়েক মাস ধরে দিন-রাত চেষ্টা করেছিলেন। ৩৭ হাজার একরেরও বেশি বন পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। প্রাণীদের বাসস্থান ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। অনাহারের কারণে আশেপাশের বিস্তীর্ণ এলাকার ছোটো-বড়ো প্রাণী ও পাখিদের বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছিল।

◉ মানবসৃষ্ট দুর্যোগ - মানুষের ভুলত্রুটি, অসাবধানতা কিংবা প্রযুক্তির অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলেও কিছু দুর্যোগ দেখা দেয়। এই ধরনের দুর্যোগকে **'মানবসৃষ্ট দুর্যোগ'** বলা হয়।

শহরের বিস্তার বৃদ্ধি পাওয়া, রাস্তা ও মহাসড়ক তৈরী করা, বড়ো বড়ো কারখানার জন্য ফাঁকা জায়গা তৈরী করার জন্য বন উজাড় করতে হয়। গত কয়েক বছরে ব্যাপক বন উজাড় এবং জ্বালানির অতিরিক্ত ব্যবহারের প্রভাব আবহাওয়ার ওপর পড়েছে। বায়ুমণ্ডল এবং সমুদ্রের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এবং বৃষ্টির সময় কাল পরিবর্তিত হচ্ছে। এর ফলে বন্যা, কৃষির ক্ষতি ও ভূমিধসের মতো দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে।

নতুন নতুন সমস্যা ও সংকট তৈরী করার মতো আরও কিছু দুর্যোগ রয়েছে।

(১) দুর্ঘটনা - যানবাহন চালানোর সময়, কারখানায় কাজ করার সময়, কখনো কখনো মানুষের ভুল বা অবহেলার কারণে হঠাৎ দুর্ঘটনা ঘটে। কারখানায় রাসায়নিক লিক, রাস্তায় বড়ো দুর্ঘটনা, বিদ্যুৎ দুর্ঘটনা এই ধরনের ঘটনাগুলি অবহেলা ও ভুলের কারণেই ঘটে। এই ধরনের বড়ো দুর্যোগের ফলে মানুষ, প্রাণী এবং পরিবেশের ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। কারখানায় কাজ করার সময় যন্ত্রপাতি, রসায়ন, বিদ্যুৎ প্রবাহ, উঁচুতে কাজ করা বা অন্যান্য বিপজ্জনক উপাদানের কারণে শ্রমিকরা আহত হয় কিংবা প্রাণহানি ঘটে। এই ধরনের দুর্ঘটনাকে **'শিল্প দুর্ঘটনা'** বলা হয়।

দুর্ঘটনার ফলে মানুষের আঘাত লাগা এবং যন্ত্রপাতির ক্ষতি হওয়ার সাথে-সাথে আগুন লাগা, ভবন ধসে পড়ার মতো ঘটনাও ঘটে।

শিল্প দুর্ঘটনার কারণসমূহ	শিল্প দুর্ঘটনা প্রতিকারের উপায়
• সুরক্ষা নিয়মের প্রতি অবহেলা, অসাবধানতা।	• সঠিক সুরক্ষামূলক উপকরণ ব্যবহার করা।
• ত্রুটিপূর্ণ/অনুপযুক্ত যন্ত্র পাতি।	• কর্মীদের সুরক্ষা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া।
• সঠিক প্রশিক্ষণের অভাব।	• মেশিন ও যন্ত্রপাতির নিয়মিত দেখাশুনা করা।
• রাসায়নিক বা দাহ্যপদার্থের ভুলভাবে ব্যবহার।	• রাসায়নিক পদার্থ সঠিক উপায়ে সঞ্চয় ও ব্যবহার করা।
• একটানা কাজ করার কারণে ক্লান্তি।	• কাজের সঠিক সময় সূচী রাখা।

(২) যুদ্ধ - দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে সংঘর্ষের কারণে যুদ্ধ হয়। নিজের দেশকে রক্ষা করা, বিবাদ মেটানো কিংবা কখনো কখনো জমি দখল করার জন্য যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের পরিণতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের চেয়েও মারাত্মক হয়। বোমা বিস্ফোরণে ঘরবাড়ি ভেঙে পড়া, বড়ো ধরনের অগ্নিকাণ্ড, জলাশয় দূষিত হওয়া এমন বহু দুর্যোগ যুদ্ধকালীন সময়ে দেখা দেয়। সেই সময়ে চিকিৎসা ও চিকিৎসাসেবা পাওয়াও কঠিন হয়ে পড়ে। যুদ্ধের কারণে বহু মানুষের মৃত্যু হয় এবং সম্পত্তির বিনাশ ঘটে। হাজার হাজার মানুষকে স্থানান্তর করতে হয়। চাষাবাদ করা কঠিন হয়ে পড়ে। বিষাক্ত গ্যাস, রসায়নের মতো অস্ত্রের ব্যবহারের ফলে দূষণ বৃদ্ধি পায়। মানুষের মনে ভয়, মানসিক চাপ তৈরী হয়।

(৩) সাইবার অপরাধ - সাইবার অপরাধ বলতে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মোবাইল কিংবা ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে করা অপরাধকে বোঝায়। এর মধ্যে ব্যক্তিগত তথ্য চুরি, আর্থিক প্রতারণা, ছল, হুমকি,

অশ্লীল আশয় ছড়ানো এবং হ্যাকিং অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সাইবার অপরাধের নিত্যনতুন ধরণ সামনে আসছে। **ফিশিং** অর্থাৎ নকল ই-মেইলের মাধ্যমে তথ্য হাতিয়ে নেওয়া। **সাইবার স্টকিং** অনলাইনে কোনো ব্যক্তিকে প্রতিনিয়ত অনুসরণ করা। **রন্সমওয়ার** আক্রমণ অর্থাৎ কম্পিউটারের তথ্য লক করে দিয়ে টাকা দাবি করা। ডিজিটাল অ্যারেস্টএগুলি এই ধরনের অপরাধেরই কিছু প্রকারভেদ।

ভারতে তথ্য প্রযুক্তি আইন রয়েছে। এই আইন অনুযায়ী সাইবার অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সুরক্ষার জন্য প্রত্যেকেরই নিজের ব্যক্তিগত তথ্য গোপন রাখা, সুরক্ষিত পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা এবং কোনো অপরিচিত লিংকে ক্লিক না করার মতো সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যন্ত জরুরি।

দুর্যোগের সময় তাৎক্ষণিক সাহায্য পাওয়ার জন্য কিছু ফোন নম্বর নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সব শহরের জন্যই এই ফোন নম্বরগুলি একই থাকে।	ফোন নম্বর	পরিষেবা
	১০০	পুলিশের সাহায্য
	১০১	দমকল বাহিনী
	১০২ এবং ১০৮	অ্যাম্বুলেন্স
	১০৭৭	আপৎকালীন সেবা

দুর্যোগ হঠাৎ আসে, তাই সেই সময় দুর্যোগের মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি আগে থেকেই রাখা ভালো।

দুর্যোগ আসার আগে এবং পরে প্রয়োজনীয় সতর্কতা

দুর্যোগ আসার আগে	দুর্যোগ পরে প্রয়োজনীয় সতর্কতা
দুর্যোগ চিনে নিয়ে নিরাপদ স্থান খোঁজ করো।	শান্ত থাকো, নিরাপদ স্থানে যাও। বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করো।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রস্তুত রাখো।	অন্যদের সাহায্য করো। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা করো।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার অভ্যাস করো।	গুজবে বিশ্বাস করবে না।
গুরুত্বপূর্ণ ফোন নম্বরগুলি মনে রাখো।	প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করো।
সাইবার নিরাপত্তা পালন করো।	দুর্যোগের কারণে আতঙ্কিত মানুষদের সাহস দাও।

◉ প্রাথমিক চিকিৎসা – প্রাথমিক চিকিৎসা অর্থাৎ কোনো আহত বা অসুস্থ ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা শুরু করার আগে তাৎক্ষণিকভাবে দেওয়া সাহায্য। এর ফলে প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হতে পারে, বেদনা কমে এবং সংক্রমণ রোধ করা যায়।

কাজ করার সময়, খেলাধুলার সময় বা দুর্ঘটনার কারণে অনেক সময় ক্ষত হয়। ক্ষতস্থান থেকে অতিরিক্ত পরিমাণে রক্ত বের হওয়াকে **'বাহ্যিক রক্তক্ষরণ'** বলা হয়। এটি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা অত্যন্ত জরুরি। তার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

ক্ষতস্থানের সাময়িক উপায় করা, ব্যান্ডেজ বাঁধা, ত্বক পুড়ে গেলে লাগানোর মলম এই সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র একটি ছোট বাক্সে অথবা বন্ধ বক্সের মধ্যে সবসময় প্রস্তুত রাখা উচিত। এই বাক্সটি এমন জায়গায় রাখা উচিত যা সহজেই চোখে পড়ে এবং প্রয়োজনে দ্রুত ব্যবহার করা যায়। দুর্ঘটনার সময় এই ধরনের বাক্স প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয়। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত রাখা সরঞ্জাম ও ওষুধের এই ধরনের বাক্স ঘরে, স্কুলে, অফিসে এবং যানবাহনে থাকা অত্যন্ত আবশ্যক।

⦿ রক্তপাত হলে প্রাথমিক চিকিৎসা -

(১) ক্ষতের ওপর পরিষ্কার কাপড় দিয়ে চাপ দাও।
(২) সম্ভব হলে ক্ষতস্থানটি হৃদপিণ্ডের স্তরের চেয়ে উঁচুতে তুলে রাখো।
(৩) রক্ত পড়া বন্ধ না হলে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাও।
(৪) আহত ব্যক্তিকে সাহস দাও।

⦿ উষ্মাঘাত - গরম আবহাওয়ায় দীর্ঘক্ষণ থাকার কারণে বা অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে মস্তিষ্ক, হৃদপিণ্ড, কিডনির মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলির কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। এই অবস্থাকেই **উষ্মাঘাত** বলা হয়। ওইসময় ত্বক শুষ্ক ও গরম হয়ে ঘাম আসা বন্ধ হয়ে যায়। মাথা গুলিয়ে যাওয়া, মাথা ঘোরা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, বমি হওয়া, মাথাব্যথা এইসব লক্ষণ দেখা যায়। সময় মতো চিকিৎসা না পেলে উষ্মাঘাত প্রাণঘাতী হতে পারে। এমন সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে দ্রুত কোনো ঠান্ডা বা ছায়াযুক্ত স্থানে নিয়ে যেতে হবে। শরীরের বেড়ে যাওয়া তাপমাত্রা দ্রুত কমানোর জন্য ভেজা কাপড় দিয়ে শরীর মুছে দেওয়া, শরীরের ওপর হালকা জলের ঝাপটা দেওয়া এইসব প্রাথমিক চিকিৎসা করা উচিত। উষ্মাঘাতের কারণে ব্যক্তি যদি আধা-অজ্ঞান অবস্থায় থাকে, তাহলে তাকে জল বা কোনো তরল পান করাবে না। যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে পরবর্তী চিকিৎসা শুরু করা উচিত।

⦿ পুড়ে যাওয়া - অসাবধানতা বা দুর্ঘটনার কারণে কখনো কখনো কোনো ব্যক্তির গায়ের কাপড়ে আগুন ধরে যায়। সেই সময়ে ওই ব্যক্তি আতঙ্কিত হয়ে এদিক-ওদিক দৌড়াতে শুরু করে। এর ফলে গায়ের কাপড়ের আগুন আরও বেশি ছড়িয়ে পড়ে এবং আশেপাশেও আগুন লাগার ঝুঁকি তৈরী হয়। এমন সময়ে গায়ের কাপড়ের আগুন নেভানো অত্যন্ত জরুরি। সেই ব্যক্তিকে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে বললে কাপড়ের আগুন দ্রুত নিভে যায়। পুড়ে যাওয়ার কারণে যদি ফোস্কা পড়ে, তবে তা গলানো উচিত নয়। এমন সময়ে শরীরের পুড়ে যাওয়া ত্বকের সাথে সেঁটে থাকা কাপড় টেনে বের না করাটাও গুরুত্বপূর্ণ।

⦿ কিছু দুর্ঘটনা, সেই সময়ের প্রাথমিক চিকিৎসা -

দুর্ঘটনা	কী করবে	কী করবে না
সর্প দংশন	• নড়াচড়া কম করা। • সাপে কাটা ব্যক্তিকে যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া। • সাপে কাটা ব্যক্তিকে মানসিক সাহস দেওয়া। • সম্ভব হলে সাপের একটি ছবি তুলে ডাক্তারকে দেখানো।	• দৌড়ানো বা অতিরিক্ত নড়াচড়া করা এড়িয়ে চলা। • ঘরোয়া টোটকা করা। • অন্ধবিশ্বাসের বশে ওঝার কাছে যাওয়া। • সাপে কাটার স্থানে ক্ষত তৈরী করা। • মুখ দিয়ে রক্ত চুষে বের করা।
কুকুরের কামড়	• ক্ষতস্থানটি পরিষ্কার জল দিয়ে বারবার ধুয়ে নেওয়া। • অবিলম্বে চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া। • স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে রেবিস ভ্যাকসিন নেওয়া।	• ঘরোয়া উপায়ে চিকিৎসা করা। • নিজে থেকে মনগড়া কোনো ওষুধ খাওয়া। • কুকুরটিকে মারা।

আমরা কী শিখলাম ?

- হঠাৎ তৈরী হওয়া কোনো সংকটময় পরিস্থিতিকে দুর্যোগ বলে।
- কিছু দুর্যোগ প্রকৃতিসৃষ্ট হয়। আবার কিছু দুর্যোগ মানবসৃষ্ট কারণে ঘটে।

দুর্যোগের প্রকারভেদ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ	মানবসৃষ্ট দুর্যোগ
(১) ভূমিকম্প	(১) দুর্ঘটনা
(২) নদীর বন্যা	(২) যুদ্ধ
(৩) ঝড়	(৩) সাইবার অপরাধ
(৪) দাবানল	

- ভূমিকম্প, মহাপ্লাবন, ঝড় এই দুর্যোগের ফলে প্রচুর পরিমাণে জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি হয়।
- ভূমিকম্পের তীব্রতা রিক্টার স্কেলে মাপা হয়।
- দাবানলের কারণে বিশ্বজুড়ে প্রতি বছর হাজার হাজার একর জঙ্গল পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সেখানকার বন্যপ্রাণীদের বাসস্থান ধ্বংস হয়। প্রাকৃতিক সম্পদের বিনাশ এবং সেই সাথে বায়ু দূষণ হলো দাবানলের দুষ্প্রভাব।
- যুদ্ধ, বড়ো রেল দুর্ঘটনা এবং শিল্প দুর্ঘটনার কারণেও প্রচুর পরিমাণে জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি হয়।
- আপৎকালীন পরিস্থিতিতে আহত বা অসুস্থ ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিকভাবে যে সাহায্য দেওয়া হয়, তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা বলে। এর ফলে মানুষের প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়, বেদনা কমে এবং সংক্রমণ রোধ করা যায়।
- পুড়ে যাওয়ার কারণে ত্বকে ফোস্কা পড়লে তা কখনোই গলাবে না।
- উষ্মঘাত হলে আক্রান্ত ব্যক্তিকে অবিলম্বে ছায়ায় বসাতে হবে এবং যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসকের সাহায্য নেবে।
- সাপে কাটা ব্যক্তি সাধারণত খুব বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তাই তাকে মানসিক ভরসা ও সাহস দিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত জরুরি।
- কুকুরে কামড়ালে সেই ক্ষতস্থানটি পরিষ্কার জল দিয়ে বারবার ধুয়ে ফেলতে হবে এবং চিকিৎসকের সাহায্য নেবে।

অনুশীলনী

(১) সত্য না মিথ্যা তা কারণসহ লেখো।

(১) সাপে কাটা ব্যক্তিকে অবিলম্বে দৌড়াতে-দৌড়াতে হাসপাতালে নিয়ে যাবে।

(২) উষ্মাঘাত হওয়া ব্যক্তির শরীর ঠান্ডা জল দিয়ে মুছে দেবে।

(২) নীচের পরিস্থিতিগুলির জন্য উপযুক্ত প্রাথমিক চিকিৎসার পরামর্শ দাও। তোমার উত্তর কারণসহ লেখো।

(১) তোমার সহকর্মীর হাতে ফুটন্ত জল পড়ে গেছে। তার হাত লাল হয়ে গেছে এবং খুব যন্ত্রণা হচ্ছে।

(২) রাস্তায় এক ব্যক্তির কাপড়ে আগুন লেগে গেছে। সে ভয় পেয়ে দৌড়াতে শুরু করেছে।

(৩) গ্রামের প্রচুর জল থাকা কিছু কুয়োর জল হঠাৎ কমতে শুরু করল। ঠিক সেই সময়েই আগে শুকিয়ে থাকা কুয়োগুলিতে জল বাড়তে লাগল। যশ মনে করলো এটি একটি অলৌকিক ঘটনা। প্রিয়ার মনে হলো ভূমিকম্পের কারণে মাটির নীচের নড়াচড়ার ফলে এমনটা হচ্ছে। তুমি কার সাথে একমত? কারণসহ লেখো।

(৪) নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো।

(অ) ভূমিকম্পের ফলে মানবজীবনে কী কী প্রভাব পড়ে?

(ব) যুদ্ধের দুষ্প্রভাবগুলি লেখো।

(ক) কোনো অজানা নম্বর থেকে ফোন এলো এবং OTP জানতে চাইল, তবে তুমি কী করবে?

(৫) আগুনে পুড়ে যাওয়ার দুর্ঘটনায় ব্যক্তির ত্বকে আটকে থাকা জামাকাপড় টেনে বের করলে কোন বিপদ হতে পারে সেই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করো।

(৬) বড়ো কোনো দুর্ঘটনা, আগুন লাগা বা নদীর বন্যার মতো দুর্যোগের স্থানে কেবল সেখানকার পরিস্থিতি দেখা, ভিডিও করা বা ছবি তোলার জন্য আশেপাশে ভিড় করা কেনো এড়িয়ে চলা উচিত?

(৭) রেল বা বাহন দুর্ঘটনার সময় আমরা কোন কোন উপায়ে সাহায্য করতে পারি, সেই বিন্দুগুলি লেখো।

(৮) আরামদায়ক ভ্রমণের জন্য আজকাল বাতানুকুলিত বাস ও ট্রেন উপলব্ধ থাকে। এই যানবাহনগুলির জানালায় বড়ো কাঁচ থাকে, কিন্তু জানালাগুলি সবসময় সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে, এমন কেনো হয়? এই ধরনের যানবাহনে সহজেই চোখে পড়ে সেখানে একটি বড়ো হাতুড়ি রাখা থাকে, সেটি কীসের জন্য রাখা হয়?

(৯) দুর্যোগ সম্পর্কিত কিছু শব্দ নীচের ছকে লুকিয়ে আছে। সেই শব্দগুলি খুঁজে বের করো এবং তোমার খাতায় লেখো।

ভূ	ম	ক	চ	মি	প্র	স	ক	ল্	ঝ	ল্	কু
স	মি	জ	প্র	কৃ	ত	সৃ	ষ্ট	দা	বা	ন	কু
কে	য	ক	ক্য	স	র্প	দং	শ	ন	ডে	বী	রে
গ	শ্রী	হ	ম্প	সা	ই	বা	র	অ	প	রা	ধ
প	উ	ষ্মা	ঘা	ত	প	গ	ল	ঝ	গি	ন	ম
দু	র্যো	গ	ব্য	ব	স্থা	প	না	ড়ে	যা	ও	য়া
দৌ	ডি	নৃ	ল্	প	রে	য	ফু	ভূ	কে	র	ক্ষ
ই	ড়া	দ্য	ছ	ট	রা	বী	পু	ড়ে	যা	ও	য়া
ল	ক্র	নো	র	হ	ধ	জ	ণ্	র	ট	ক্ষ	বা

উপক্রম –

(১) **আমার প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স** - প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্সের উপকরণের তালিকা তৈরী করো। সেই উপকরণগুলি সংগ্রহ করে তোমার পরিবারের জন্য একটি প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স তৈরী করো।

(২) বড়ো বড়ো দুর্যোগের খবর সংবাদপত্রে আসে। এই ধরনের খবর এবং ছবি কেটে সংগ্রহ করো। বৃষ্টির কারণে, ঝড়ের কারণে, দুর্ঘটনার কারণে যে সমস্ত দুর্যোগ এসেছে, সেই অনুযায়ী সেই কাগজের টুকরোগুলিকে আলাদা আলাদা বিভাগে ভাগ করো।

৬ পদার্থের গুণধর্ম

বস্তু এবং পদার্থ এই দুটি শব্দই আমরা জানি। বস্তু কাকে বলে আর পদার্থ বলতে কী বোঝায় ?

ছবিতে ঘরের মধ্যে কী কী বস্তু দেখা যাচ্ছে ? দেখতে পাওয়া প্রতিটি বস্তুর নাম এবং সেটি কী দিয়ে তৈরী হয়েছে তার একটি তালিকা তৈরী করো। একের বেশি পদার্থ ব্যবহার করে তৈরী করা হয়েছে, এমন কোন কোন বস্তু ছবিতে আছে ?

আকার, ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে যাদের নাম ঠিক করা হয়, সেগুলি হলো বস্তু। চেয়ার, বালতি, গ্লাস, ঘড়ি এগুলি ছবিতে দেখতেপাওয়া কিছু বস্তু। বস্তু কী দিয়ে তৈরী, তার উত্তর হলো পদার্থের নাম।

চেয়ার কাঠের, লোহার বা প্লাস্টিকের হতে পারে। সেটি ছোটো হোক বা বড়, কিংবা বিভিন্ন উপাদান দিয়ে তৈরীই হোক না কেনো, আমরা তাকে চেয়ারই বলি। অর্থাৎ, চেয়ার হলো একটি বস্তু, আর সেটি কী দিয়ে তৈরী তার উত্তর হলো কাঠ, লোহা, প্লাস্টিক এগুলি পদার্থের নাম।

মুখে পাউডার মাখার সময় কিছুটা পাউডার আমাদের হাতের তালুতেও ছড়িয়ে পড়ে। তখন হাতের তালু সাদা দেখায়, কিন্তু হাতের ওপরের পাউডারের প্রতিটি কণা আলাদা আলাদা ভাবে দেখা যায় না। সেই ছোটো কণাটি আসলে তার চেয়ে আরও ছোট ছোট কণা দিয়ে তৈরী। সব পদার্থই এরকম অত্যন্ত সূক্ষ্ম কণা দিয়ে তৈরী। দুধ, তেল, বাতাস, বাষ্পও এরকম ছোটো ছোটো কণা দিয়েই তৈরী।

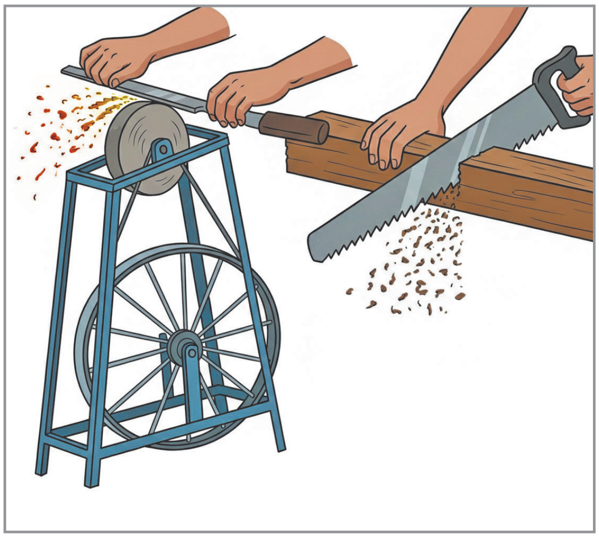

ছুরিতে ধার দেওয়ার সময় যে ছোট ছোট স্ফুলিঙ্গ উড়ে যায়, সেগুলি আসলে উত্তপ্ত হয়ে লাল হয়ে যাওয়া লোহার ছোট ছোট কণাই। বিশ্বের সমস্ত পদার্থই সূক্ষ্ম কণার দ্বারা গঠিত। পদার্থের ধর্ম এবং তার পরিবর্তনের সম্পর্ক, পদার্থের কণাগুলোর বিন্যাস, তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব এবং ফাঁকা স্থান, তাদের পরস্পরকে আবদ্ধ করে রাখা শক্তির সম্পর্ক ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের সাথে থাকে। এগুলী খুব প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে বলা হয়েছে। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এগুলিই হলো সেই গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি উপাদান। আমাদের পূর্ব পুরুষেরা এগুলিকে প্রদত্ত তত্ত্ব নাম দিয়েছিলেন।

যদি পদার্থের কণাগুলো একে অপরের খুব কাছাকাছি থাকে এবং একে অপরকে শক্তভাবে ধরে রাখে, তাহলে কী হবে? সেই কণাগুলো সহজে একে অপরের থেকে দূরে যাবে না, তারা সহজে একে অপরকে ছেড়ে যাবে না এবং নিজেদের জায়গাও পরিবর্তন করবে না। এই কারণেই সেই বস্তুগুলির আকৃতি ও আকার সহজে পরিবর্তিত হয় না। এই অবস্থাকে **‘কঠিন অবস্থা’** বলা হয়।

জল, দুধ, তেলের মধ্যে সহজে আঙুল ডোবানো যায়। কুয়ো বা পুকুর থেকে জল বাইরে তোলা যায়। বালতির জল থেকে এক গ্লাস জল সহজে আলাদা করা যায়। সেখান থেকে জল তুলে নিলে আঙুল ভিজে যায়। অর্থাৎ ওই তরলের কণাগুলো একে অপরের সাথে খুব ঢিলেঢালা ভাবে যুক্ত থাকে। তাই তারা একে অপরের থেকে সহজে আলাদা হয়ে যায় এবং ঢালু জায়গার দিকে বয়ে যায়। এই অবস্থাকে **‘তরল অবস্থা’** বলা হয়।

কঠিন পদার্থকে পর্যাপ্ত তাপ দিলে, তাদের কণাগুলো একে অপরের থেকে দূরে যেতে শুরু করে। এর ফলে কঠিন পদার্থ তরলে রূপান্তরিত হয়। কিছু পদার্থ অল্প তাপেই গলে যায়, আবার কিছু পদার্থের জন্য বেশি তাপের প্রয়োজন হয়। কাঁচ, লোহার বস্তু বানানোর জন্য চুল্লিতে লোহা, কাঁচ গলাতে হয়। অর্থাৎ সেখানে এই পদার্থগুলি তরল অবস্থায় থাকে। আগ্নেয়গিরি থেকে যে লাভা বের হয়, তা হলো মাটির নীচের পাথর গলে তৈরী হওয়া তরল। এই কারণেই একে শীলারসও বলা হয়। শিলা, লোহার মতো কঠিন পদার্থ গলানোর জন্য প্রচুর তাপের প্রয়োজন হয়। সেই পরিমাণ তাপ পেলে এই ধরনের কঠিন পদার্থও তরলে পরিণত হয়।

যদি কোনো তরলকে তাপ দেওয়া হয়, তবে কী হবে ? তার ভেতরের পদার্থের কণাগুলো একে অপরের থেকে আলাদা হয়ে যাবে এবং যতটুকু জায়গা পাবে, সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়বে। এই অবস্থাকে **'গ্যাসীয় অবস্থা'** বলা হয়। ঘরের মধ্যে ধূপকাঠি জ্বালানো হয়, তবে তার জ্বলন্ত অগ্রভাগ থেকে ধোঁয়া কিছুটা ওপরের দিকে উঠতে দেখা যায়। সেই ধোঁয়া আসলে একে অপরের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া পদার্থের কণা মাত্র। তাদের ভিড়ের কারণে ধূপকাঠির আগায় ধোঁয়া দেখা যায়। ধূপকাঠি থেকে দূরে ধোঁয়া দেখা যায় না, কিন্তু সুগন্ধ আসে। এর অর্থ হলো, একে অপরের থেকে আলাদা হয়ে এই কণাগুলো অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। এই অবস্থাকে পদার্থের গ্যাসীয় অবস্থা বলা হয়। কঠিন, তরলও গ্যাস হলো পদার্থের তিনটি অবস্থা।

পদার্থের কণাগুলো একে অপরকে কতটা শক্তভাবে ধরে রেখেছে, তার ওপর নির্ভর করে তারা নিজের জায়গা সহজে ছাড়বে কি ছাড়বে না। বস্তুর বা পদার্থের আকার, আকৃতি যেমন আছে তেমনই থাকবে, নাকি সহজে বদলে যাবে তাও এটার ওপরই নির্ভর করে।

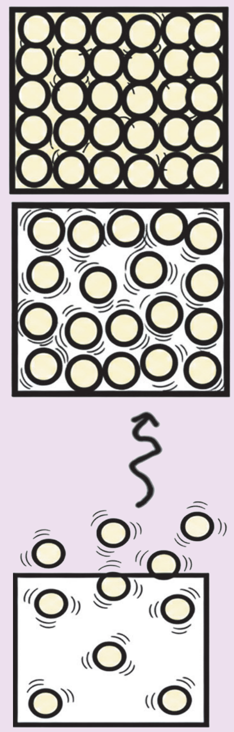

কণাগুলো একে অপরের খুব কাছে থাকে এবং একে অপরকে শক্তভাবে ধরে রাখে তাই তারা নিজের জায়গায় স্থির থাকে। - **কঠিন অবস্থা**

কণাগুলো একে অপরের থেকে কিছুটা দূরে এবং একে অপরের সাথে খুব ঢিলেঢালাভাবে যুক্ত থাকে তাই এরা ঢালু জায়গার দিকে বয়ে যায়। যে পাত্রে রাখা হয়, এরা সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। - **তরল অবস্থা**

প্রতিটি কণা অন্য কণা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা থাকে,তাই এরা যতটুকু জায়গা পায়, সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে এবং একে অপরের থেকে দূরে চলে যায়। -**গ্যাসীয় অবস্থা**

এরূপ পরিবর্তনের সময় পদার্থটি একই থাকে, শুধু তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। একে অবস্থান্তর বলা হয়। পদার্থের কণাগুলো একে অপরকে কতটা শক্তভাবে ধরে রেখেছে, তার ওপরই সেই সময়ের পদার্থের অবস্থা নির্ভর করে।

তাহলে কী ঘটবে ?

- বরফের টুকরো রোদে মাটিতে খোলা রেখে দিলে।
- মোম গরম করার পর, তাকে তাপ দেওয়া বন্ধ করলে।
- জল ফোটাতে থাকলে।
- গাড়ির পেট্রোল ট্যাঙ্কের ঢাকনা খোলা থাকলে।

পাথর, সোনা, কাঁচ, লোহা বললেই সেগুলি সবসময় কঠিন এবং তেল, জল, দুধ সবসময় তরল থাকে এমন নয়। আমাদের চারপাশের সাধারণ তাপমাত্রায় এদের এই অবস্থাগুলি থাকে। খুব ঠান্ডা করলে দুধ থেকে আইসক্রিম তৈরী করা যায়। শীতের দিনে নারকেল তেল জমে যায়, তা আমরা দেখেছি। তরল ফুটলে তা থেকে বাষ্প তৈরী হয়। এর বিপরীতে, পদার্থ যদি যথেষ্ট ঠান্ডা করা হয়, তবে বাষ্প থেকে তরল এবং তরল থেকে কঠিন পদার্থ তৈরী হয়।

নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড এই গ্যাসগুলির কথা আমরা জানি। খুব ঠান্ডা করে এগুলিকেও তরল অবস্থায় আনা যায়। কিছু জিনিস অতি-ঠান্ডা রাখার জন্য গবেষণাগারে তরল নাইট্রোজেন ব্যবহার করা হয়। মহাকাশ অভিযানের জন্য ব্যবহৃত রকেটে তরল অক্সিজেন ব্যবহার করা হয়। যথেষ্ট ঠান্ডা করলে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। এটি খুব ঠান্ডা হয়। তাই একে শুষ্ক বরফ বলা হয়। এর অর্থ হলো, সাধারণ তাপমাত্রায় গ্যাসীয় অবস্থায় থাকা পদার্থের অবস্থাও পরিবর্তন করা যেতে পারে।

ভেবে দেখো।

✦ একটি ইট খাড়া বা আড়াআড়ি যে কোনো ভাবেই রাখা হোক না কেনো, তার আকার একই থাকে। কিন্তু তেল, দুধ, জল পাত্রের আকার ধারণ করে। এই পার্থক্য কেনো হয় ?

✦ পিচকারি বা নল দিয়ে তরলের মধ্যে হাওয়া ঠেলে দিলে সেখানে বুদ-বুদ কেনো তৈরি হয় ?

একটি প্লাস্টিকের বয়াম জল দিয়ে অর্ধেক পূর্ণ করো। জলের স্তর কোথায় আছে তা বয়ামের গায়ে দাগ দিয়ে চিহ্নিত করো। এরপর বয়ামের জলের মধ্যে একটি বড়ো আলু আলতো করে ছেড়ে দাও। বয়ামের জল কি আগের দাগ পর্যন্তই আছে ? অতিরিক্ত জল না ঢালা সত্ত্বেও বয়ামের জল উপরে কেনো উঠে এলো ?

কঠিন, তরল, গ্যাসীয় সবই কণা দিয়ে তৈরী। কণার সংখ্যা কম হোক বা খুব বেশি, সেই কণাগুলো জায়গা দখল করবে এবং তাদের একটি নির্দিষ্ট ভর থাকবেই। এই অর্থ দ্রব্য এই একটি শব্দ দিয়ে বোঝানো হয়।

- দ্রব্য নামে এই পৃথিবীতে আলাদা কোনো স্বাধীন পদার্থ নেই।
- দ্রব্য মানে কেবল তেল, জল, দুধের মতো তরলনয়।
- দ্রব্য এই শব্দটির মাধ্যমে কণা দ্বারা গঠিত, জায়গা দখলকারী এবং ভরযুক্ত বস্তুকেই বোঝানো হয়েছে।
- মহাবিশ্বের প্রতিটি পদার্থকেই দ্রব্য বলা যেতে পারে। অর্থাৎ চাঁদ, সূর্য, তারা, ধূমকেতু ইত্যাদিতে থাকা পদার্থও দ্রব্য। 'দ্রব্য' মানেই কণা দিয়ে তৈরী।

পদার্থের কণাগুলো একে অপরকে কতটা শক্তভাবে ধরে রেখেছে, তার ওপর সেই সময়ের পদার্থের অবস্থা নির্ভর করে। সেই অনুযায়ী কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় এগুলি পদার্থের অবস্থা থাকে। প্রচন্ড পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হওয়া সূর্যের মতো নক্ষত্র, বর্ষাকালে কখনো কখনো হওয়া বজ্রপাতের মতো জায়গাগুলির স্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা হয়। সেখানকার কণাগুলোর স্বরূপ কিছুটা ভিন্ন। তাই এটিকে একটি ভিন্ন অবস্থা হিসেবে গণ্য করা হয়। এই অবস্থাকে **প্লাজমা** অবস্থা নাম দেওয়া হয়েছে।

◉ ঘনত্ব – যদি একটি পাত্রের জলে আলু, পাথর বা লোহার টুকরোর মতো কোনো বস্তু ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে জল পাশে সরে গিয়ে বস্তু সেই জায়গাটি দখল করবে। এর জন্য কতটা জল পাশে সরে গেছে? সেই বস্তুর আয়তনের সমান! সেই জলের পরিমাণ ঠিক কত? মাপার পাত্র, ইনজেকশন সিরিঞ্জের মতো উপকরণের সাহায্যে সেই জলের আয়তন মাপা যায়। আর সেটাই হলো জলে ডুবে যাওয়া বস্তুটির আয়তন।

বস্তুর ভর গ্রাম বা কিলোগ্রাম এককে মাপা হয়। **কঠিন পদার্থের আয়তন ঘন সেন্টিমিটার বা ঘন মিটার এককে মাপা হয়। তরল পদার্থের আয়তন মিলিলিটার বা লিটারে মাপা হয়।** যদি কোনো সংগৃহীত নমুনার ভর এবং আয়তন উভয় মাপ জানা থাকে,তবে সেই পদার্থের একঘন সেন্টিমিটার আয়তনের টুকরোর ভর কত হবে তা নির্ধারণ করা যায়। সেই বস্তু বা পদার্থটিকে না ভেঙে কেবল ভরকে আয়তন দিয়ে ভাগ করলে এই সূত্রটির সাহায্যে উত্তর পাওয়া যায়। ১ঘনসেমি আয়তনের পদার্থের ভর বলা মানেই হলো সেই পদার্থের ঘনত্ব।

$$\text{ঘনত্ব} = \frac{\text{ভর}}{\text{আয়তন}}$$

গ্রাম/ঘনসেন্টিমিটার অথবা কিলোগ্রাম/ঘনমিটার হলো ঘনত্বের একক।

একটি পাথর, বড়ো আলু, লোহা বা কাঁচের টুকরোর মতো বস্তু সংগ্রহ করো। তাদের প্রত্যেকের ওজন মাপো এবং তা লিখে রাখো।

একটি পর্যাপ্ত আকারের পাত্র একটি থালায় রেখে পাত্রটি জল দিয়ে কানায় কানায় ভরে নাও। উপরের বস্তুগুলির মধ্যে যেকোনো একটি বস্তু আস্তে করে সেই পাত্রে ছেড়ে দাও। থালায় উপচে পড়া জল আয়তন মাপার পাত্র বা ইনজেকশন সিরিঞ্জ ব্যবহার করে মেপে নাও। সূত্র ব্যবহার করে এদের প্রত্যেকের ঘনত্ব কত তা নির্ধারণ করো। আলাদা আলাদা বস্তুর জন্য এই কৃতিটি করে দেখো।

পরিমাপক পাত্র এটি কাঁচের বা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের একটি খাড়া পাত্র হয়। এই পাত্রে তরল কতটা উচ্চতা পর্যন্ত আছে তা বাইরে থেকে দেখা যায়। পাত্রের গায়ের দাগগুলি থেকে সেই তরলের সঠিক আয়তন কত তা নির্ধারণ করা যায়।

দুটি পাল্লার দাঁড়িপাল্লার সাহায্যে ভরের পরিমাপ করা হয়। স্প্রিং পাল্লায় কোনো বস্তু ঝুলিয়ে দিলে, পৃথিবী সেই বস্তুটিকে নিজের দিকে কতটা টানছে তার পরিমাপ পাওয়া যায়। একে **বস্তুর ওজন** বলা হয়। ভরের একক হলো গ্রাম। সুবিধার জন্য স্প্রিং পাল্লা ব্যবহার করেও এই কৃতিটি করা যেতে পারে।

যদি কংক্রিট এবং ইস্পাতের ঘনত্ব জানা থাকে, তবে কোনো সেতু বা বহুতল ভবন তৈরী করার আগেই তার মোট ওজন কত হবে তার হিসাব করা যায়। সেই অনুযায়ী ভিত্তি স্তম্ভগুলি কতটা মজবুত হওয়া উচিত, তা নির্ধারণ করা যায়। সোনা, দুধ, পেট্রোল ইত্যাদির নমুনা বিশুদ্ধ কি না, তা তাদের ঘনত্বের মাধ্যমে পরীক্ষা করা যায়।

প্রত্যেক পদার্থের নিজস্ব কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম থাকে। তার ওপর ভিত্তি করে পদার্থটিকে সঠিকভাবে চেনা সম্ভব। প্রতিটি পদার্থের ঘনত্ব নির্দিষ্ট থাকে। তাই কোনো নমুনার ঘনত্ব মেপে সোনা বা পেট্রোলের মতো পদার্থগুলি বিশুদ্ধ নাকি তাতে কোনো ভেজাল আছে, তা অনুমান করা যায়। বিশুদ্ধ জলের ঘনত্ব ১ গ্রাম/মিলি থাকে, বিশুদ্ধ সোনার ঘনত্ব ১৯.৩ গ্রাম/ঘনসেমি থাকে।

◉ পদার্থের কিছু ধর্ম -

(অ) আলো সংক্রান্ত ধর্ম - বিভিন্ন পদার্থের কিছু ধর্মের মধ্যে পার্থক্য থাকে। কিছু প্লাস্টিক, পরিষ্কার জল এবং কাঁচের মধ্য দিয়ে আলো চলে যেতে পারে। কাঁচের ওপর আলো পড়লে তা কাঁচ ভেদ করে ওপাশে চলে যায়। তাই কাঁচের ওপাশের জিনিস দেখা যায়। এই ধরনের পদার্থকে **স্বচ্ছ** পদার্থ বলে। স্বচ্ছ মানে হলো যার মধ্য দিয়ে ওপাশের বস্তু দেখা যায়। কাঠ, পিচবোর্ড, টিন, মাটি এগুলি হলো **অস্বচ্ছ**। দুধের প্যাকেটের পাতলা সাদা প্লাস্টিক, তেল চিটচিটে কাগজ, ঘষা কাঁচ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সামান্য পরিমাণে আলো ওপাশে যেতে পারে। তাই এই ধরনের পদার্থকে **অর্ধস্বচ্ছ** পদার্থ বলে।

ভেবে দেখো।

- ✦ ঘোলা জল স্বচ্ছ, অস্বচ্ছ নাকি অর্ধস্বচ্ছ ?
- ✦ আয়নার সামনে রাখা বস্তুর প্রতিবিম্ব আয়নায় দেখা যায়। আয়না স্বচ্ছ নাকি অস্বচ্ছ ?

করে দেখো।

সংবাদপত্রের কাগজ, খাতার কাগজ এবং উপহারের বস্তু প্যাক করার জন্য ব্যবহৃত রঙিন চকচকে কাগজ থেকে চওড়া ও লম্বা কয়েকটি টুকরো কেটে নাও। এর মধ্যে একটি করে টুকরো চোখের সামনে ধরে দেখলে ওপাশের বস্তু দেখা যাবে কিনা সেটা আগে অনুমান করো। তারপর প্রতিটি টুকরো একে একে চোখের সামনে ধরে আসলে কী ঘটছে তা নিজে দেখো।

(ব) চৌম্বকীয় ধর্ম - চুম্বক ও লোহার মধ্যে আকর্ষণ থাকে। চুম্বক লোহাকে নিজের দিকে টানে এমনটাই অনেকে মনে করে। আলপিন, পেরেক এরকম ছোট ও হালকা বস্তু চুম্বকের দিকে আকর্ষিত হয়। কিন্তু বড়ো লোহার আলমারি, লোহার টেবিল বা চেয়ারের কাছে চুম্বক নিয়ে গেলে কী ঘটে ? করে দেখো।

লোহার আলমারির দরজায় আটকে থাকা নকশা করা চাকতি তোমরা দেখেছ কি ? সেগুলির পিছনের দিকে মুদ্রার মতো ছোট কালো রঙের চাকতি লাগানো থাকে। সেটি যদি খুলে যায়, তবে কি ওই নকশাদার চাকতিটি লোহার আলমারিতে আটকে যাবে কি ? এটি নিজে করে দেখো। চুম্বকের দিকে আকর্ষিত হওয়া পদার্থগুলিকে **'চৌম্বকীয় পদার্থ'** বলা হয়। লোহা, নিকেল এবং কোবাল্ট হলো চৌম্বকীয় পদার্থ।

আমরা কী শিখলাম ?

- সমস্ত পদার্থ কণা দিয়ে তৈরি।
- কঠিন, তরল, গ্যাসীয় এগুলি পদার্থের অবস্থা।
- সূর্য, তারা, বজ্রপাত ইত্যাদি জায়গায় কঠিন, তরল, গ্যাসের থেকে ভিন্ন এক প্লাজমা অবস্থা দেখা যায়।
- কণা দ্বারা গঠিত শুধুমাত্র এটাই পদার্থ শব্দের অর্থ।
- পদার্থ স্থান দখল করে, পদার্থের ভর থাকে।
- পদার্থের কণাগুলো একে অপরের সাথে কতটা শক্তভাবে আবদ্ধ রয়েছে, তার ওপর সেই সময়ের পদার্থের অবস্থা নির্ভর করে। কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় হলো পদার্থের অবস্থা।
- পদার্থের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরকে পদার্থের অবস্থান্তর বলা হয়।
- যে পদার্থের মধ্য দিয়ে আলো সরাসরি পারাপার করতে পারে, তাকে স্বচ্ছ পদার্থ বলে।
- যে পদার্থের মধ্য দিয়ে সামান্য আলো পারাপার করতে পারে, তাকে অর্ধস্বচ্ছ পদার্থ বলে, এবং
- যে পদার্থের মধ্য দিয়ে আলো একেবারেই পারাপার করতে পারে না, তাকে অস্বচ্ছ পদার্থ বলে।
- $\frac{\text{ভর}}{\text{আয়তন}}$ এই সূত্রের সাহায্যে প্রদত্ত পদার্থের ঘনত্ব নির্ণয় করা যায়।

অনুশীলনী

(১) সঠিক বিকল্পটি বেছে নিয়ে বাক্যগুলি পূর্ণ করো।

(অ) বরফ হলো জলের .... অবস্থা।

(কঠিন, তরল, গ্যাসীয়)

(আ) অস্বচ্ছ পদার্থের ওপর আলোক রশ্মি পড়লে ....।

(কিছু আলো পারাপার করে, সমস্ত আলো পারাপার করে, আলো পারাপার করে না।)

(ই) তেল জলের ওপর ভাসে, অর্থাৎ তেলের ঘনত্ব .... হয়।

(জলের চেয়ে কম, জলের সমান, জলের চেয়ে বেশি)

(২) নীচের কোন বাক্যগুলি যথাক্রমে কঠিন ও গ্যাসীয় অবস্থা নির্দেশ করে ?

(অ) কণাগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্ব কম এবং আকর্ষণ বল বেশি।

(আ) কণাগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্ব মধ্যম এবং আকর্ষণ বল কিছুটা কম।

(ই) কণাগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্ব সবচেয়ে বেশি এবং আকর্ষণ বল সবচেয়ে কম।

(৩) প্রথম জোড়ার সম্পর্ক দেখে দ্বিতীয় জোড়ার সম্পর্কটি লেখো।

(অ) কাঁচ : স্বচ্ছ পদার্থ :: বাটার পেপার : ....

(আ) কঠিন : নির্দিষ্ট আকার থাকে :: তরল : ....

(৪) আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখ দেখো। এবার আয়নার ওপর ফুঁ দাও এবং পুনরায় মুখ দেখো। কী পার্থক্য দেখতে পাচ্ছ ? এর কারণ কী হতে পারে ?

(৫) সমান আকারের দুটি বাক্স আছে। একটি বাক্সে পাথর ও নুড়ি ভরা আছে এবং অন্যটিতে স্পঞ্জের ছোট ছোট টুকরো ভরা আছে। বাক্স দুটি না খুলে কোন বাক্সে কী আছে তা কীভাবে বুঝবে?

(৬) নীচের কোন সমূহের সমস্ত পদার্থ তরল অবস্থায় রয়েছে তা চিহ্নিত করো।

(অ) পাথর, জল, ধোয়া (আ) দুধ, তেল, শরবত (ই) বাতাস, লোহা, বাষ্প

(৭) কাঁচের টুকরো, বাটার পেপার,খাতার মলাট, প্লাস্টিকের শিট, স্যান্ড পেপার, তেল মাখানো কাগজ এদের মধ্যে স্বচ্ছ বস্তু কোনগুলি? অর্ধস্বচ্ছ কোনগুলি? দুটি আলাদা তালিকা তৈরী করো।

(৮) পাশের বাড়িতে পেঁয়াজ ভাজা বা রান্না করলে সেখানে না গিয়ে ও আমাদের ঘরে বসে তা বোঝা যায়। পদার্থের অবস্থার সাথে এর কী সম্পর্ক হতে পারে?

(৯) ৩ মিলিলিটার আয়তন বিশিষ্ট একটি তরলের ভর যদি ৭.৫ গ্রাম হয়, তাহলে তার ঘনত্ব কত হবে?

(১০) নতুন তৈরী হওয়া ইমারতের জানালায় বর্তমান সময়ে একটু অন্য ধরনের কাঁচ লাগানো হয়। দিনের বেলা বাইরে থেকে সেই কাঁচ রঙিন আয়নার মতো দেখায়। ঘরের ভিতরের বস্তু বাইরে থেকে দেখা যায় না। তবে ঘরের ভেতরে যারা আছে, তারা জানালার বাইরে সহজেই দেখতে পায়। এই ধরনের কাঁচকে কী বলবে? স্বচ্ছ, অস্বচ্ছ নাকি অর্ধস্বচ্ছ?

(১১) গাড়ির কাঁচে কালো রঙের পাতলা ফিল্ম লাগানো হয়। এর ফলে কী হয়?

(অ) কাঁচ আরও বেশি স্বচ্ছ হয়ে যায়।
(ব) কাঁচ অস্বচ্ছ হয়ে যায়।
(ক) কাঁচ অর্ধস্বচ্ছ হয়ে যায়।

(১২) ১ কেজি তুলো এবং ১কেজি লোহা এই দুটির মধ্যে কার আয়তন বেশি হবে?

(১৩) ১কেজি তুলো এবং ১কেজি লোহা দাঁড়িপাল্লার দুটি পাত্রে রাখলে, কোন পাত্রটি নীচে নেমে যাবে?

(১৪) চিত্রে পরিমাপ করার কিছু উপকরণ দেওয়া আছে।

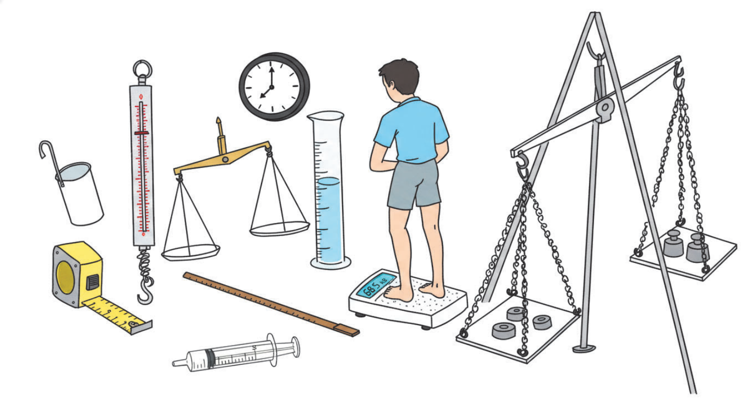

➤ আয়তন পরিমাপক উপকরণ এবং ভর পরিমাপক উপকরণ এইভাবে এদের দুটি আলাদা সমূহ করো।

➤ এদের মধ্যে কোন উপকরণগুলি অবশ্যই স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন? কেনো?

⦿ উপক্রম -

তোমরা হয় তো চুম্বক ব্যবহার করে তৈরী করা কিছু খেলনা দেখেছ। এমন একটি খেলনা তোমরা নিজেরা তৈরী করো, বন্ধুদেরকে দেখাও এবং সেটি কীভাবে তৈরী করেছ তাও বলো।

৭ আলোর যাত্রা

দেখা এবং চোখের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। চোখ না থাকলে দেখা বা দৃশ্যমান হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কিন্তু দেখার জন্য চোখের মতোই অন্য কোনো জিনিসের প্রয়োজন হয় কি ? একটি সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরে আমরা যখন থাকি, তখন ঘরের জিনিসপত্র যেখানে আছে সেখানেই থাকে। তাও ঘরের জিনিসগুলি দেখা যায় না। এমন কেনো হয় ? সেই ঘরে একটি মোমবাতি জ্বালালে বা বাতি জ্বালালে জিনিসগুলি দেখা যায়। দেখা বা দৃশ্যমান হওয়ার জন্য চোখের যতটা প্রয়োজন, আলোরও ঠিক ততটাই প্রয়োজন। আলো না থাকলে চোখ খোলা থাকলেও আশেপাশের কিছুই দেখা যাবে না। আলো না থাকা মানেই অন্ধকার !

যে সমস্ত বস্তু, উপকরণ নিজে থেকে আলো তৈরী করে, তাদের আলোর উৎস বলা হয়। উৎস মানে হলো উৎপত্তিস্থল। কিছু উৎসের আলো খুব তীব্র ও উজ্জ্বল হয়, আবার কিছু উৎসের আলো খুব মৃদু হয়। আলো তৈরী করা প্রতিটি বস্তুই আলোর একটি উৎস। অন্ধকার জায়গায় প্রদীপ জ্বালালে তার আলোর কারণে চারপাশের বস্তু দেখা যায়। অর্থাৎ, উৎস থেকে নির্গত আলো সব দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রদীপ, মশাল, লণ্ঠন এবং বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক বাতি - এই ধরনের আলো প্রদানকারী উপকরণগুলি মানুষ তৈরী করেছে। এই ধরনের উৎসগুলিকে আলোর **মানবসৃষ্ট উৎস** বলা হয়। সূর্য, তারা, আকাশে মাঝে মাঝে চমকানো বিদ্যুৎ এবং জোনাকি এগুলি আলোর **প্রাকৃতিক উৎস**।

বর্ষাকালে অন্ধকার রাতে তুমি কি কখনো কোনো কাছাকাছি থাকা নালা, পুকুর বা জলাভূমি এবং ঝোপঝাড় আছে এমন জায়গায় গিয়েছ ? সবুজ রঙের আলো শরীর থেকে বের করে মিটমিট করা প্রদীপের মতো শত শত জোনাকি সেখানে অন্ধকারে উড়ে বেড়ায়। সেই দৃশ্য অনেকক্ষণ ধরে দেখতে ইচ্ছে করে। আসলে, এই যে আলো জ্বলে আর নেভে, তা হলো আশেপাশের অন্য জোনাকিদের দেওয়া এক ধরনের বার্তা।

সমুদ্রের গভীর অংশেও এমন আলো তৈরী করার মতো কিছু প্রজাতির মাছ এবং শ্যাওলা থাকে। আলোর এই উৎসগুলি কি মানবসৃষ্ট ?

পৃথিবীর জন্য আলোর সবচেয়ে বড়ো উৎস হলো সূর্য। সূর্যালোকের সাহায্যে উদ্ভিদ নিজের খাদ্য নিজেই তৈরী করে, তা থেকে কিছু খাদ্য তারা নিজেদের বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করে। অবশিষ্ট খাদ্য প্রাণীরা পায়। ফুল ফোটা, গাছের বৃদ্ধি হওয়া এসবের জন্য সূর্যালোকের প্রয়োজন হয়। মানব, অণুজীব এবং প্রাণীদের জীবনের জন্যও আলো আবশ্যক।

প্রত্যেক ছবিতে আলোর উৎস কোন দিকে আছে তা ঠিক করো।

সকালে বা সন্ধ্যায় জানালা দিয়ে ঘরে আসা আলোর রশ্মি, অন্ধকারে দূরে মোটর গাড়ির বাতির আলোর রশ্মি এবং বড়ো অনুষ্ঠানের সময় রাতে আকাশে ঘোরানো আলোর রশ্মি আমরা দেখতে পাই। আসলে সেই সময় আমরা যা দেখি, তা হলো আলোর পথে বাতাসে ভাসতে থাকা,আলোর কারণে চকচক করা ধূলিকণা! আলোর কারণে বস্তু দেখা যায়, কিন্তু আলো কখনো দেখা যায় না।

দুই বন্ধু হাতে পাইপ নিয়ে মোমবাতির শিখার দিকে তাকাচ্ছে। কে মোমবাতির শিখা দেখতে পাবে ?

করে দেখো।

(১) একই আকারের তিনটি পিচবোর্ড নাও।

(২) প্রতিটি পিচবোর্ডের ঠিক মাঝখানে একটি করে ছোটো ছিদ্র করো।

(৩) সেই পিচবোর্ডগুলিকে একটি সোজা লাইনে দাঁড় করাও।

(৪) শিখাটি যেন ছিদ্রগুলির লাইনে থাকে, এমনভাবে শেষ পিচবোর্ডের ওপাশে একটি মোমবাতি রাখো।

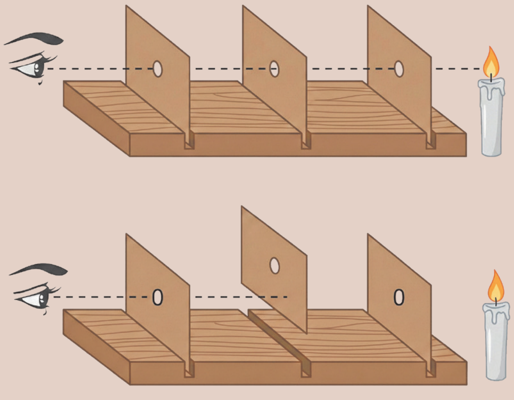

- প্রথম পিচ বোর্ডের ছিদ্র দিয়ে শিখার দিকে তাকাও। মোমবাতির শিখা কি দেখাযাচ্ছে ?
- এখন সেগুলির মধ্য থেকে যে কোনো একটি পিচবোর্ড সামান্য পাশে অথবা ওপরে-নীচে সরাও। এবার কি মোমবাতির শিখা দেখা যাচ্ছে ?
- পিচবোর্ডটি আবার সঠিক জায়গায় রাখো এবং পুনরায় পর্যবেক্ষণ করো।

এই পর্যবেক্ষণ থেকে

আলো একটি সরল রেখায় গমন করে এটা বোঝা যায়। আলোর এই ধর্মকে আলোর রৈখিক প্রসারণ বলা হয়।

◉ আলোর প্রসারণ – রেললাইনে কান পাতলে অনেক দূরে থাকা ট্রেনের আওয়াজ শোনা যায়। কয়েক ফুট লম্বা একটি কাঠের তক্তার এক প্রান্তে হালকা টোকা দিলে অন্য প্রান্তে তা পরিষ্কার শোনা যায়। সাঁতার কাটার সময় জলের নীচে ডুব দিলেও আওয়াজ শোনা যায়। এর মানে কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের মধ্য দিয়ে ধ্বনি চলাচল করতে পারে। এই উপাদানগুলিকে ধ্বনির **'মাধ্যম'** বলা হয়।

ধ্বনি সঞ্চালনের জন্য মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আলোর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার জন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। পৃথিবীর চারপাশে বায়ুর স্তর মাত্র ১০০ কিমি উচ্চতা পর্যন্ত রয়েছে। সূর্য আমাদের থেকে প্রায় ১৫ কোটি কিমি দূরে অবস্থিত। এর অর্থ হলো সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝে এক বিশাল শূন্যস্থান রয়েছে। তা সত্ত্বেও সূর্যের আলো আমাদের পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আলোর প্রসারণের জন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না।

করে দেখো।

একটি বড়ো পিচবোর্ডের বাক্স নাও। তার একপাশে জানালার মতো চারকোনা অংশ কেটে নাও এবং সেই জায়গায় বাটার পেপার অথবা সাদা পাতলা ঘুড়ির কাগজ লাগিয়ে দাও। তার ঠিক বিপরীত দিকে সুচ দিয়ে একটি ছোটো ছিদ্র করো। সেই ছিদ্রের সামনে কিছুটা দূরত্বে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি রাখো। বাক্সের যে পাশে বাটার পেপার লাগানো আছে, সেখান থেকে পর্যবেক্ষণ করো। বাটার পেপারের ওপর প্রতিবিম্ব কেমন দেখাচ্ছে তার ছবি আঁকো।

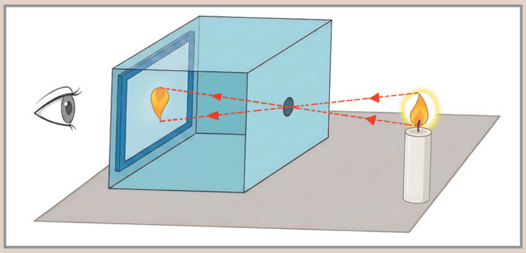

মোমবাতির শিখা থেকে সব দিকে আলোক রশ্মি নির্গত হয়। তার মধ্যে যে রশ্মিগুলি ছিদ্রের দিকে আসে, সেগুলি বাক্সের ভেতরে প্রবেশ করতে পারে।

শিখার ওপরের অংশ থেকে আসা রশ্মিগুলি ছিদ্রের মধ্য দিয়ে পর্দার নীচের দিকে যায়। আর শিখার নীচের অংশ থেকে আসা রশ্মিগুলি ছিদ্রের মধ্য দিয়ে পর্দার ওপরের দিকে যায়। এই কারণে পর্দায় মোমবাতির শিখার একটি উল্টো প্রতিবিম্ব তৈরী হয়। আলো সরলরেখায় গমন করার কারণেই এটি ঘটে। বাটার পেপারের ওপর তৈরী হওয়া প্রতিবিম্বের ছবি আঁকো। এই উপকরণটিতে কোনো লেন্স ব্যবহার করা হয় নি। কেবল একটি ছোটো ছিদ্রের কারণে প্রতিবিম্ব তৈরী হতে সাহায্য হয়। তাই একে **সূচিছিদ্র ক্যামেরা** বলা হয়। 'সূচি' মানে হলো সুচ। ছিদ্র যত ছোটো হবে, প্রতিবিম্ব তত বেশি স্পষ্ট দেখাবে।

সূর্যগ্রহণের সময় খালি চোখে সূর্যের দিকে তাকালে চোখের ক্ষতি হতে পারে। তাই সূর্যগ্রহণ দেখার জন্য অনেকেই পিনহোল ক্যামেরার সাহায্যে গ্রহণের প্রতিবিম্ব দেখে থাকে।

ঘরের মধ্যে কিছুটা অন্ধকার, কিন্তু বাইরে রোদ্দুর আছে এমন জায়গায় জানালার কাছে এই বাক্সটি রেখে পর্দার ওপর বাইরের দৃশ্য দেখার চেষ্টা করো।

◉ আলোর প্রতিফলন – আলোক রশ্মি সরলরেখায় গমন করে। এই রশ্মিগুলির পথে যদি কোনো বাধা আসে, তবে কী হয় ?বাধাটি যদি কাঁচের মতো স্বচ্ছ হয়, তবে আলো তার মধ্য দিয়ে এপার-ওপার চলে যায়। অর্ধস্বচ্ছ হলে, তবে কিছু আলো পার হয়ে যায় এবং কিছু আলো পেছনে ফিরে আসে। কাঠ বা পিচবোর্ডের মতো যদি কোনো অস্বচ্ছ বাধা থাকে, তবে আলো তার ওপাশে যেতে পারে না। সেখান থেকে আলো পেছনে ফিরে আসে। কোনো বস্তুর ওপর আপতিত আলোক রশ্মি বস্তুর পৃষ্ঠভাগ থেকে পেছনে ফিরে আসার এই ঘটনাকে **আলোর প্রতিফলন** বলা হয়।

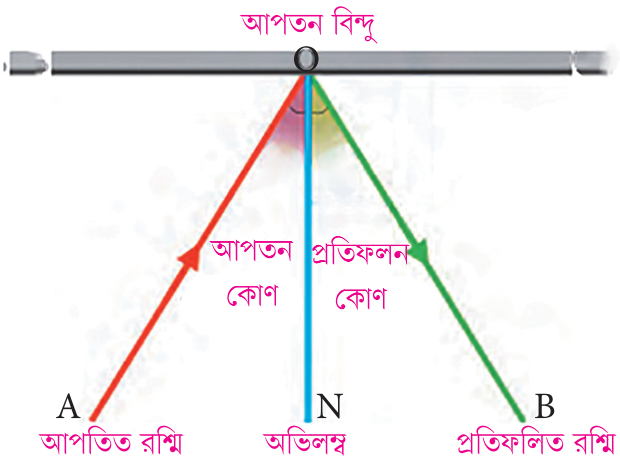

উৎস থেকে বেরিয়ে পৃষ্ঠতল পর্যন্ত পৌঁছানো আলোক রশ্মিকে **আপতিত রশ্মি** বলে। চিত্রে AO হলো আপতিত রশ্মি। আপতিত রশ্মি পৃষ্ঠতলের যে বিন্দুতে পড়ে, তাকে আপতন বিন্দু বলে। এখানে 'O' হলো আপতন বিন্দু। **আপতন বিন্দু** থেকে পৃষ্ঠতলের ওপর অঙ্কিত লম্ব রেখাকে **অভিলম্ব** বলে।

পৃষ্ঠতল থেকে ফিরে আসা আলোক রশ্মিকে **প্রতিফলিত রশ্মি** বলে।

∠AON হলো আপতিত রশ্মি অভিলম্বের সাথে তৈরী করা কোণ। এই কোণকে **আপতন কোণ** বলে। প্রতিফলিত রশ্মি অভিলম্বের সাথে যে কোণ তৈরী করেছে, ∠BON এই কোণকে **প্রতিফলন কোণ** বলে।

করে দেখো।

একটি সাদা কাগজ, বলপেনের দুটি রিফিল বা সমপরিমাণ দৈর্ঘ্যের দুটি সরু সোজা কাঠি, পেন্সিল, জ্যামিতি বক্সের কোণমাপক, একটি বড়ো কাঠের টুকরো বা জলের বোতল এবং সেলোটেপ বা সুতো সংগ্রহ করো। সম্ভব হলে এই কাঠি দুটিতে আলাদা আলাদা রঙ করো।

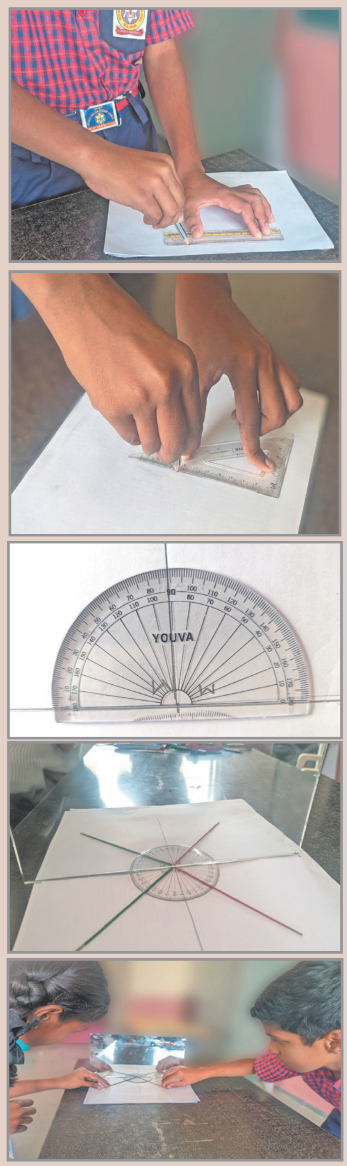

সাদা কাগজের একটি ধারের কাছে পেন্সিল দিয়ে একটি সোজা রেখা টানো। তার মাঝখানে স্পষ্ট দেখা যায় এমন চিহ্ন দিয়ে সেই বিন্দুর M নাম দাও। এখন বিন্দু থেকে রেখাটির ওপর একটি লম্ব অঙ্কন করো। MN এই লম্ব রেখাকে আমরা অভিলম্ব বলব।

চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে, সেভাবে কোণমাপকটি কাগজের ওপর রাখো। আধারের জন্য একটি কাঠের টুকরো বা জলের বোতল রেখে রেখাটির ওপর একটি আয়না সোজা করে দাঁড় করাও। আয়নাটি যাতে পড়ে না যায়, তার জন্য সেলোটেপ বা সুতো ব্যবহার করতে পারো।

এবার একটি রঙিন কাঠির একটি প্রান্ত আয়নার সাথে এমনভাবে রাখো, যেমনটি চিত্রে দেখানো হয়েছে। আয়নায় তার একটি রঙিন প্রতিবিম্ব দেখা যাবে।

দ্বিতীয় কাঠিটি এমনভাবে রাখো যাতে প্রথম রঙিন কাঠিটির আয়নার ভেতরের প্রতিবিম্ব এবং এই দ্বিতীয় কাঠিটি একই সরলরেখায় দেখা যায়। এবার উভয় কাঠির MN অভিলম্বের সাথে তৈরী হওয়া কোণ দুটি পরিমাপ করো।

তিনটি আলাদা আলাদা কোণের জন্য এই কৃতিটি করে দেখো।

প্রতিবার পরিমাপ করা কোণগুলির মান লক্ষ্য করো। এর থেকে কী বুঝতে পারলে ?

রঙিন কাঠিটি যদি সরাসরি অভিলম্বের উপর রাখা হয়, তবে কী হয়, তা করে দেখো।

পদার্থের পৃষ্ঠভাগে আপতিত আলোক রশ্মি সেখান থেকে ফিরে আসে, একেই **আলোর প্রতিফলন** বলা হয়। প্রতিটি আলোক রশ্মির প্রতিফলনের সময় -

(১) আপতিত রশ্মি ও প্রতিফলিত রশ্মি অভিলম্বের বিপরীত পাশে অবস্থান করে।

(২) আপতন কোণ এবং প্রতিফলন কোণ সমান পরিমাপের হয়।

(৩) আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি এবং অভিলম্ব একই সমতলে অবস্থান করে।

এগুলিকেই প্রতিফলনের নিয়ম বলা হয়।

আয়নার মতো মসৃণ পৃষ্ঠভাগে একদিক থেকে সমান্তরালভাবে আসা আলোক রশ্মি অন্য দিকেও সমান্তরালভাবেই চলে যায়। এই ধরনের প্রতিফলনকে **নিয়মিত প্রতিফলন** বলা হয়। কিন্তু অমসৃণ পৃষ্ঠভাগ থেকে প্রতিফলিত হওয়ার পর রশ্মিগুলি ভিন্ন ভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই কারণে, অমসৃণ পৃষ্ঠভাগে হওয়া প্রতিফলনকে আলোর **বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন** বলা হয়।

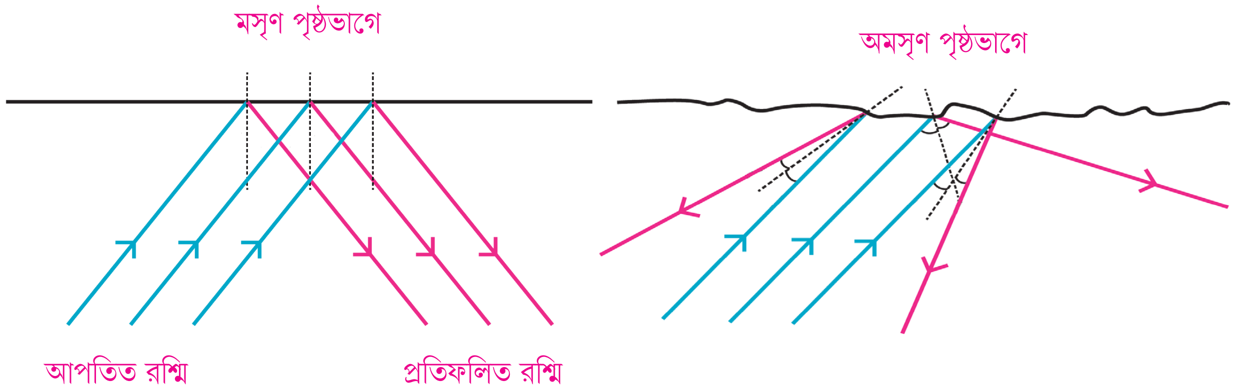

পৃষ্ঠভাগ মসৃণ-সমতল হোক কিংবা অমসৃণ, আলোর প্রতিফলন হওয়ার সময় আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণের মান সবসময় সমানই থাকে। পৃষ্ঠভাগ সমতল ও মসৃণ হলে, প্রতিফলিত হওয়া সমস্ত সমান্তরাল রশ্মি একই নির্দিষ্ট দিকে যায়। এই কারণেই আয়না রোদে ধরে আমরা সামনের দেওয়ালে আলোর প্রতিবিম্ব ফেলতে পারি।

ভেবে দেখো।

আয়নায় যদি প্রতিবিম্ব দেখতে হয়, তবে তা আয়নার সামনের একটি নির্দিষ্ট দিক থেকেই দেখা যায়। কিন্তু ঘরের জিনিসপত্র বা আশেপাশের গাছপালা যেকোনো দিক থেকে দেখলেই দেখা যায়। এই পার্থক্যের কারণ কী ?

বিক্ষিপ্ত প্রতিফলনের ক্ষেত্রেও প্রতিটি বিন্দুতে প্রতিফলনের নিয়মগুলি মেনে চলা হয়। অমসৃণ অংশ থেকে প্রতিফলিত হওয়ার কারণে রশ্মিগুলি ভিন্ন ভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। রাস্তার একটি পাথরকে যেকোনো দিক থেকে দেখলেই দেখা যায়, এর কারণ হলো সেই মুহূর্তে সূর্যরশ্মি একটি নির্দিষ্ট দিক থেকে এলেও, পাথরের অমসৃণ পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত হওয়ার পর আলোক রশ্মিগুলি চারপাশের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেই সমস্ত জায়গা থেকেই পাথরটিকে দেখা সম্ভব হয়। অর্থাৎ, আমরা আমাদের চারপাশের বস্তুসমূহকে দেখতে পাই মূলত এই বিক্ষিপ্ত প্রতিফলনের কারণেই।

আমরা কী শিখলাম ?

- আলো হলো শক্তির একটি রূপ।
- আলো সবসময় সরলরেখায় গমন করে। এরজন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না।
- আলো সরলরেখায় গমন করে এর ওপর ভিত্তি করে তৈরী উপকরণ হলো - সূচিছিদ্র ক্যামেরা
- আলোর উৎস দুই প্রকারের হয় প্রাকৃতিক (যেমন: সূর্য, তারা) এবং মানবসৃষ্ট (যেমন: বাল্ব, টর্চ)।
- আলোর প্রতিফলন - আলোর উৎস থেকে আসা আলোক রশ্মি কোনো বস্তুর পৃষ্ঠতলে পড়ে আবার ফিরে যাওয়ার ঘটনাকে আলোর প্রতিফলন বলে।
- আলোর প্রতিফলনের নিয়ম - (১)আপতিত রশ্মি এবং প্রতিফলিত রশ্মি অভিলম্বের বিপরীত পাশে অবস্থান করে। (২) আপতন কোণ এবং প্রতিফলন কোণ সবসময় সমান পরিমাপের হয়। (৩) আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি এবং অভিলম্ব একই সমতলে থাকে।
- আলো প্রতিফলনের প্রকার দুটি নিয়মিত প্রতিফলন এবং বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন।
- অমসৃণ পৃষ্ঠতল থেকে আলোর বিক্ষিপ্ত প্রতিফলনের কারণে আমরা চারপাশের বস্তুগুলিকে দেখতে পাই।
- আয়না এবং চকচকে ধাতুর নতুন বাসনপত্র থেকে আলোর যে প্রতিফলন হয়, তা হলো নিয়মিত প্রতিফলন।

অনুশীলনী

(১) শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

(১) .... হলো পৃথিবীর জন্য আলোর সবচেয়ে বড়ো প্রাকৃতিক উৎস।

(২) অস্বচ্ছ বস্তুর ওপর আলো পড়লে, আলোর .... হয়।

(৩) .... ক্যামেরার কার্যপদ্ধতি আলোর সরলরেখায় গমনের ওপর নির্ভর করে।

(৪) জানালা দিয়ে আসা আলোর রশ্মি বাতাসের .... এর কারণে দেখা যায়।

(৫) স্থির জল থেকে আলোর প্রতিফলন .... ভাবে হয়ে থাকে।

(২) সঠিক বিকল্পটি বেছে নাও।

(১) আপতন কোণ যদি ৩০ ডিগ্রি পরিমাপের হয়, তবে প্রতিফলন কোণ হবে .... ডিগ্রি।

(অ) ০ (ব) ৬০ (ক) ৩০ (ড) ৯০

(২) সমতল আয়নায় স্পষ্ট প্রতিবিম্ব দেখা যায়, কারণ -

(অ) আলোর নিয়মিত প্রতিফলন হয়।

(ব) আয়নার পৃষ্ঠতল অমসৃণ।

(ক) আয়না স্বচ্ছ হয়।

(ড) আয়না থেকে আলোর বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন হয়।

(৩) আমরা চাঁদকে দেখতে পাই কারণ -

(অ) চাঁদ নিজস্ব আলোয় আলোকিত।

(ব) চাঁদ পৃথিবীর একটি উপগ্রহ।

(ক) চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে সূর্যালোক প্রতিফলিত হয়।

(ড) চাঁদ পৃথিবীর খুব কাছে অবস্থিত।

(৪) আলোর প্রতিফলনের সময় আপতন কোণ এবং প্রতিফলন কোণ কখন সমান পরিমাপের হয় ?

(অ) সবসময়

(ব) মাঝেমধ্যে

(ক) একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে

(ড) কখনোই নয়

(৩) চাঁদ পৃথিবী থেকে প্রায় চার লক্ষ কিমি দূরে অবস্থিত। পৃথিবী থেকে চাঁদকে দেখা যায়। কিন্তু কোনো কারণে সেখানে উৎপন্ন ধ্বনি পৃথিবীতে শোনা যায় না। এমন কেনো হয় ?

(৪) নীচের বিবৃতিগুলি সত্য না মিথ্যা তা বলো। মিথ্যা বিবৃতিগুলি সংশোধন করে পুনরায় লেখো।

(১) আপতিত রশ্মিকে অভিলম্ব বলা হয়।

(২) বাঁকানো পাইপের মধ্য দিয়ে আমরা সামনে রাখা বস্তু দেখতে পারি।

(৩) অন্ধকার ঘরে বস্তু আমাদের কাছে পরিষ্কারভাবে দৃশ্যমান হয়।

(৪) সূচিছিদ্র ক্যামেরায় গঠিত প্রতিবিম্ব উল্টো হয়।

(৫) কে মোমবাতির শিখাটি দেখতে পাবে ?

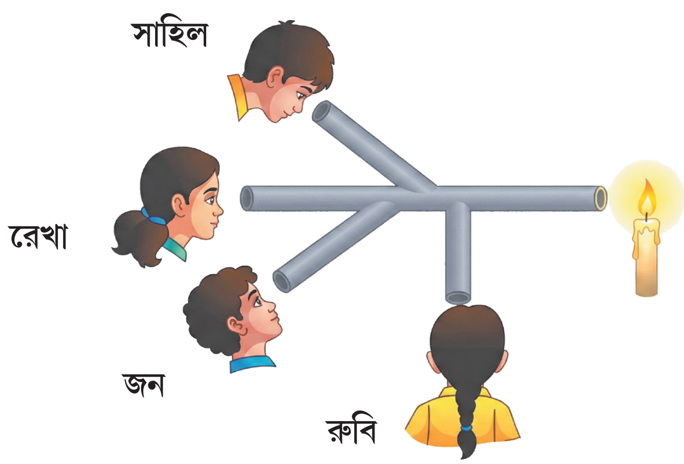

(৬) আকৃতিতে সঠিক নাম দাও।

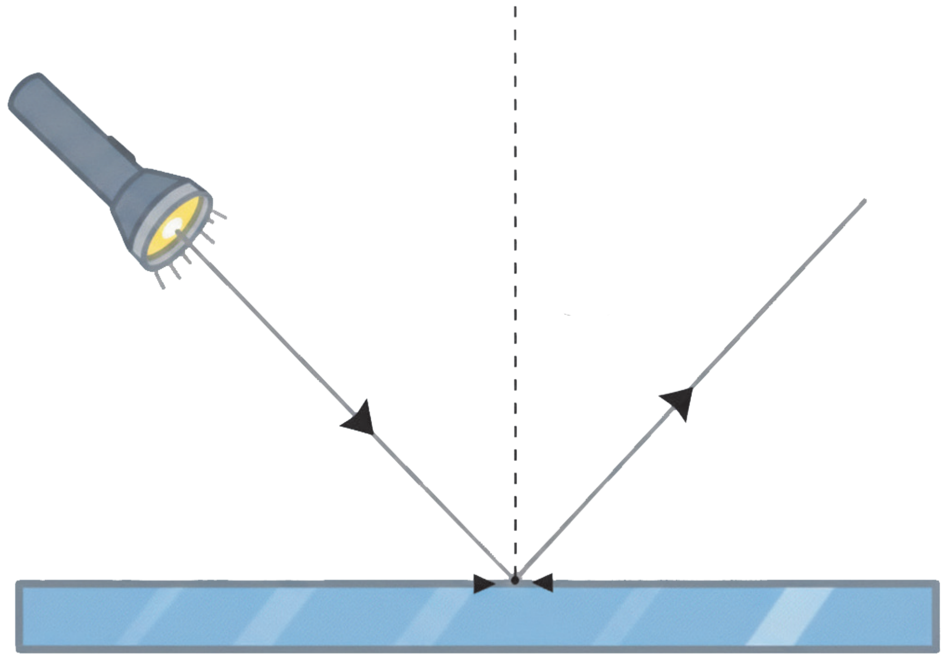

(৭) স্থির জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। জলে যদি ঢেউ বা তরঙ্গ থাকে, তবে প্রতিবিম্ব কি একই রকম দেখাবে ? কেনো এই পরিবর্তন হয় তার কারণ বলো।

(৮) স্বপ্রকাশিত এবং পরপ্রকাশিত এই দুটি দলে ভাগ করো।

আকাশে দেখতে পাওয়া বিমান, বই, সূর্য, সোনা, আগুন, চাঁদ, প্রদীপের শিখা, প্রদীপ, প্রদীপের মধ্যের তেল।

উপক্রম -

(১) অ্যাপোলো মহাকাশযানে করে চাঁদে নামা মহাকাশচারীরা সেখানে দুটি বড়ো আয়না রেখে এসেছেন। সেগুলি কী কাজে ব্যবহার করা হয়, সেই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করো।

(২) একটু বড়ো আকারের একটি সূচিছিদ্র ক্যামেরা তৈরী করো। তার সাহায্যে ছবি আরও স্পষ্ট দেখার জন্য তুমি কী কৌশল ব্যবহার করবে ? সেই ক্যামেরাটি বন্ধুদের দেখাও, প্রদর্শনীতে রাখো।

৮ আকাশের ওপারে

আজ থেকে ১৫-২০ হাজার বছর আগে মানুষের ঘরবাড়ি, পোশাক, খাবার রান্না করে খাওয়ার কোনো ধারণা ছিল না। ক্ষুধা লাগলেই বনে-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে শিকার করা বা খাবার খোঁজা, জলাশয় থেকে জল খাওয়া, তারপর গুহায় গিয়ে বিশ্রাম নেওয়া তখনকার জীবনযাত্রা ছিল পুরোপুরি বুনো পশুর মতোই।

অন্ধকার রাতে আকাশের ঝলমলে নক্ষত্রের বিস্ময় এবং কৌতূহল সেই আদিমকাল থেকেই ছিল। মানুষ খুব সূক্ষ্মভাবে রাতের আকাশ পর্যবেক্ষণ করত। আকাশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা হাজার হাজার তারার মধ্যে কিছু নির্দিষ্ট তারার সমূহ, আকাশে তাদের অবস্থান পরিবর্তন এসব দেখে বর্ষাকাল বা শীতকাল এগিয়ে আসছে তার অনুমান, এর মতো অনেক বিষয় তখনকার মানুষ জেনে গিয়েছিল। রাতে বনে ঘোরার সময় তারাদের দেখে তারা দিক চিনতে পারত। কিছুদিন দেখা দিয়ে উধাও হয়ে যাওয়া ধূমকেতুও তারা দেখেছিল। শুধু তাই নয়, ধূমকেতু পৃথিবীতে আঘাত করলে কী ঘটে, তাও তারা জানত। এই ধরনের ঘটনার ছবি কিছু মানুষ গুহার পাথরে এঁকে রাখত। পৃথিবীর বহু স্থানে গুহার ভেতরে এই ধরনের ছবি দেখতে পাওয়া যায়।

ধূমকেতু পৃথিবীতে আঘাত করার ফলে মানুষ ও প্রাণীদের ধ্বংসের দৃশ্য।
পনেরো হাজার বছর পুরোনো গুহাচিত্র।

ভেবে দেখো।

গুহার মধ্যে পাথরে চিত্র আঁকার জন্য মানুষ কোন ধরনের জিনিস ব্যবহার করত ? এই ধরনের চিত্র তারা কেন এঁকে ছিল ?

◉ আকাশ এবং মহাকাশ – আকাশ বললেই কেউ কেউ মনে করে তার নীল রঙ, উঁচুতে ওড়া পাখি, ঘুড়ি এবং বিমান। আবার কেউ মনে পড়ে চাঁদ, সূর্য, তারা। আকাশ মানে আসলে ঠিক কী ?

সম্পূর্ণ পৃথিবীর চারপাশে বাতাসের একটি পুরু আবরণ রয়েছে, তাকে বায়ুমণ্ডল বলা হয় এটি আমরা জানি। সমুদ্রপৃষ্ঠের কাছাকাছি বাতাসের এই স্তরটি বেশ ঘন থাকে। হিমালয়ের মতো উঁচু পর্বতের চূড়ায় হাওয়া তার চেয়ে অনেক পাতলা হয়ে যায়। তারথেকে আরও উঁচুতে আরও পাতলা হতে থাকে। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার উচ্চতার পর বায়ুমণ্ডল অত্যন্ত বিরল হয়ে যায়। তার চেয়ে ও উঁচুতে এমন স্থিতি হয় যেখানে কোনো বাতাসই থাকে না।

বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন গ্যাসের কণা থাকে। এছাড়া ধূলিকণা এবং জলীয় বাষ্পের সূক্ষ্ম কণা বাতাসে ভেসে বেড়ায়। সূর্যের আলোকরশ্মি এই কণাগুলোর ওপর পড়ায় এই আলোকচ্ছটার নীল রঙের রশ্মি আশেপাশে বেশি ছাড়িয়ে পড়ে, এই জন্য ওই অংশ নীল রঙের দেখায়। এই কারণে দিনের বেলায় আকাশ নীল দেখায়। এই প্রভাবটি পৃথিবীর চারপাশের যে পর্যন্ত বায়ুমণ্ডল থাকে, সেই পর্যন্তই দেখা যায়। তার ওপরের অংশে বায়ুমণ্ডল নেই অর্থাৎ সেখানে কোনো বাতাস, বাষ্পকণা নেই। তাই সূর্যের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে না, সেই কারণে সেখানে নীল রঙও দেখা যায় না। অর্থাৎ পৃথিবীর চারপাশের যে পর্যন্ত বায়ুমণ্ডল আছে, সেই পর্যন্ত শুন্যস্থানকে **'আকাশ'** বলা হয়। আকাশ যেখানে শেষ হয়, **সেখান থেকেই মহাকাশ শুরু হয়।** আকাশের ওপারের এই শূন্যস্থানকেই মহাকাশ বলা হয়। মহাকাশের কিন্তু কোনো শেষ সীমানা নেই।

জেট বিমানগুলি হিমালয়ের চেয়ে ও অনেক উঁচুতে ওড়ে। মেঘ তার চেয়ে ও নীচে থাকে। উঁচুতে ওড়া পাখি এবং ঘুড়ি তো তার চেয়ে ও অনেক নীচে অর্থাৎ পৃথিবীর কাছাকাছিই থাকে। সূর্য, তারা এবং অন্যান্য গ্রহ এর চেয়ে অনেক অনেক দূরে, পৃথিবী থেকে কোটি কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এবার ভেবে দেখো, ওপরের বিষয় গুলির মধ্যে কোনগুলিকে আকাশের বস্তু বলা যাবে ? মহাকাশে থাকা কোন কোন বস্তু সম্পর্কে তোমরা জানো ?

ভেবে দেখো।

✦ চন্দ্রযান, মঙ্গলযান বা সূর্যের সম্পর্কিত আরও তথ্য সংগ্রহ করার জন্য পাঠানো আদিত্য L1 যান এদেরকে মহাকাশযান কেনো বলা হয় ? জেট বিমানকে মহাকাশযান বলা যাবে কি ?

✦ বর্ষাকালে অনেক সময় বিদ্যুৎ চমকায়। সেই সময় বিদ্যুৎ আকাশেই চমকায় না কি মহাকাশে ?

আদিত্য L1 মহাকাশযান
প্রায় ১৫ লাখ কিমি

ভূ-স্থির উপগ্রহ
প্রায় ৩৬,০০০ কিমি

মহাকাশ স্টেশন
প্রায় ৪৫০ থেকে
৫৫০ কিমি

যোগাযোগ উপগ্রহ
প্রায় ৩০০ থেকে
৪৫০ কিমি

যুদ্ধবিমান
প্রায় ২০ কিমি

যাত্রীবাহী বিমান
প্রায় ১০ কিমি

মাউন্ট এভারেস্ট
৮.৮ কিমি (সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে)

মেঘ মাটি থেকে
প্রায় ৬ কিমি

উড়ন্ত পাখি এবং ঘুড়ি
মাটির খুব কাছাকাছি

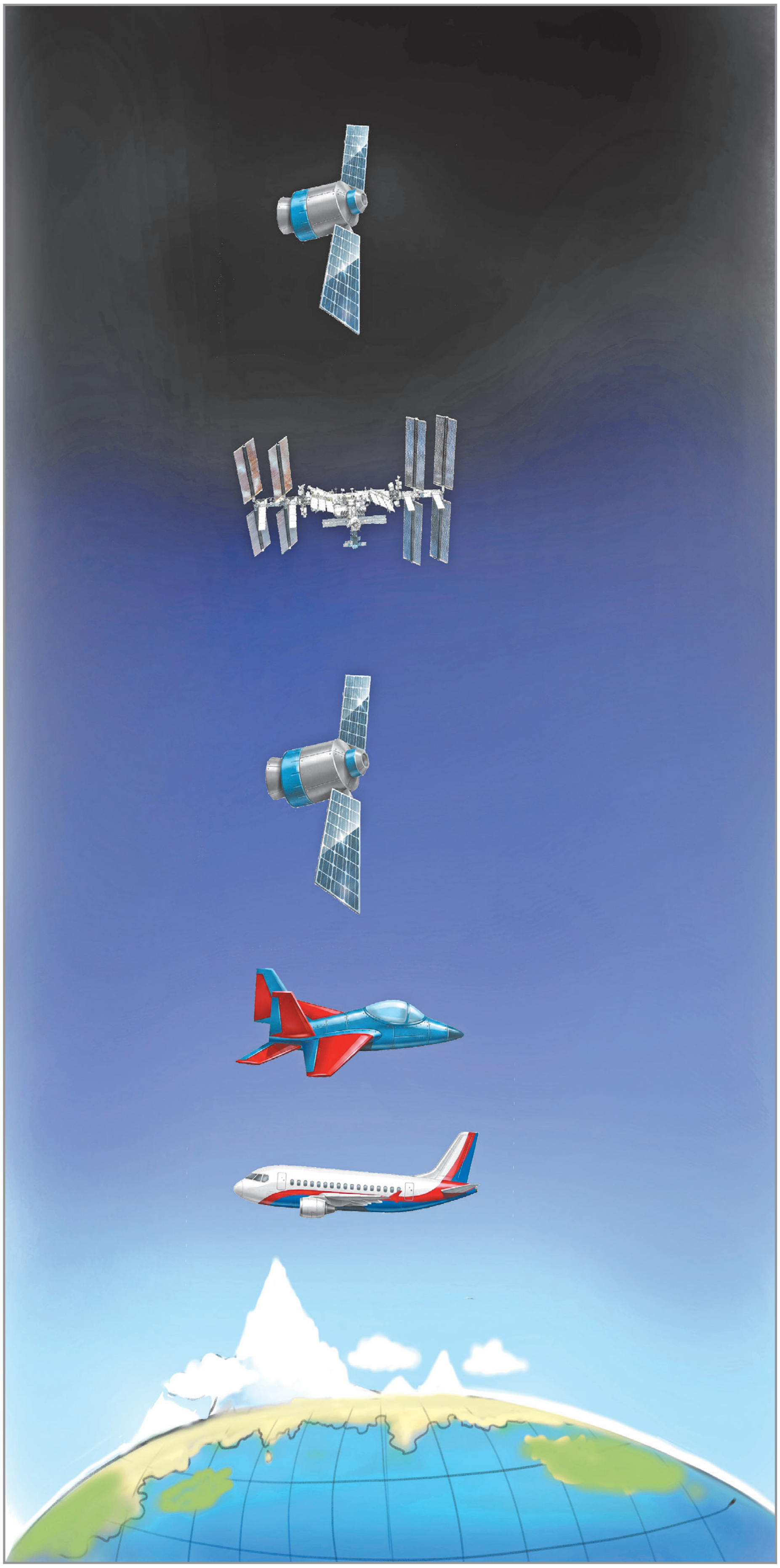

পূর্বে দূরবীন ছিল না। খালি চোখে গ্রহ নক্ষত্রের পর্যবেক্ষণ, তা থেকে অনুমান এবং হিসাব করে গণনা করে প্রাপ্ত তথ্য তখনকার সময়ে মানুষের জানা ছিল। একেকটি গ্রহের সূর্য প্রদক্ষিণ করতে সময় কত লাগে, সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ কখন হবে, কোন গ্রহ ও নক্ষত্র কখন কোন দিকে দেখা যাবে এই ধরনের তথ্য তাঁদের কাছে থাকতো।

গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের জন্য দূরবীনের ব্যবহার খ্রিস্টাব্দ ১৬০৯ থেকে, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ৪০০ বছর আগে শুরু হয়েছিল। প্রথম দিকের দূরবীন দিয়ে চাঁদের গর্ত, সূর্যের দাগ এবং বৃহস্পতির চারপাশের চাঁদ এই ধরনের কিছু তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে নতুন ধরনের অত্যন্ত শক্তিশালী দূরবীন বিজ্ঞানীরা তৈরী করেন। ফলে দূরবীনের ব্যবহার করে বিপুল নতুন তথ্য পাওয়া যেতে লাগল। আমাদের জানা নেই এমন কিছু গ্রহ, গ্রহের চারপাশের পরিস্থিতি, তাদের চারপাশে ভ্রমণরত চাঁদ ইত্যাদি বিষয় জানা সম্ভব হলো। মহাকাশে অত্যন্ত দূরে ঘটে চলা ঘটনা, তার প্রভাব এসব তথ্য প্রাপ্ত হতে লাগল। এক্স-রে, আল্ট্রা ভায়োলেট রশ্মি, ইনফ্রারেড রশ্মি-র মতো বিভিন্ন রশ্মির ব্যবহার করে কোটি কোটি কিমি দূরের মহাকাশে ঘটে চলা বিভিন্ন ঘটনার ছবি ও নিখুঁত তথ্য পাওয়া উপকরণ তৈরী হয়েছে। অতিদুরে অবস্থিত গ্রহ পর্যন্ত মহাকাশযান পৌছে সেখানকার তথ্য পাঠিয়েছে। এই সব গবেষণার কারণে গত ১০০ বছরে মহাকাশ সম্পর্কে আমরা প্রচুর নতুন তথ্য পেয়েছি।

অন্ধকার রাতে আকাশের দিকে তাকালে অনেক নক্ষত্র দেখা যায়। তাদের মধ্যে সূর্য প্রদক্ষিণকারী গ্রহ মাত্র আটটি, বাকিরা সূর্যের মতোই নিজস্ব আলো উৎপন্ন করা নক্ষত্র। কিছু নক্ষত্র বেশি উজ্জ্বল দেখা যায়, আবার কিছু নক্ষত্র খুবই আবছা দেখায়। কিছু তারার দল বা নক্ষত্রমণ্ডল নির্দিষ্ট আকারে সাজানো থাকে। এই নক্ষত্রমণ্ডলগুলি আকাশের অবস্থান ধীরে ধীরে বদলাতে থাকে। পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে তাদের অবস্থান পরিবর্তন হতে দেখা যায়। কিন্তু এই নক্ষত্রমণ্ডলীর আকৃতি বা তাদের পারস্পরিক গঠন একই রকম থাকে, শুধু আকাশে তাদের দৃশ্যমান অবস্থানটি পরিবর্তিত হয়। এই ধরনের তারার সমষ্টিকে তারকাসমূহ বা নক্ষত্রমণ্ডল বলা হয়। তুমি কি কখনো এমন নক্ষত্রমণ্ডল দেখেছো ?

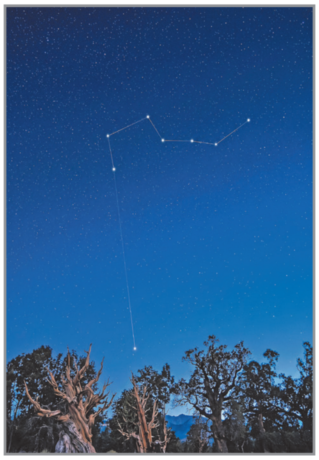

- চিত্রে প্রদর্শিত নক্ষত্র রাতের আকাশে খুঁজে দেখ, বড়দের কাছ থেকে তাদের নাম জেনে নাও।

- বৃষ্টি, চাষবাসের কাজ ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত নক্ষত্রগুলির নাম জেনে নাও। সেই তথ্য ক্লাসের বন্ধুদের সাথে ভাগ করে নাও।

- নক্ষত্রের নাম এবং চাষবাসের কাজের সম্পর্ক বোঝায় এমন কিছু প্রবাদ কথা কৃষকদের জানা থাকে। যেমন, 'স্বাতী নক্ষত্রে বৃষ্টি হলে মুক্তার মতো ফসল ফলে।' বয়স্ক ব্যক্তিদের সাথে কথা বলে এমন আরও কিছু প্রবাদ সংগ্রহ করো, তা খাতায় লিখে রাখো।

পৃথিবী একটি বিশাল বলের মতো গোলাকার। সেই বিশাল গোলকের কোনো একটি স্থান থেকে আমরা যখন উপরের আকাশের দিকে তাকাই, তখন আমাদের মাথার উপরের আকাশের কেবল কিছু অংশই দেখতে পাই। এই কারণেই আকাশের সমস্ত নক্ষত্র আমরা একসাথে দেখতে পারি না।

বিষুবরেখার উপরের অংশকে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ এবং বিষুবরেখার নীচের অংশকে দক্ষিণ গোলার্ধ বলা হয়। দক্ষিণ গোলার্ধের মানুষ উত্তর গোলার্ধের আকাশ, তারা ও নক্ষত্র সেখান থেকে দেখতে পায় না। উত্তর দিকে থাকা ধ্রুবতারা পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে দেখা যায় না।

◉ **ধূমকেতু** – ধূমকেতু হলো ধূলিকণা, জমে থাকা গ্যাস এবং বরফ দিয়ে তৈরী এক ধরনের মহাজাগতিক বস্তু। বহু ধূমকেতু আমাদের সৌরজগতেরই অংশ। তবে কিছু ধূমকেতু সৌর জগতের বাইরে থেকে এসে সূর্যের চারপাশে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে পরিক্রমা করে আবার দূরে চলে যায়। সূর্য থেকে দূরে থাকার সময় এদের তারার মতো বিন্দুর অনুরূপ দেখায়। সূর্যের কাছাকাছি আসার পর সূর্যের উত্তাপের কারণে এর মধ্যকার কিছু পদার্থ গ্যাসে রূপান্তরিত হয়।

এই গ্যাসগুলি সূর্যের বিপরীত দিকে ছিটকে যায়। এর ফলে ধূমকেতুর একটি লেজ তৈরী হয়েছে বলে মনে হয়। কোটি কোটি কিলোমিটার দূর থেকে ধূমকেতুরা সূর্যের দিকে আসে, সূর্যের চারপাশে পরিক্রমা করে এবং আবার দূরে চলে যায়। এরা অনেক বছর পর পর ফিরে আসে। ভিন্ন ভিন্ন ধুমকেতুর পরিক্রমা কাল ভিন্ন ভিন্ন হয়। হ্যালির ধূমকেতুর সূর্যের চারপাশে একবার ঘুরে আসতে ৭৬ বছর সময় লাগে। বিজ্ঞানীদের অনুমান যে 'কমেট এ ৩' নামক ধূমকেতুটির সূর্যের চারপাশে পরিক্রমা করতে প্রায় ৮০,০০০ বছর সময় লাগে।

তোমরা জানো কী ?

সাধারণত ধূমকেতু সূর্যের চারপাশে পরিক্রমা করে। ১৯৯৩ সালে শুমেকার-লেভি ৯ নামের একটি ধূমকেতুকে বৃহস্পতি গ্রহের চারপাশে পরিক্রমা করতে দেখা গিয়েছিল। বৃহস্পতি গ্রহের প্রচণ্ড মহাকর্ষ বলের কারণে সেই ধূমকেতুটি টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এই টুকরোগুলি ১৬ থেকে ২২ জুলাই ১৯৯৪ সালের মধ্যে একে একে বৃহস্পতি গ্রহের ওপর সংঘাত করে। এর ফলে বৃহস্পতি গ্রহে সৃষ্ট গ্যাসের কুণ্ডলী বহু মাস ধরে দূরবীনের সাহায্যে দেখা গিয়েছিল।

অতীতে পৃথিবীতে ও বেশ কয়েকবার ধূমকেতুর আঘাত হয়েছিল। তখন বায়ুমণ্ডলে বিশাল পরিবর্তন, প্রাণী ও উদ্ভিদ ধ্বংস হয়েছিল এবং বিশাল বড়ো গর্ত তৈরী হয়ে সেখানে হ্রদ সৃষ্টি হওয়ার মতো প্রভাব ঘটেছিল এরূপ বিজ্ঞানীরা মনে করেন। সূর্যের চারপাশে পাথরের লাখ লাখ ছোটো-বড়ো টুকরো এবং পূর্বে চলে যাওয়া ধূমকেতু থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া অবশিষ্টাংশ নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরতে থাকে। কখনো কখনো এর মধ্যে থেকে কোনো একটি পাথর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানে আকৃষ্ট হয় এবং অত্যন্ত দ্রুত গতিতে পৃথিবীর দিকে আসতে শুরু করে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার পর বাতাসের সাথে এর প্রচণ্ড ঘর্ষণ হয়, ফলে এটি খুব গরম হয়ে জ্বলতে শুরু করে। তখন আকাশে যেন কোনো তারা খসে পড়ছে বলে মনে হয়। একেই **উল্কা** বলা হয়।

লোণার হ্রদ

যদি সেই পাথরটি অনেক বেশি বড়ো হয়, তবে তার কিছু অংশ মাটিতে এসে পৌঁছায়। তার প্রচণ্ড গতির কারণে মাটিতে একটি বিশাল গর্ত তৈরী হয়। সেই গর্তে জল জমে হ্রদ তৈরী হয়। বুলঢাণা জেলার নোনা জলের বিশাল হ্রদ হাজার হাজার বছর আগে ঠিক এইভাবেই তৈরী হয়েছিল। বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা এই হ্রদ এবং এখানকার পাথর নিয়ে গবেষণা করার জন্য লোণারে আসেন।

লস অ্যাঞ্জেলেস হলো আমেরিকার একটি অত্যন্ত বড়ো শহর। তীব্র আলোর বাতির ঝলকানিতে এই শহর সব সময় আলোকময় হয়ে থাকে। সেখানে রাত হয়েছে কিনা তাও বোঝা যায় না চারিদিকে এতো আলো থাকে। ১৯৯৪ সালে একটি বড়ো ভূমিকম্পের কারণে পুরো শহরের বিদ্যুৎ সরবরাহ কয়েক দিনের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। রাতের অন্ধকারে আকাশের দিকে তাকিয়ে সেখানকার সমস্ত মানুষ একসাথে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। তারা আকাশে দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিক পর্যন্ত বিস্তৃত একটি উজ্জ্বল, সাদা নদীর মতো ধারা দেখতে পাচ্ছিল ! কোনো শত্রুর বোমাবর্ষণ নাকি নতুন কোনো সংকট ভেবে সবার মনে ভয় ও হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। চারিদিকে এক বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরী হলো। কিন্তু কিসের ছিল সেই আবছা সাদা ধারাটি ?

দুধের মতো দেখতে সেই আবছা ধারাটি তার হাজার হাজার বছর আগে থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের কাছে পরিচিত ছিল। আকাশের নদীর মতো দেখায় বলে এই ধারাটিকে ‘আকাশগঙ্গা’ বা ‘মিল্কিওয়ে’ নাম দেওয়া হয়েছে। আশেপাশের তীব্র আলোর কারণে ওই শহরের মানুষ রাতে এই ধারাটি কখনোই দেখতে পায়নি, এমনকি তারা এটি সম্পর্কে জানতোও না। গাঢ় অন্ধকারের কারণে যখন এটি দৃশ্যমান হলো, তখন মানুষ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তুমি কি আকাশগঙ্গা দেখেছ ?

আশেপাশে বিদ্যুতের অনেক আলো জ্বলছে এমন জায়গা থেকে রাতে আকাশের দিকে দেখো। গ্রাম থেকে দূরে অবস্থিত কোনো মাঠ, পাহাড়ের মতো জায়গা থেকেও রাতে আকাশ পর্যবেক্ষণ করো। তোমার অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ বন্ধুদেরকে বলো।

খালি চোখে দেখলে আকাশগঙ্গা একটি আবছা সাদা ফিতার মতো দেখায়। দূরবীন দিয়ে আকাশগঙ্গার দিকে দেখলে বোঝা যায় যে সেখানে হাজার হাজার, লাখ লাখ ছোটো-বড়ো তারা রয়েছে। কিছু তারা অনেক বড়, আবার কিছু খুব ছোটো। কিছু তারা অত্যন্ত উজ্জ্বল, আবার কিছু ঝাপসা। এদের মধ্যে প্রতিটি তারা আমাদের সূর্যের মতোই ক্রমাগত আলো, উত্তাপ এবং বিভিন্ন ধরনের শক্তি নির্গত করে চলেছে। আমাদের সূর্যও এই নক্ষত্রদের ভিড়ে থাকা একটি তারা। তাহলে ভাবো, আমাদের সূর্য কত বড়ো ?

পৃথিবী একটি বড়ো গোলক। এই গোলকের ওপর ভারত এবং আমেরিকা একে অপরের বিপরীত দিকে অবস্থিত, এটি আমরা জানি। ভারতের মুম্বাই থেকে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরের দূরত্ব প্রায় ১৩,০০০ কিমি। এর থেকে পৃথিবীর গোলকটি কত বড়, তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। এরকম ১৩ লক্ষ পৃথিবীকে যদি একসাথে করে একটি লাড্ডু তৈরী করা হয়, তাহলে তা আমাদের সূর্যের সমান বড়ো হবে! আকাশগঙ্গার অন্যান্য তারার তুলনায় আমাদের সূর্য খুবই ছোট এবং আবছা। আমাদের সূর্যের চেয়ে হাজার গুণ বড়ো এবং উজ্জ্বল লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র আকাশগঙ্গায় রয়েছে। সূর্যের মতো ছোট এবং উজ্জ্বল লক্ষ লক্ষ তারাও রয়েছে।

সম্পূর্ণ আকাশগঙ্গায় লক্ষ লক্ষ কোটি নক্ষত্র রয়েছে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় নক্ষত্রগুলি একে অপরের খুব কাছে আছে। কিন্তু বাস্তবে তারা একে অপরের থেকে অনেক কোটি কিমি দূরে অবস্থান করছে। সূর্য পৃথিবী থেকে প্রায় ১৪ কোটি কিমি দূরে রয়েছে। সূর্যের সবচেয়ে নিকটের দ্বিতীয় নক্ষত্রটি এর চেয়ে তিন লক্ষ গুণ বেশি দূরে।

⦿ কত বড়ো আমাদের আকাশগঙ্গা ? -

আমাদের আকাশগঙ্গা হলো লক্ষ লক্ষ কোটি তারা নিয়ে গঠিত জিলিপির মতো পেঁচানো আকৃতির একটি বিশাল পুঞ্জ, যাকে **'ছায়াপথ'** বলা হয়। বাস্তবে আকাশগঙ্গা নামটি দেওয়া হয়েছে মন্দাকিনী ছায়া পথটিকে। বিশাল সূর্য, তার চারপাশে নিজেদের কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান আটটি গ্রহ, তাদের উপগ্রহ, লক্ষ লক্ষ গ্রহাণু এবং অনেক ধূমকেতু এই সব কিছু নিয়ে গঠিত পরিবারকে বলা হয় **'সৌরজগৎ'**। আকাশগঙ্গার ছবির তুলনায় এই বিশাল সৌরজগৎকে একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র বিন্দু দিয়ে দেখাতে হয়। এই ছায়া পথে অনেক তারার চারপাশে তাদের গ্রহমণ্ডল রয়েছে। খুব বিশাল বিস্তার এই আকাশগঙ্গার। আলো এক সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে। এই গতিতে চললেও আকাশগঙ্গার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছাতে আলোর এক লক্ষ বছর সময় লাগবে। আমাদের আকাশগঙ্গার চেয়ে কিছুটা বড়ো এবং সবচেয়ে কাছের ছায়া পথটির নাম দেবযানী, যা প্রায় চার হাজার বছর আগে থেকেই মানুষের জানা। প্রতিটি ছায়াপথ এতটাই বিশাল। মহাকাশে এরকম লক্ষ লক্ষ ছায়াপথ ছড়িয়ে রয়েছে। তারা প্রতিনিয়ত একে অপরের থেকে দ্রুতগতিতে দূরে সরে যাচ্ছে। জানা এই সমস্ত ছায়াপথের এই বিশাল ছড়িয়ে থাকাকে **'জ্ঞাত মহাবিশ্ব'** বলা হয়, অর্থাৎ বর্তমানে মানুষের জানা মহাবিশ্ব। এর বাইরে কী আছে তা আমরা জানি না, তবে তা জানার প্রচেষ্টা ক্রমাগত চলছে।

আকাশে মেঘ না থাকে সেই রাতে আশেপাশের আলো নিভিয়ে বা অন্ধকার জায়গায় গিয়ে আকাশ দর্শন করলে দারুণ আনন্দ পাওয়া যায়। জমাট অন্ধকারের জন্য এই সময়ে অনেক নক্ষত্র দেখা যায়। সেই স্থান থেকে ওই নির্দিষ্ট দিনে আকাশে কী কী দেখা যেতে পারে, তার তথ্য বিভিন্ন মাসিক পত্রিকা বা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে পাওয়া যেতে পারে।

যদি দূরবীন উপলব্ধ থাকে, তবে কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্যে আকাশগঙ্গা, চাঁদের পৃষ্ঠের মাটি, বৃহস্পতির চাঁদ, শুক্র গ্রহের কলা ইত্যাদি দূরবীনের সাহায্যে দেখা যায়। দূরবীন না থাকলেও বিভিন্ন আকাশ পর্যবেক্ষণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আকাশগঙ্গা, বিভিন্ন নক্ষত্র, তাদের বৈশিষ্ট্য এবং নক্ষত্রমণ্ডল সম্পর্কে ভালো তথ্য পাওয়া যায়। এর জন্য বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে তথ্য নেওয়া ভালো।

এই ধরনের অনুষ্ঠানের সময় প্রথমে পশ্চিম দিকের গ্রহগুলি পর্যবেক্ষণ করা উচিত। কারণ সূর্যাস্তের পর সেই নক্ষত্র ও গ্রহগুলি দ্রুত অস্ত চলে যায় এবং পরে আর দেখা যায় না।

মহাকাশের গ্রহ এবং সেখানে ঘটিত বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে আরও তথ্য জানার জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালানো হয়। কোটি কোটি কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে সক্ষম এমন মহাকাশযান এবং সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করে পৃথিবীতে পাঠানোর মতো যন্ত্রপাতি তৈরী করা হয়। এর জন্য বড়ো বড়ো পরিকল্পনা করে অনেক বিজ্ঞানী একসঙ্গে মিলে চেষ্টা চালিয়ে যায়। এভাবে তৈরী করা যান মহাকাশে পাঠিয়ে তথ্য সংগ্রহ করার এই ধরনের প্রচেষ্টাকে **'মহাকাশ অভিযান'** বলা হয়।

ভারতের ইসরো (Indian Space Research Organization ISRO) হলো এমন একটি বিশ্ববিখ্যাত সংস্থা যা মহাকাশ অভিযান পরিচালনা করে। চাঁদের মাটিতে কোথায় কোন খনিজ রয়েছে তার মানচিত্র তৈরী করা এবং চাঁদে যে জল আছে এই আবিষ্কারটি প্রথম করা **চন্দ্রযান-১** এটা ২০০৮ সালের অভিযান, ২০১৪ সালের **মঙ্গলযান মিশন** এবং ২০২৩ সালের **চন্দ্রযান-৩** হলো ইসরোর অত্যন্ত বিখ্যাত কিছু মহাকাশ অভিযান। এরপরও আরও অনেক নতুন নতুন অভিযান শুরু রয়েছে।

⦿ ভারতের মহাকাশ অভিযান -

আদিত্য এল-১

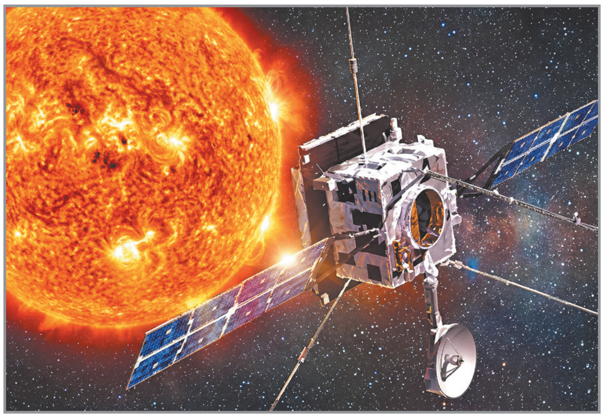

আদিত্য এল-১ হলো ভারতের ইসরো সংস্থা কর্তৃক সূর্যের ওপর গবেষণা করার জন্য পাঠানো একটি মহাকাশযান। ২রা সেপ্টেম্বর ২০২৩শে শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন মহাকাশ কেন্দ্র থেকে এই যানটি উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। এই যানটিকে পৃথিবী থেকে প্রায় ১৫ লক্ষ কিলোমিটার দূরে মহাকাশে স্থাপন করা হয়েছে। সেখান থেকে এই যানটি ক্রমাগত সূর্যের ওপর নজর রাখছে। সূর্যপৃষ্ঠের ঝড়, সেই সময় সেখান থেকে নির্গত হওয়া বিভিন্ন পদার্থ এবং সৌরশিখা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য যানের ভেতরের উপকরণগুলি ক্রমাগত আমাদের কাছে পাঠাচ্ছে।

নিসার

নিসার হলো নাসা এবং ইসরো এই দুটি মহাকাশ গবেষণা সংস্থার যৌথভাবে তৈরী করা একটি অত্যাধুনিক উপগ্রহ। এর উৎক্ষেপণ ৩০ জুলাই ২০২৫ তারিখে শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন মহাকাশ কেন্দ্র থেকে করা হয়েছে। এই উপগ্রহটি প্রতি ১২ দিনে পুরো পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণ করছে। এর মাধ্যমে পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্তন, ভূমিকম্পের কারণে ভূত্বকের পরিবর্তন, হিমবাহ গলে যাওয়ার গতি এবং বনাঞ্চল ইত্যাদি সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এই উপগ্রহটি অনেক সাহায্য করে।

সব সময় মনে রাখবে।

আকাশে ঘটিত বিভিন্ন ঘটনা, গ্রহ-নক্ষত্রের উদয়, অস্ত যাওয়া, তাদের অবস্থানের পরিবর্তন, ধূমকেতুর আগমন ইত্যাদি সবই প্রাকৃতিক ঘটনা। মানুষের জীবনে এগুলির কোনো প্রভাব পড়ে না। ধূমকেতু দেখা গেলে বিপদ নেমে আসে এবং উল্কা পড়তে দেখলে ভাগ্য খোলে এই ধরনের কোনো কুসংস্কার কেউ পুষে রাখবে না।

তোমরা জানো কী?

- *প্রায় দেড় হাজার বছর আগে যখন সবাই ভাবত যে পৃথিবী স্থির এবং চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্ররা পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে, সেই সময়ে ভারতীয় বিজ্ঞানী আর্যভট্ট প্রথম বিশ্বকে জানান যে সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে না বরং পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে।*
- *কোনো আধুনিক উপকরণ ছিলনা, তখন শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণ এবং গণিতের ওপর ভিত্তি করে জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট পৃথিবীর নিজের অক্ষের চারপাশে একবার ঘুরতে কত সময় লাগে তা বলে দিয়েছিলেন। আজকের অত্যন্ত আধুনিক উপকরণের সাহায্যে মাপা সময় এবং সেই সময়ে আর্যভট্টের বলা সময় হুবহু মিলে যায়। চাঁদের পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করার সময়ের ক্ষেত্রেও বিষয়টি একই রকম নির্ভুল। 'আর্যভট্টীয়' এই গ্রন্থে তিনি এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন।*
- *ভাস্করাচার্য (দ্বিতীয়) উজ্জয়িনীর মানমন্দিরের প্রধান ছিলেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ এবং চাঁদের কলা ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন।*

- **পরিচিতি বিজ্ঞানীদের**

ডা. বেণু বাপু (১৯২৭ – ১৯৮২)

বেণু বাপু নামের এই ভারতীয় ছাত্রটি বাড়িতেই নক্ষত্র থেকে আসা আলোর বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অনুপাত পরিমাপ করার জন্য স্পেক্ট্রোমিটার নামের একটি যন্ত্র তৈরী করেছিলেন। তিনি ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে একটি নতুন ধূমকেতু আবিষ্কার করেন। বেণু বাপুর নাম দেওয়া এই ধূমকেতুটি প্রতি ৬০ হাজার বছরে একবার আসে, তা তিনি গণিতের সাহায্যে প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন। ভারতের অত্যাধুনিক মানমন্দিরের সবচেয়ে বড়ো দূরবীক্ষণ যন্ত্রের নকশাও তিনি নিজেই তৈরী করেছিলেন। ১৯৫২ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট পদবী প্রদান করে। বেণু বাপু একাধিক দেশের সম্মিলিত জ্যোতির্বিজ্ঞান সংস্থার সভাপতিও ছিলেন।

ডা. জয়ন্ত নারলীকর (১৯৩৮ – ২০২৫)

ডা. জয়ন্ত নারলীকর ছিলেন একজন বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী। জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণার জন্য তিনি পুণেতে আয়ুকা নামের একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংস্থায় গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের নক্ষত্র, ছায়াপথ আবিষ্কৃত হয়েছে।

শিক্ষার্থী এবং সাধারণ মানুষের মনে জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ তৈরী করার জন্য তিনি অনেক চমৎকার ও আকর্ষণীয় বই লিখেছেন। কৌতূহলী ছাত্র-ছাত্রীদের মনে জেগে ওঠা বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর পাঠানোর একটি ধারাবাহিক উদ্যোগ তিনি বহু বছর ধরে সচল রেখেছিলেন।

জুন্নর তালুকার খোড়দ গ্রামের কাছে অবস্থিত মহাকায় মিটার তরঙ্গ রেডিও দুরবীন (GMRT)

জয়পুর জন্তর-মন্তর
প্রায় ৩০০ বছর আগে নির্মিত একটি মানমন্দির

হ্যানলে ইন্ডিয়া (লাদাখ মানমন্দির)
বিশ্বের সর্বোচ্চ উচ্চতায় অবস্থিত মানমন্দির

হাবল মহাকাশ দূরবীন

অত্যাধুনিক জেমস ওয়েব মহাকাশ দূরবীন
পৃথিবী থেকে প্রায় ১৫ লক্ষ কিলোমিটার
দূরে মহাকাশে অবস্থিত

আমরা কী শিখলাম ?

- সুদুর প্রাচীন কাল থেকেই মানুষের মনে গ্রহ, তারা এবং আকাশে ঘটিত নানা ঘটনার প্রতি বিস্ময় ও কৌতূহল রয়েছে। তখন থেকেই নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মানুষ জ্ঞান অর্জন করেছে।
- পৃথিবীর চারপাশে যে অংশ পর্যন্ত বাতাস রয়েছে তাকে আকাশ বলে। তার বাইরের সমস্ত শূন্যস্থানকে মহাকাশ বলে।
- বজ্রপাত, বিমান, মেঘ এগুলি বায়ুমণ্ডলে অর্থাৎ আকাশে ঘটিত ঘটনা ও বস্তু। চাঁদ, তারা, ধূমকেতু এগুলি তার চেয়ে ও অনেক দূরে মহাকাশে অবস্থান করে।
- যে সমস্ত তারকা সমূহের আকৃতি এবং বিন্যাস সব সময় একই রকম দেখায়, তাদের তারামণ্ডল বলা হয়।
- ধূমকেতু বরফ এবং ধূলিকণা দিয়ে তৈরি হয়। এগুলি একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে অনেক দূরে চলে যায়।
- আমাদের সূর্য একটি বিশাল ছায়াপথের অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি অংশ। এরকম কোটি কোটি ছায়াপথ মিলে মহাবিশ্ব তৈরী হয়েছে।
- মহাকাশ সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহের জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চলছে। ভারতের ইসরো সংস্থা মহাকাশ গবেষণার জন্য বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করছে।

অনুশীলনী

(১) চেনো এবং নাম লেখো।

(অ) আকাশগঙ্গার নিকটে থাকা ছায়াপথ ....

(আ) ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক ....

(ই) পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের তারা ....

(ঈ) পাথর, ধূলিকণা এবং জমাট বাঁধা বস্তু দিয়ে তৈরী জ্যোতিষ্ক ....

(২) সত্য বা মিথ্যা নির্ধারণ করো। মিথ্যা বাক্যগুলি সংশোধন করে লেখো।

(১) তারার নিজস্ব আলো থাকে না।

(২) ধ্রুবতারা দক্ষিণ আকাশে দেখা যায়।

(৩) মাঝে মাঝে উল্কা সম্পূর্ণভাবে না পুড়ে পৃথিবীর পৃষ্ঠে এসে পড়ে।

(৩) পারস্পরিক সম্পর্ক যুক্ত করো।

(অ) চন্দ্রযান ১:২০০৮:: মঙ্গলযান মিশন : ....

(আ) আদিত্য এল ১: সূর্যের অধ্যয়ন :: নিসার: ....

(৪) আকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য নীচের কোন কৃতিটি প্রয়োজনীয় ?

(১) আলো এবং দূষণমুক্ত স্থান নির্বাচন করা।

(২) আকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য দ্বিনেত্রী,দূরবীনের ব্যবহার করা।

(৩) পশ্চিম দিকের তারাগুলি থেকে আকাশ পর্যবেক্ষণ শুরু করা।

(৪) উপরের সবগুলি।

(৫) আকাশের বিভিন্ন মহাজাগতিক বস্তু এবং ঘটনা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে কোন কোন কুসংস্কার রয়েছে বলে তুমি মনে করো ? তালিকা তৈরী করো।

◉ উপক্রম -

(১) রাতের আকাশে ধ্রুবতারা কীভাবে খুঁজবে সেই তথ্য সংগ্রহ করো, তুমি নিজে ধ্রুবতারা খোঁজ করো।

(২) বৃষ্টি এবং চাষবাসের কিছু কাজ এবং নক্ষত্রমণ্ডলী সম্পর্কে আশেপাশের মানুষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করো, সেগুলি বন্ধুদের জানাও।

(৩) শিক্ষক এবং কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্যে তুমি দূরবীন তৈরী করতে পারো। কিছু কিছু জায়গায় শিক্ষার্থীদের জন্য দূরবীন তৈরীর কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এমন সুযোগের সদ্ব্যবহার করে দূরবীন তৈরী করা এবং সেটি ব্যবহার করে চাঁদ ও বৃহস্পতি গ্রহ পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করো।

(৪) চন্দ্রযান - ৩ ছিল ইসরোর অত্যন্ত বিখ্যাত এবং সফল একটি মহাকাশ অভিযান। চন্দ্রযান - ৩ মহাকাশযানের ছবি সংগ্রহ করে তার একটি প্রতিরূপ তৈরী করো।

৯ আহার থেকে স্বাস্থ্যের দিকে

অন্ন শরীরে লাগা - এই শব্দ কখনো শুনেছো কি ?

কোনো ব্যক্তি অসুস্থ নয়, তবুও সে সবসময় দুর্বল,ক্লান্ত থাকে। প্রতিদিনের খাবার ঠিকঠাকই খায়, কিন্তু খুব একটা খিদে পায় না। খেলাধুলা, কাজকর্মের জন্য কোনো উৎসাহ থাকে না। এমন অবস্থা যদি অনেকদিন ধরে চলতে থাকে, তখন বয়স্ক মানুষেরা বলেন, যা খাচ্ছে, সেই অন্ন ওর শরীরে লাগছে না।

এর বিপরীতে, যে ব্যক্তির শরীর বেশ সুগঠিত, হৃষ্টপুষ্ট এবং চঞ্চল। কাজকর্ম ও খেলাধুলার জন্য যার ভরপুর উৎসাহ ও শক্তি আছে, সহজে অসুস্থ হয় না - তেমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে কী বলা উচিত ? অন্ন তার শরীরে লাগছে !

বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম, চলাফেরা, খেলাধুলার জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। শরীরের ক্ষয় পূরণ করা, বৃদ্ধি পাওয়া এবং রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকা এই সবই অন্নের কারণে সম্ভব হয়। অন্নের কারণেই শরীর সুগঠিত থাকে। এর জন্য শরীরের নানাবিধ প্রয়োজন থাকে। আমাদের আহার যদি এমন হয় যা এই সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করতে পারে, তবেই বলা যায় 'অন্ন শরীরে লাগছে'।

শরীরের কী কী প্রয়োজন থাকে ? আহার বলতে কী বোঝায় ? খাদ্য উপাদান কী ? পুষ্টিকর আহার আসলে কেমন হয় ?

আমাদের রোজকার খাবারের কথা মনে করে দেখো। আমাদের প্রতিদিনের খাবারে কী কী পদার্থ থাকে ? জোয়ারী বা বাজরার ভাকরি, গমের রুটি, বিভিন্ন রকমের তরকারি, চাটনি, পিঠুলি এগুলিই আমাদের রোজকার খাবার। উৎসব-পার্বণ বা বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানের দিনে এতে কিছুটা ভিন্নতা থাকে।

কাশ্মীর বা বাংলা অঞ্চলের মানুষের খাবারও কি এটাই হবে ? ইডলি, দোসা, ভাত, সাম্বার এই খাবারগুলি দক্ষিণ ভারতে বেশি প্রচলিত। গম, মাখন, ঘি, আলু এগুলির ব্যবহার উত্তর ভারতে বেশি। এমনটা কেনো হয় বলো তো ?

বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়া, বৃষ্টির পরিমাণ এবং মাটির প্রকারে পার্থক্য থাকে। সেই কারণে সব জায়গার ফসল একরকম হয় না। যেখানে যে ফসল ফলে, সেখানে সেটির ব্যবহার বেশি হয়, এইজন্য উত্তর ভারতে গমের তৈরী খাবার বেশি থাকে। দক্ষিণ ভারতে জোয়ারী, গমের চাষ তেমন হয় না, সেখানে ধান চাষ বেশি হয়,তাই চালের ব্যবহার বেশি। মশলা ভাত, লেবু ভাত, পোলাও এই ধরনের ভাতের অনেক রকম পদ এবং ইডলি, দোসা-ই সেখানকার প্রধান খাবার। আশেপাশের পরিবেশের ফসল থেকে তৈরী খাবারই মানুষের নিত্যদিনের খাদ্য। সেটাই সেই অঞ্চলের মানুষের নিয়মিত আহার হয়, তাই একে **'আঞ্চলিক আহার'** বলা হয়।

ভেবে দেখো।

মহারাষ্ট্রের কোকণ অঞ্চলের আঞ্চলিক আহারে কোন কোন পদার্থের ব্যবহার বেশি হয় ?

আমরা শস্য বা ডালের মতো কৃষিজাত খাবারগুলি যেভাবে পাই, ঠিক সেভাবে সরাসরি খাই না। সেগুলির ওপর বিভিন্ন প্রক্রিয়া করে আলাদা আলাদা খাদ্যপদার্থ তৈরী করা হয়। প্রতিদিন একই খাবার খেতে ভালো লাগে না। আলাদা আলাদা ঋতুতে পাওয়া যায় এমন পদার্থ এবং মশলা ব্যবহার করে খাবারের স্বাদে পরিবর্তন আনা যায়, যার ফলে খাবারে বৈচিত্র্য আসে। ভাজা, সেদ্ধ করা, তেলে ভাজা এইসব বিভিন্ন পদ্ধতিতে খাবার তৈরী হওয়া খাবারের কারণেও অন্নে বিচিত্রতা আসে।

আমাদের দুপুরের বা রাতের খাবার এবং সকালের নাস্তায় ভাকরি, রুটি, তরকারি, ভাত, শিরা, উপমা, দোসা, পোহা, ইডলি, চা, কফি, শরবত, ঘোল ইত্যাদি খাবার থাকে। এগুলিকে আমরা খাদ্যপদার্থ বলি। এই তালিকার প্রতিটি খাবার যে রোজই খাওয়া হয়, এমনটা নয়। আমরা যা কিছু খাই, সেই সব খাদ্যপদার্থকে একত্রে **‘আহার’** বলা হয়।

আমাদের আহারে বিভিন্ন ঋতু অনুযায়ী খাদ্যপদার্থ

শীতকাল	গ্রীষ্মকাল	বর্ষাকাল
• তিল, গুড়, ডিঙ্কের লাড্ডু, ঘি • গাজর, বিট • আমিষ খাবার, ভাকরি(বাজরা) • মরশুমি ফল - কমলালেবু, পেয়ারা, মোসাম্বি, সবেদা ইত্যাদি।	• ঘোল, দই, লেবুর জল, আমের শরবত, আম্বিল, ডাবের জল • কোশিম্বির, ডাল-ভাত, ভাকরি • মরশুমি ফল - করমচা, কলা, আম, কাঁঠাল ইত্যাদি।	• হজমের জন্য হালকা ও গরম খাবার, ভাপে সেদ্ধ সবজি, চা, খিচুড়ি, ভাকরি • মরশুমি ফল- কালোজাম, আতা ইত্যাদি।

প্রত্যেক ঋতুতে আবহাওয়া বদলে যায় এবং সেই অনুযায়ী শরীরের খাবারের চাহিদাও পরিবর্তিত হয়। গ্রীষ্মকালে ঘোল, লেবুর জল, ডাবের জলের মতো তরল খাবার খেলে শরীরে জলের ঘাটতি হওয়ার ঝুঁকি কমে যায়। শীতকালে ঠান্ডা বাড়ে। এই সময়ে বাজরা, জোয়ারীর ভাকরি, তিল-গুড়, ডিম, আমিষ খাবার, মাখন, ঘি এই ধরনের শরীরকে উষ্ণতা দেওয়া খাবার খাওয়া ভালো। বর্ষাকালে আমাদের পরিপাক ক্ষমতা কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই এই সময়ে হালকা ও সেদ্ধ খাবার খেলে তা সহজেই হজম হয়।

ঋতু অনুযায়ী পাওয়া ফল এবং তাজা সবজি অত্যন্ত পুষ্টিকর হয়। আহারে এগুলি অন্তর্ভুক্ত করলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে এবং আমরা সুস্থ থাকি। আমলকী, আম সারা বছর সবসময় পাওয়া যায় না। নির্দিষ্ট ঋতুতে পাওয়া যায় এমন পদার্থ এবং ঋতুর একটি তালিকা তৈরী করো।

দাঁত ও হাড় শক্ত করার জন্য, কাজ করার জন্য, সুস্থ থাকার জন্য, শরীরের বৃদ্ধির জন্য কিছু বিশেষ পদার্থের প্রয়োজন হয়। শরীরের সমস্ত চাহিদা পূরণ করে এমন খাদ্যপদার্থকে **‘যোগ্য আহার’** বলা হয়।

❊ শরীরের খাদ্যবিষয়ক চাহিদা -

- শরীরকে শক্তি দেওয়া।
- শরীরের বৃদ্ধিতে সাহায্য করা।
- রোগজীবাণুর মোকাবিলা করা।
- শরীরকে সুস্থ রাখা।

⦿ দৈনন্দিন আহারে বৈচিত্র্য – বিভিন্ন খাদ্য পদার্থের তালিকা তৈরি করো। সেই তালিকায় অবশ্যই নানা রকমের অনেক খাবারের নাম থাকবে। তবে এই বৈচিত্র্য কিছু বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। সেই সেই অঞ্চলে উপলব্ধ শস্য, শাকসবজি, ফলমূল হলো সেখানকার অন্নপদার্থ। এগুলি থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার (পাকক্রিয়া) মাধ্যমে যা তৈরী হয়, তাকেই খাদ্যপদার্থ বলা হয়। এই খাদ্যপদার্থগুলি থেকে আমাদের শরীর যেসব দরকারী উপাদান পায়, সেগুলিকে **'পুষ্টি উপাদান'** বলা হয়। উপাদানগুলি একই হলেও, ভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করে আলাদা আলাদা স্বাদের বৈচিত্র্যময় খাদ্যপদার্থ তৈরী করা সম্ভব।

সুদুর অতীতে মানুষের জীবন বন্য পশুর মতো ছিল। যা পাওয়া যেত, তা যেমন আছে তেমনই কাঁচা খাওয়া তখনকার মানুষ কেবল এটুকুই জানত। আগুন তৈরী করা শেখার পর, মানুষ আগুন ও উনুন ব্যবহার করে খাবার পুড়িয়ে খাওয়া শুরু করল। জলে সেদ্ধ করা, ভাপে সেদ্ধ করা বা তেলে ভাজা এই পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে মানুষ ধীরে ধীরে জানতে পারল।

খাবার তৈরীর জন্য নানা রকমের পদ্ধতি এবং মশলা ব্যবহারে এলো। অন্যান্য অঞ্চলের খাবারের তথ্যও মানুষ পেতে শুরু করলো, যার ফলে নিত্যনতুন খাবার তৈরী হতে থাকল। বর্তমান যুগে মাইক্রোওয়েভ ওভেনে নামের বিদ্যুৎ চালিত ছোট চুল্লি, খাবারকে অতি ঠান্ডা করে জমিয়ে রাখার জন্য রেফ্রিজারেটরের ব্যবহার হচ্ছে। নতুন ধরনের খাবার তৈরীর জন্য প্রচুর প্রচেষ্টা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এর ফলে পাককলায় দারুণ অগ্রগতি হচ্ছে। খাবারের পুষ্টিগুণ নষ্ট না করে বিভিন্ন স্বাদের খাদ্যপদার্থ তৈরী করাই হলো একটি শিল্প। এই দক্ষতাকেই **'পাককলা'** বলা হয়।

⦿ খাদ্য সংস্কৃতির অতীত ও বর্তমান – কোনো অঞ্চলের মানুষের নিয়মিত আহারের খাবার, উৎসব-অনুষ্ঠানের খাবার এবং খাদ্যাভ্যাসের সামগ্রিক রূপকেই ওখানকার **'খাদ্য সংস্কৃতি'** বলা হয়। আশেপাশে উৎপাদিত শস্য ও পদার্থ ব্যবহার করে বাড়িতে খাবার তৈরী করা, পরিবারের সবাই মিলে একসঙ্গে তার আনন্দ নেওয়া এটিই ছিল আমাদের বহু প্রাচীন খাদ্য সংস্কৃতি। উৎসব, বিবাহ বা কোনো অনুষ্ঠানের ভোজের সময়ে তৈরী খাবার রোজকার খাবারের চেয়ে আলাদা হতো, কিন্তু তা বাড়িতেই তৈরী হতো এবং সবার জন্য একই রকম হতো। খাবার যাতে নষ্ট না হয়, সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখা হতো।

কিন্তু বর্তমানে অনেক জায়গায় পূর্বের এই ভালো বিষয় গুলির প্রতি অবহেলা করা হচ্ছে। খাবার বা ভোজের জন্য বাইরে থেকে খাবার অর্ডার করা হয়। সেই খাবার কে, কোথায়, কীভাবে তৈরী করেছে কিংবা ব্যবহৃত পদার্থগুলি ভালো মানের ছিল কি না তার কোনো তথ্যই আমাদের কাছে থাকে না। অনেক সময় এই ধরনের খাবার শরীরের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। প্রত্যেকে নিজে যতটা পারো ততোটা খাও এই ভাবনা থেকেই আজ ভিন্নভিন্ন পদ্ধতির অনেক খাদ্যপদার্থ ফুচকা, চাট এবং তার সাথে আইসক্রিমের মতো খাবারের ব্যবস্থা রাখা হয়। কিন্তু বাস্তবে এই পদ্ধতিতে প্রচুর খাবার নষ্ট হয় এবং টাকাও বেশি খরচ হয়। ছোটবেলা থেকেই পিৎজা, বার্গার এবং বিভিন্ন সসের মতো পুষ্টিহীন খাবারের প্রতি আকর্ষণ তৈরী হয়। এর ফলে ওজন বৃদ্ধি পাওয়া এবং অন্যান্য রোগ তখন থেকেই শুরু হয়ে যায়। এর ফলে শরীরের সঠিক বৃদ্ধি ঘটে না।

অনেক খাবারকে আকর্ষণীয় দেখানোর জন্য তাতে কৃত্রিম রঙ, রাসায়নিকের মতো অপ্রয়োজনীয় ও বিপজ্জনক উপাদান মেশানো হয়। দুধ এবং টক ফল অথবা দুধ এবং মাছের মতো খাবার একসঙ্গে খেলে শরীরে নানারকম সমস্যা দেখা দেয়। প্রাচীন পদ্ধতিতে এগুলি এড়িয়ে চলার ব্যাপারে সতর্ক থাকা হতো। কিন্তু বর্তমানের খাদ্যসংস্কৃতি ও পদ্ধতির কারণে অজান্তেই এমন কিছু পরস্পরবিরোধী খাবার আমাদের পেটে চলে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। যেমন - বিয়েবাড়ির ভোজে একসঙ্গে বাসুন্দি ও ফুচকা খাওয়া।

ভেবে দেখো।

প্রাচীন খাদ্য সংস্কৃতি এবং বর্তমানের খাদ্য সংস্কৃতির মধ্যে কী কী পার্থক্য আছে ?

জোয়ারী, গম, বাজরা, চাল এই শস্যগুলি আলাদা আলাদা। এগুলি থেকে তৈরী খাদ্যপদার্থও ভিন্ন। কিন্তু শরীরের ওপর এদের উপযোগিতা একই রকম। এই শস্যগুলিতে প্রচুর পরিমাণে যে শর্করা থাকে, তা শরীরে শক্তি উৎপাদনে উপযোগী হয়। এই শর্করা জাতীয় পদার্থকে কার্বোহাইড্রেট বলা হয়। বিভিন্ন ধরনের ডাল, শিমজাতীয় খাবার, ডিম ইত্যাদিতে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি থাকে। শরীরের ক্ষয় পূরণ এবং বৃদ্ধির জন্য প্রোটিনের প্রয়োজন হয়। **শরীরের বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই উপাদানগুলিকে 'পুষ্টি উপাদান' বলা হয়।**

শরীরের বৃদ্ধি, শক্তি এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য সব ধরনের পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজন হয়।

(১) **কার্বোহাইড্রেট** - শরীরে শক্তি জোগায়। ভাত, গম, জোয়ারী, বাজরার মতো খাদ্যপদার্থ থেকে এটি পাওয়া যায়।

(২) **প্রোটিন**- শরীরের বৃদ্ধি এবং মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয়। ডাল, শিমজাতীয় খাবার, দুধ, ডিম, সয়াবিন, মাংসের মধ্যে এটি পাওয়া যায়।

(৩) **মেদ/স্নেহ পদার্থ** - শক্তি উৎপন্ন করে এবং শরীরের স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয়। তেল, ঘি, মাখন থেকে এটি পাওয়া যায়।

(৪) **ভিটামিন** - ফল ও শাকসবজিতে প্রচুর পরিমাণে থাকে। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

(৫) **লবণ/খনিজ পদার্থ**- শরীরের প্রয়োজনীয় ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। লৌহ ও ক্যালসিয়াম জাতীয় খনিজ হাড় ও দাঁতকে মজবুত করে।

(৬) **জল** - খাবার হজমের পর অবশিষ্ট বর্জ্য ও ক্ষতিকারক পদার্থ শরীর থেকে বের করে দেওয়া, শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা, ত্বক সতেজ রাখা, শরীরের রক্ত প্রবাহ স্বাভাবিক রাখা এই সব কাজের জন্য জল অপরিহার্য।

ভেবে দেখো।

আমাদের শরীরে জল সরবরাহকারী খাদ্য উৎসগুলি কী কী ? শরীরে জলের পরিমাণ কমে গেলে কী হবে ?

⦿ তন্তুময় পদার্থ - শরীরে এগুলি সম্পূর্ণ হজম হয় না। কিন্তু পরিপাকতন্ত্রের স্বাস্থ্য রক্ষা এবং সহজে মলত্যাগের জন্য তন্তুময় পদার্থ গুরুত্বপূর্ণ। সবুজ শাকসবজি ও ফলে প্রচুর পরিমাণে তন্তুময় পদার্থ থাকে। সুস্থ শরীরের জন্য আহারে এদের অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

◉ ক্ষুদ্রশস্য – ক্ষুদ্রশস্য হলো ঘাস জাতীয় উদ্ভিদের এক ধরনের ছোট বীজ। জোয়ারী, বাজরা, রাগী, সামা এগুলি হলো কিছু ক্ষুদ্র শস্য। ক্ষুদ্রশস্যগুলি প্রায় ৭০০০ বছর ধরে মানুষের খাদ্যের অন্যতম প্রধান অংশ হয়ে রয়েছে। এই শস্যগুলি আমরা খুব সামান্য প্রক্রিয়া করেই খেতে পারি। ক্ষুদ্র শস্যের মধ্যে পুষ্টিকর প্রোটিন ও ভিটামিন থাকে। এছাড়া ডাল জাতীয় শস্যে খনিজ পদার্থ, শর্করা, লৌহ, ম্যাগনেসিয়াম এবং তন্তুময় পদার্থ থাকে।

ক্ষুদ্রশস্য	খাদ্যপদার্থ
জোয়ারী, বাজরা	ভাকরি, থালিপীঠ, উপমা, চাকলি, শেউ, পাঁপড়
রাগী	ভাকরি, বিস্কুট, পাঁপড়, পেজ, আম্বিল
রাজগিরা	চিক্কি, লাড্ডু, ক্ষীর, খই

ঋতু পরিবর্তন এবং আহার - ভারতীয় ঋষিদের দ্বারা প্রাচীন কালে রচিত **'বেদ'** নামক গ্রন্থগুলিকে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ বলে গণ্য করা হয়। তার মধ্যে 'ঋগ্বেদ' নামক গ্রন্থটি প্রায় ৩৫০০ বছর আগে লেখা হয়েছিল। প্রকৃতির এবং জীবনের নানা ঘটনার অত্যন্ত সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে চিন্তাভাবনা ও অনুমান এবং সেই অনুমানের সত্যতা যাচাই এই সমস্ত কিছু থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান বেদের মধ্যে লেখা রয়েছে। প্রকৃতিতে ঘটে চলা পরিবর্তন এবং আমাদের জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা ও তার জন্য কী ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, সেই সম্পর্কিত তথ্য ঋগ্বেদে দেওয়া আছে।

গ্রীষ্ম, শীত, বর্ষা এই ঋতুগুলি একের পর এক নিয়মিতভাবে আসে। এর মধ্যে প্রতিটি ঋতুতে পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা, বাতাসে বাষ্পের পরিমাণ, সূর্যালোকের তীব্রতা এবং দিনের ছোট-বড়ো হওয়া একরকম থাকে না। এগুলির মধ্যে অনবরত পরিবর্তন হতে থাকে। সেই পরিবর্তনের প্রভাব আমাদের শরীরের উপর কেমন পড়ে, তার তথ্য ঋগ্বেদে উল্লেখ রয়েছে।

একটি ঋতু শেষ হয়ে আরেকটি ঋতু শুরু হওয়ার এই পরিবর্তনটি ধীরে ধীরে ঘটে। এই পরিবর্তন হতে প্রায় পনেরো দিন সময় লাগে এবং এই সময়ে মানুষের পরিপাকতন্ত্র কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে, ত্বক শুষ্ক হয়ে যায় এই ধরনের প্রভাব দেখা দেয়। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কিছুটা কমে যায়। এর প্রভাব ঘুমের উপরও পড়ে। এই সমস্ত তথ্য এবং এই ধরনের পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্য আহারের পরিবর্তন, স্নানের আগে শরীরে তেল মালিশ করার গুরুত্ব এই সমস্ত কিছুর তথ্য ঋগ্বেদে রয়েছে। প্রকৃতিতে ঘটে চলা পরিবর্তন, আহার এবং দিনচর্যা এর মধ্যকার সম্পর্ককে **'প্রাকৃতিক ভারসাম্য'** বলা হয়।

দীপাবলির সময়ে অভ্যঙ্গ স্নান, সংক্রান্তি উৎসবের সময়ে তিল-গুড় খাওয়া এবং গুড়ি পাড়ওয়ার সময়ে নিম পাতা ও ফুলের ব্যবহারের স্বাস্থ্যগত গুরুত্ব, এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করো।

কখনও কখনও পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার না খাওয়ার ফলে অথবা ভুল ধরনের খাদ্যপদার্থ খাওয়ার কারণে শরীরে কিছু পুষ্টি উপাদানের অভাব দেখা দেয়। এর ফলে যে সমস্ত রোগ হয়, সেগুলিকে **'অভাবজনিত রোগ'** বলা হয়।

• জেনে নিই।

মহারাষ্ট্রের অধিকাংশ অঞ্চলে সমুদ্রের জল থেকে প্রাপ্ত লবণ ব্যবহার করা হয়। সমুদ্রের জল থেকে পাওয়া লবণে অনেক খনিজ উপাদান থাকে, যার মধ্যে অল্প পরিমাণে আয়োডিনও থাকে।

পাহাড়ি অঞ্চলের আদিবাসী মানুষ সেখানে শিলা থেকে প্রাপ্ত লবণ ব্যবহার করেন, যাকে খনিজ লবণ বলা হয়। এই লবণে আয়োডিনের অভাব থাকে। শরীরে প্রয়োজনীয় আয়োডিন না পাওয়ার কারণে ওই এলাকার অনেক মানুষের গলগণ্ড রোগ হয়। এর প্রতিকার হলো আয়োডিনযুক্ত লবণ খাওয়া।

সমুদ্রের লবণ

গলগণ্ড রোগ

• শৈশবে শরীরের বিকাশের সময় হাড়ের সুগঠনের জন্য **'ডি' ভিটামিনের** খুব প্রয়োজন হয়। এই 'ডি' ভিটামিন কিছু পরিমাণে দুধ থেকে পাওয়া যায়। সকালের মৃদু রোদ ত্বকে লাগলে এই ভিটামিন ত্বকের নীচের স্তরে তৈরী হয়। পূর্বে ছোট শিশুদের হাত-পায়ের হাড় বেঁকে যাওয়া, দুর্বল হয়ে যাওয়ার লক্ষণ দেখা যেত। এই রোগকে রিকেটস বলা হয়। তখন বয়স্করা কোনো ওষুধ উপচার না করে ছোট শিশুকে সকালের মৃদু রোদে রাখার পরামর্শ দিতেন। এভাবে কিছুদিনের মধ্যেই শিশুর হাত-পায়ের অবস্থার উন্নতি দেখা যেত।

• **'সি' ভিটামিনের** অভাবে ত্বক শুস্ক হয়ে যায়, মাড়ি থেকে রক্ত পড়ে। এগুলি 'স্কার্ভি' রোগের লক্ষণ। লেবু, কমলালেবু, আমলকী জাতীয় খাদ্যে 'সি' ভিটামিনের পরিমাণ বেশি থাকে। খাবারে এগুলির ব্যবহার বাড়ালে স্কার্ভি রোগ সেরে যেতে পারে।

• **'এ' ভিটামিনের** ঘাটতির কারণে কম আলোতে অস্পষ্ট দেখা যায়, যাকে 'রাতকানা' রোগ বলা হয়। কয়েক দিন খাদ্য তালিকায় গাজর, পালং শাক, টমেটো, বাঁধাকপি, পেঁপের মতো খাবার গ্রহণ করলে এই ঘাটতি পূরণ হয় এবং রাতকানা রোগ কমে যেতে পারে।

কিছু পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত রোগ, লক্ষণ এবং প্রতিরোধের উপায়

রোগের নাম	কারণ	লক্ষণ	আহারের মাধ্যমে প্রতিরোধের উপায়
রাতকানা	ভিটামিন 'এ' -এর অভাব	আলোতে দেখতে না পাওয়া, রাতকানা রোগ	দুধ, মাখন, ডিম, ডিমের কুসুম, আম, পেঁপে, গাজর ইত্যাদি খাওয়া।
বেরিবেরি	ভিটামিন 'বি' -এর অভাব	ক্লান্তি ও দুর্বলতা	দুধ, মটরশুঁটি, দানাশস্য, সবুজ শাকসবজি খাওয়া।
গলগণ্ড	আয়োডিনের অভাব	থাইরয়েড গ্রন্থি বড়ো হওয়া	রান্নায় আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহার করা।
স্কার্ভি	ভিটামিন 'সি'-এর অভাব	মাড়ি থেকে রক্ত পড়া	আপেল, কমলা, টমেটো, লেবু ইত্যাদি ফল খাওয়া।
রিকেটস	ভিটামিন 'ডি'-এর অভাব	হাড় দুর্বল হয়ে যাওয়া	দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা।
দুর্বল হাড়	ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অভাব	বারবার হাড় ভেঙে যাওয়া	দুধ, দুগ্ধজাত খাবার, ডিম, মাংস ও শাকসবজিতে সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া।
অ্যানিমিয়া, রক্তক্ষয়	লৌহের অভাব	খুব দ্রুত ক্লান্তি আসা, ফ্যাকাশে গোলাপী ও অসুস্থ দেখা যায়	কলা, পালং শাক, আঙুর, খেজুরের মতো ফল ও শাকসবজি খাওয়া।

আমরা কি খাদ্যের উপাদানগুলি চিনতে পারবো ? করে দেখো।

(১) শর্করা পরীক্ষা -

- একটি বড়ো প্লেটে আলু, রুটি বা ভাকরির ছোট টুকরো, ছোলা, চীনাবাদাম, মাখন, সামান্য দুধ এইধরনের কিছু নমুনা রাখো।
- প্রতিটি নমুনার ওপর দুই ফোঁটা আয়োডিন দ্রবণ দাও।

  যদি খাদ্যবস্তু শর্করা যুক্ত হয়, তবে সেটি নীল রঙের হয়ে যাবে। রঙ পরিবর্তন না হলে বুঝতে হবে সেই খাদ্যে শর্করা নেই। খাদ্যের মধ্যে শর্করা শনাক্ত করার জন্য এই সহজ পদ্ধতিটি খুব উপযোগী।

(২) মেদ পরীক্ষা - পাকোড়া, শেউ এর মতো চর্বিযুক্ত পদার্থ কিছুক্ষণ কাগজে মুড়িয়ে রাখলে কাগজটি তেলতেলে হয়ে যায়, এটি তোমরা দেখেছ।

খাদ্যবস্তুর একটি ছোট টুকরো নাও এবং শুকনো কাগজের ওপর চাপ দাও। যদি কাগজটি ভিজে যায়, তবে কিছুক্ষণ শুকাতে দাও। কয়েক মিনিট পর কাগজটি দেখো। কাগজের ওপর যদি স্বচ্ছ দাগ দেখা যায়, তবে সেই খাদ্যবস্তুতে মেদ আছে। যদি কাগজটি শুকনো থাকে, তবে সেই খাদ্যবস্তুতে মেদ নেই।

(৩) প্রোটিন পরীক্ষা - একটি টেস্টটিউবে খাদ্য নমুনার পেস্ট নাও। এই পেস্টে কয়েক ফোঁটা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (১০%) দ্রবণ মেশাও এবং তারপর কয়েক ফোঁটা কপার সালফেট (১%) দ্রবণ যোগ করো। মিশ্রণটি নাড়লে যদি গভীর বেগুনি বা নীল রঙ দেখা দেয়, তবে বুঝতে হবে সেই খাদ্যে প্রোটিন আছে। রঙ পরিবর্তন না হলে সেই খাদ্যবস্তুতে প্রোটিন নেই। টেস্ট টিউব না থাকলে, চা খাওয়ার প্লেট বা প্লাস্টিকের বাটি ব্যবহার করে এই কৃতিটি করো।

• **পরিচিতি বিজ্ঞানীদের -**

ডা. কোলুথুর গোপালন - ভারতীয় পুষ্টিবিজ্ঞানের জনক (১৯১৮ – ২০১৯)

ডা. কোলুথুর গোপালন ছিলেন ভারতের একজন বিশিষ্ট পুষ্টিবিজ্ঞানী। ডা. গোপালন পদ্মভূষণ এবং আরও অনেক আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। তিনি ভারতীয় খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টিগুণ এবং অপুষ্টি, ভিটামিনের অভাব ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলির উপর মৌলিক গবেষণা করেছিলেন। তিনি 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউট্রিশন' প্রতিষ্ঠা করেন, 'ভারতীয় খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টিগুণ' নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ বই লেখেন। তাঁর কাজের ফলেই ভারতে মধ্যাহ্ন ভোজন শুরু হয়।

• **পরিচিতি বিজ্ঞানীদের -**

ডা. কমলা সোহনি (১৯১২–১৯৯৮)

পুষ্টিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ডা. কমলা সোহনির নাম বিশ্ববিখ্যাত। জৈব রসায়ন বিজ্ঞান বিষয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জনকারী তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় মহিলা। ভারতীয় খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টি উপাদান এবং পুষ্টিগুণের উপর তিনি গভীরভাবে গবেষণা করেছিলেন। সেই গবেষণার ভিত্তিতে সোহনির লেখা 'আহারগাথা' বইটি বিখ্যাত। ভারতীয় খাদ্যদ্রব্যে প্রোটিন এবং ভিটামিন ছিল তাঁর পছন্দের বিষয়। তাজা নিরাতে (তালের রসে) প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি এবং লৌহ খনিজ থাকে। তাজা নিরা অপুষ্টিতে ভোগা শিশু এবং গর্ভবতী মহিলাদের জন্য অত্যন্ত উপযোগী ও পুষ্টিকর তিনি তা প্রমাণ করেছিলেন। বিশ্বখ্যাত কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের হপকিন্স ল্যাবরেটরিতে কাজ করার জন্য তিনি বিশেষ আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। মুম্বাইয়ের ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স-এর তিনি ছিলেন প্রথম মহিলা পরিচালক।

◉ **সুষম আহার** - সুষম আহার হলো এমন খাবার যা শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ, মেদ, জল এবং তন্তুময় পদার্থ **এই পুষ্টি উপাদানগুলি শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী সরবরাহ করে।**

➢ **সুষম পুষ্টির জন্য সঠিক রান্না –** রান্না করার সময় সঠিক সতর্কতা অবলম্বন করলে খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টিগুণ বজায় রাখতে সাহায্য হয়।

(১) শাকসবজি ধোয়ার পর কাটতে হবে। (২) আলু-খোসা সহ সেদ্ধ করতে হবে।

(৩) কাটা শাকসবজি প্রয়োজনীয় পরিমাণে জল দিয়ে চটপট রান্না করতে হবে, অতিরিক্ত জল ব্যবহার করবে না।

ক্ষেত থেকে থালা পর্যন্ত অন্নের এই যাত্রা কেমন ভাবে হয় ? অন্ন ক্ষেত থেকে গ্রাহকের কাছে পৌঁছায়। রান্নাঘরে বিভিন্ন পাককলার মাধ্যমে তা সুস্বাদু খাবারে রূপান্তরিত হয়। রান্না করলে খাবারের স্বাদ বাড়ে। শেষ পর্যন্ত খাবার থালায় পৌঁছায় এবং আমরা আনন্দের সঙ্গে খাই। এর পিছনে প্রত্যেক কৃষক, শ্রমিক, বিক্রেতা এবং রাঁধুনি এমন অনেকের কঠোর পরিশ্রম থাকে। তাই খাবারের মূল্য বোঝা এবং তাকে সম্মান জানানো প্রয়োজন।

আমরা কী শিখলাম ?

- অন্ন আমাদের কাজ করার জন্য, খেলাধুলার জন্য, পড়াশোনার জন্য এবং সুস্থ থাকার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও পুষ্টি দেয়। আমরা নিয়মিত যে খাবার ও পানীয় গ্রহণ করি তাকেই আহার বলে।
- নির্দিষ্ট অঞ্চলে উপলব্ধ ফসল ও আবহাওয়ার ওপর ভিত্তি করে যে খাবার তৈরী হয়, তাকে আঞ্চলিক আহার বলে।
- দৈনন্দিন আহারে বৈচিত্র্য কীভাবে আসে ? এক উপাদান থেকে অনেক খাদ্যদ্রব্য, ঋতু অনুযায়ী, প্রয়োজন অনুযায়ী, খাদ্যবস্তুর ব্যবহার অনুযায়ী, তৈরীর পদ্ধতি অনুযায়ী এবং দৈনন্দিন ও উৎসবের খাবার অনুযায়ী বৈচিত্র্য আসে।
- **পুষ্টি উপাদান** বলতে শরীরের বৃদ্ধি, শক্তির জন্য এবং সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান বোঝায়। কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, মেদ, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ, জল এবং তন্তুময় পদার্থ হলো প্রধান পুষ্টি উপাদান।
- সমস্ত পুষ্টি উপাদানে সমৃদ্ধ ক্ষুদ্র শস্যকে আহারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য।
- কখনও কখনও পর্যাপ্ত আহার না নিলে বা ভুল খাবার খেলে শরীরে কিছু পুষ্টি উপাদানের অভাব দেখা দেয়। এর ফলে যে রোগ হয়, তাকে **'অভাবজনিত রোগ'** বলে।
  (১) গলগণ্ড: আয়োডিনের অভাবের কারণে হয়। উপায় : আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহার করা।
  (২) রিকেটস : 'ডি' ভিটামিনের অভাবের কারণে হয়। উপায় : সকালের মৃদু রোদে বসা।
  (৩) স্কার্ভি : 'সি' ভিটামিনের অভাবের কারণে হয়। উপায় : লেবুজাতীয় ফল আহারে অন্তর্ভুক্ত করা।
  (৪) রাতকানা: 'এ' ভিটামিনের অভাবের কারণে হয়। উপায় : আহারে গাজর, পালং শাক, টমেটো, বাঁধাকপি, পেঁপে ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা।
- উপলব্ধ উপকরণ ব্যবহার করে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সুস্বাদু খাবার তৈরী করাকে পাককলা বলে।

অনুশীলনী

(১) শূন্যস্থান পূরণ করো।

(১) খাদ্যদ্রব্য থেকে আমাদের শরীরে প্রাপ্ত দরকারী উপাদানগুলিকে .... বলে।

(২) শর্করা পদার্থকে .... বলে।

(৩) শরীরে তৈরী হওয়া কিন্তু শরীরের প্রয়োজন নেই এমন পদার্থ শরীর থেকে বের করে দিতে .... সাহায্য করে।

(৪) শরীরের বৃদ্ধি ও মেরামতের জন্য .... প্রয়োজনীয়।

(৫) .... শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

(২) জোড়া মেলাও।

অ	ব	ক
(১) 'ডি' ভিটামিনের অভাব	(অ) রাতকানা	(আ) লেবুজাতীয় ফল আহারে অন্তর্ভুক্ত করা।
(২) 'সি' ভিটামিনের অভাব	(ব) রিকেটস	(ব) সকালের মৃদু রোদে বসা।
(৩) 'এ' ভিটামিনের অভাব	(ক) স্কার্ভি	(ক) গাজর, পেঁপে আহারে অন্তর্ভুক্ত করা।

(৩) তোমাকে একটি দ্রবণ দেওয়া হলো, সেটি আয়োডিনের দ্রবণ তুমি তা কীভাবে প্রমাণ করবে?

(৪) মিনা সব সময় নুডল্স, বিস্কুট এবং পাউরুটি খায়। সে শাকসবজি, ফল, দুধ একদমই পছন্দ করে না। তার প্রায়ই পেটে ব্যথা এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা হয়। তার আহারে কী কী পরিবর্তন করলে এই সমস্যা কম হবে?

(৫) আমি কে?

(অ) আমি শরীরকে রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি দিই
ফল ও সবজির মধ্যে আমি থাকি।

(আ) আমি পেট পরিষ্কার রাখি।
শাকসবজি ও ফলের খোসার মধ্যে আমি থাকি।

(ই) আমি শক্তির প্রধান উৎস।
রুটি, ভাত ও পোলাওয়ের মধ্যে আমাকে পাওয়া যায়।

(৬) আলু ব্যবহার করে কী কী খাবার তৈরী করা যায়? তার একটি তালিকা তৈরী করো।

(৭) কী হবে তা বলো।

(অ) খাবার বারবার গরম করলে।
(ব) ফলজাতীয় সবজির খোসা ছাড়িয়ে ব্যবহার করলে।
(ক) শাকসবজি আগে কেটে তারপর ধুয়ে নিলে।
(ড) সবজি অনেক বেশি সময় ধরে সেদ্ধ করলে।
(ই) সবজিতে সেদ্ধ করা জল দিলে।

উপক্রম -

(১) দোকানে বিভিন্ন তৈরী খাবারের প্যাকেট পাওয়া যায়। সেই প্যাকেটের ভেতরে থাকা উপাদান এবং তাদের পরিমাণ প্যাকেটের গায়ে ছাপা থাকে। যে কোনো দুটি খাবারের প্যাকেটের তথ্যের তুলনা করো এবং তার মধ্যে কোনটি বেশি পুষ্টিকর তা নির্ধারণ করো।

(২) ক্ষুদ্র শস্যের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করো।

(৩) বাড়ির বড়োদের সাহায্যে ক্ষুদ্র শস্য ব্যবহার করে **'আমার পুষ্টিকর লাড্ডু'** তৈরি করো এবং তা ক্লাসের প্রদর্শনীতে উপস্থাপন করো।

১০ চুম্বকের দুনিয়ায়

বিজ্ঞান প্রদর্শনী দেখে নিলু বাড়ির দিকে রওনা হলো। সেখানে দেখা অনেক প্রয়োগ এবং বিভিন্ন মজার বিষয় তার মনে পড়ছিল। তার মধ্যে খুব ভালো লাগা একটি মজার জিনিস সে নিজেও তৈরী করবে বলে ঠিক করল। কী ছিল সেই মজার বিষয় ?

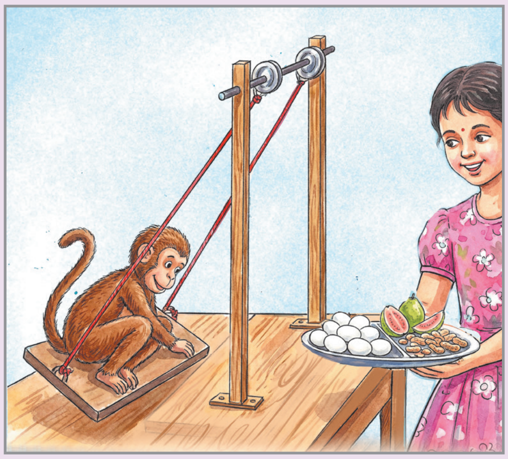

সেটি ছিল একটি ছোট দোলনা, তাতে তুলা দিয়ে তৈরী একটি বাঁদর বসে আছে। টেবিলের ওপর একটি প্লাস্টিকের থালা রাখা। থালার একদিকে আছে চিনাবাদাম ও পেয়ারা। অন্যদিকে রাখা দুটি ডিম। চিনাবাদাম বাঁদরের সামনে আসে এভাবে থালাটি ধরলে দোলনাটি সামনে থালার দিকে আসে। ডিমের দিকে থালা এগিয়ে নিলে দোলনাটি পিছিয়ে যায়, সেখানেই থেমে যায়। নিলু বহুবার এই খেলাটি করল। কেউ হাত না ছোঁয়ালেও বাঁদরটি থালার দিকে আসে এবং অপছন্দের বস্তু কাছে আনলে দূরে চলে যায়!‘এটা কী কারণে ঘটে ?’ নিলু সেই বস্তুটি দেখানো বন্ধুর কাছে জানতে চাইল। সে এতটুকুই উত্তর দিল, চুম্বকের কারণে।

তোমরা কি কখনো চুম্বক দেখেছ ? চুম্বকের কারণে কী হয় ?

মেলা এবং খেলনার দোকানে ছোটো নকশাদার করা চাকতি পাওয়া যায় । সেই চাকতি লোহার পৃষ্ঠতলে যেখানে ইচ্ছা লাগানো যায়, তার অবস্থান সহজেই পরিবর্তন করা যায়। এমন একটি চাকতি ভালো করে দেখো। তার পেছনের দিকে কালো রঙের মুদ্রার মতো চ্যাপ্টা একটি টুকরো লাগানো দেখতে পাবে। সেই টুকরোটি চাকতি থেকে আলাদা করলে, নকশা করা চাকতিটি আর লোহাতে আটকাবে না। মুদ্রার মতো সেই কালো টুকরোটি লোহাতে আটকে যায়। লোহার দিকে আকৃষ্ট হয় এমন বস্তুকে **চুম্বক** বলে।

পিন, ছোট পেরেক এবং লোহার গুঁড়োর মতো হালকা ছোট বস্তুগুলি চুম্বকের দিকে আকৃষ্ট হয়। লোহার বস্তু যদি খুব বড়ো বা ভারী হয়, তবে চুম্বক সেই বস্তুর দিকে আকৃষ্ট হয়।

এসো করে দেখি।

- খেলনায় ব্যবহার করা হয় এমন ছোট চুম্বক অথবা পরীক্ষাগারে থাকা বড়ো চুম্বক সংগ্রহ করো।
- বাড়ির বিভিন্ন বাসনপত্র, মুদ্রা, কাপ-প্লেট, সুশোভনের বস্তুর কাছে চুম্বক নিয়ে দেখো কী ঘটে, তা লিখে রাখো।
- বাড়ির বাইরে গিয়ে আশেপাশের যানবাহনের বিভিন্ন অংশ, শুকনো মাটি, বালুর কাছে চুম্বক নিয়ে দেখো।
- এই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে চুম্বকের প্রতি আকৃষ্ট হয় না এমন পদার্থের একটি তালিকা তৈরী করো, এদের অচৌম্বক পদার্থ বলা হয়। তাহলে, চুম্বকের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া পদার্থদের কী বলা হয় ?

লোহা দিয়ে তৈরী বস্তু এবং চুম্বকের মধ্যে আকর্ষণ থাকে। গাড়ির হেডলাইটের রিং, দরজার হ্যান্ডেল ইত্যাদির মতো চকচকে অংশ তৈরী করতে নিকেল নামক ধাতু ব্যবহৃত হয়। নিকেল এবং কোবাল্ট ধাতুও চুম্বকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অর্থাৎ **লোহা, নিকেল এবং কোবাল্ট হলো চৌম্বকীয় পদার্থ।**

ভেবে দেখো।

কোনো ক্ষেতের শুকনো কালো মাটি যদি চুম্বকে আটকে যায়, তবে তা থেকে কী বোঝা যায় ? মানুষের কাছে চুম্বকের পরিচয় কখন এবং কীভাবে হলো ?

লোহার দরজায় আটকে থাকা নকশা করা চাকতি বা কিছু খেলনা তৈরী করা ছাড়া চুম্বকের অন্যান্য ব্যবহার আছে কী ?

- বিদ্যুতে চলা জলের পাম্প তোমরা দেখেছ। ক্ষেত এবং শহরে জল সরবরাহের জন্য, কুয়া থেকে জল তোলার জন্য ছোটো-বড়ো পাম্প ব্যবহার করা হয়। এই পাম্পগুলি তৈরী করতে শক্তিশালী চুম্বকের প্রয়োজন হয়।
- বাড়ি ও কারখানায় বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী যন্ত্রগুলি চুম্বকের সাহায্যেই বিদ্যুৎ তৈরী করে। এই যন্ত্রগুলিকে **বৈদ্যুতিক জেনারেটর** বলা হয়।
- ব্যাংকে না গিয়েও নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে যখন ইচ্ছা টাকা তোলা যায়। এই ধরনের যন্ত্র অনেক জায়গায় থাকে, যাকে **এটিএম** বলা হয়। টাকা তোলার জন্য ব্যবহৃত কার্ডে গ্রাহকের তথ্য সম্পর্কিত একটি পাতলা চৌম্বকীয় ফিতা লাগানো থাকে।
- শরীরে কোনো ক্ষত তৈরী না করেই শরীরের ভেতরের রক্তনালী, পেশী ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্যকারিতা নিখুঁতভাবে পরীক্ষা (MRI) করার জন্য বড়ো হাসপাতালে যন্ত্র থাকে। এই যন্ত্রগুলি চুম্বকের সাহায্যেই কাজ করে।
- হেডফোন, টেপ রেকর্ডার, স্পিকারের মতো অনেক ইলেকট্রনিক উপকরণেও চুম্বক থাকে।

বিভিন্ন ব্যবহারের জন্য কম-বেশি শক্তিশালী এবং ভিন্ন-ভিন্ন আকৃতির চুম্বকের প্রয়োজন হয়। আধুনিক পদ্ধতি আবিষ্কারের আগে লোহার দণ্ড বা ইস্পাতের পাত চুম্বক হিসেবে ব্যবহার করা হতো। এই ধরনের চুম্বক পরীক্ষাগারে থাকে।

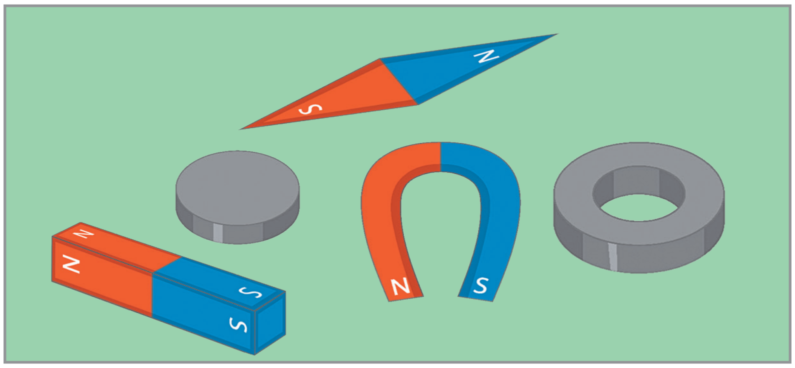

পরীক্ষাগারের চুম্বকের একটি প্রান্ত রঙিন বা একটি স্পষ্ট বিন্দু দিয়ে চিহ্নিত থাকে। এই চিহ্নটি বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য বোঝানোর জন্য দেওয়া থাকে।

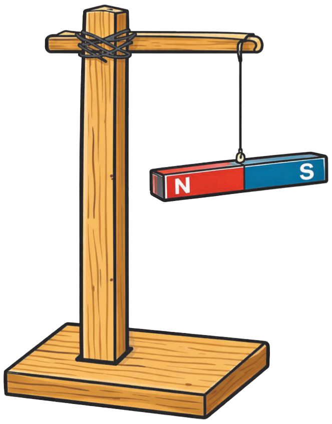

একটি লম্বা দণ্ড চুম্বক নাও। এর ঠিক মাঝখানে একটি সুতো এমনভাবে বাঁধো যাতে ঝোলালে চুম্বকটি সমান্তরালভাবে থাকে। একটি কাঠের স্ট্যান্ডে এই চুম্বকটি ঝুলিয়ে দাও। কিছুক্ষণ এটি ঘুরতে থাকবে, তারপর ধীরে ধীরে স্থির হবে। তার রঙিন বা চিহ্নিত প্রান্তটি ঘরের কোন দিকে আছে তা দেখো। এবার চুম্বকটিকে হালকা ধাক্কা দিয়ে অন্য দিকে সরিয়ে দাও। কিছুক্ষণ পর চুম্বকটি আবার স্থির হবে। এবার দেখো প্রান্তটি কোন দিকে আছে। এমনটি তিন-চারবার করে দেখো। এই পর্যবেক্ষণ থেকে কী বুঝলে ?

প্রতিবারই সেই প্রান্তটি একটি নির্দিষ্ট দিকে স্থির হয়। সেটি হলো উত্তর দিক। অর্থাৎ, সেই সময় চুম্বকের অন্য প্রান্তটি দক্ষিণ দিকে থাকবে। তাই বলা হয়, ঝুলন্ত চুম্বকটি সর্বদা উত্তর-দক্ষিণ বরাবর থাকে। উত্তর দিক নির্দেশকারী প্রান্তকে চুম্বকের উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ দিকে থাকা প্রান্তকে দক্ষিণ মেরু বলা হয়।

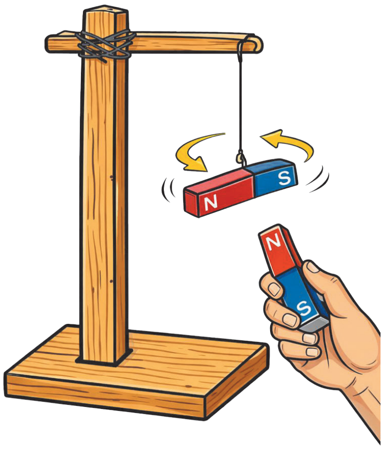

ঝুলন্ত অবস্থায় থাকা স্থির চুম্বকটিকে না ছুঁয়ে তার উত্তর-দক্ষিণ দিক পরিবর্তন করা কি সম্ভব ? অন্য একটি চুম্বক হাতে নাও। সেটি ঝুলন্ত চুম্বকের প্রান্তের কাছে কিছুটা দূরত্বে ধরো। হাতের চুম্বকটিকে ধীরে ধীরে একবার ডানদিকে এবং একবার বাঁদিকে নাও। তখন ঝুলন্ত চুম্বকের ওপর কী প্রভাব হয় ? এবার হাতের চুম্বকের অন্য প্রান্তটি ঝুলন্ত চুম্বকের কাছে এনে এই কৃতিটি পুনরায় করো। **উভয় পর্যবেক্ষণের মধ্যে কী পার্থক্য দেখলে ?**

চুম্বকের পরিবর্তে একটি বড়ো নাট-বোল্ট, লোহার টুকরো, তালা এইধরনের কোনো লোহার বস্তু ঝুলন্ত চুম্বকের কাছে নিয়ে যাও। এবার কী ঘটল ? কেনো ? চুম্বকের এই ধরনের পরীক্ষার জন্য কাঠের স্ট্যান্ড ব্যবহার করা হয় কেনো তা কি বুঝতে পারলে ? যা শিখলে তা ক্লাসে বন্ধুদের বলো।

এসো করে দেখি।

- কাগজের ওপর লোহার গুঁড়ো অথবা খুব ছোটো পেরেক ও পিন ছড়িয়ে রাখো।
- একটি দণ্ড চুম্বক আড়া আড়িভাবে ধরে কাগজের ওপর থাকা বস্তুগুলির কাছে নিয়ে যাও।
- চুম্বকটি উপরে তুলে দেখো, কোন অংশে সবচেয়ে বেশি বস্তু আকৃষ্ট হয়েছে।
- চৌম্বকীয় পদার্থকে আকর্ষণ করার শক্তি চুম্বকের কোন অংশে সবচেয়ে বেশি কেন্দ্রীভূত থাকে ?

তোমরা জানো কী ?

চুম্বকের আবিষ্কার কে, কখন করেছিল, তা কারো জানা নেই। আড়াই হাজার বছর আগের চীনা গ্রন্থে লোহাকে আকৃষ্ট করা, ঝুলিয়ে দিলে উত্তর-দক্ষিণ মুখে থাকা পাথরের কথা উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে অন্যান্য কিছু দেশের গ্রন্থেও এ ধরনের তথ্য পাওয়া যায়।

তুর্কিস্তানের রাখাল বালকদের একটি গল্প খুব বিখ্যাত। ছাগল-ভেড়া চরাতে রাখালরা পাহাড়ে যেত। ছাগল তাড়ানোর লাঠি যাতে দ্রুত ক্ষয় না হয়, সেজন্য লাঠির মাথায় লোহার টুপি পরানোর নিয়ম ছিল। তুর্কিস্তানের ম্যাগনেশিয়া নামক অঞ্চলে কিছু কিছু জায়গায় পাথর লোহার টুপির সাথে আটকে যেত। লম্বা পাথরগুলি ঝোলালে উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে থাকে এটা রাখালরা দেখল। এই রকমই সেই গল্পটি।

ইতিহাস গবেষকরা সুন্দর মসৃণ পালিশ করা, লম্বা দণ্ডাকৃতি পাথর খুঁজে পেয়েছেন। দিক নির্ণয়ের জন্য সাড়ে তিন হাজার বছর আগে এর ব্যবহার শুরু হয়। 'ম্যাগনেটাইট' নামক লোহার খনিজ অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। অনেক জায়গায় তা মাটির পৃষ্ঠের কাছে থাকে। সেখানে বজ্রপাত হলে ওই জায়গার খনিজ চুম্বকে পরিণত হয় বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। এই পাথরগুলিতে চুম্বকত্ব কম থাকে। এদের প্রাকৃতিক চুম্বক বলা হয়।

চুম্বক তৈরীর অনেক পদ্ধতি পরে আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মাধ্যমে আরও শক্তিশালী ও বড়ো চুম্বক তৈরী হতে লাগল। অনেক জায়গায় লোহা ও ইস্পাত দিয়ে তৈরী চুম্বক ব্যবহৃত হয়। অ্যালুমিনিয়াম, নিকেল ও কোবাল্টের মিশ্রণে খুব শক্তিশালী চুম্বক তৈরী হয়। এদের অ্যালনিকো চুম্বক বলা হয়।

কাপ-প্লেট তৈরীর কাজে ব্যবহৃত বিশেষ মাটি ও ধাতুর মিহি গুঁড়োর মিশ্রণ থেকে কারখানায় চুম্বক তৈরী করা হয়। এদের সিরামিক চুম্বক বলা হয়। বিভিন্ন আকারের এই চুম্বকগুলি সস্তা থাকে, তাই এগুলি শোভাবর্ধক চাকতি, খেলনায় ব্যবহার করা হয়। এই চুম্বকগুলি মানব সৃষ্ট অর্থাৎ কৃত্রিম চুম্বক বলা হয়।

সমুদ্র এবং মরুভূমির মধ্য দিয়ে ভ্রমণের সময় দিক চেনার জন্য হাজার-হাজার বছর ধরে চুম্বক ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এর জন্য দিগদর্শক যন্ত্র নামক একটি উপকরণ ব্যবহৃত হয়।

ভেবে দেখো।

কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই একটি ভিত্তির উপর সহজে ঘুরতে পারে এই রূপ সংযোজন করা সূচিচুম্বক অর্থাৎ দিকদর্শক যন্ত্র। এটি দিক নির্ণয়ের কাজে ব্যবহৃত হয়। তোমরা প্লাস্টিকের ছোট কৌটা ব্যবহার করে দিকদর্শক যন্ত্র তৈরী করেছো। রমেশ লোহার পাতের কৌটা ব্যবহার করেও একই রকম একটি যন্ত্র তৈরী করল। উভয়ের মধ্যে কোনটি বেশি নির্ভুল দিক নির্দেশ করবে ? কেনো ?

আমরা কী শিখলাম ?

- চুম্বকের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া পদার্থগুলিকে চৌম্বকীয় পদার্থ বলে। লোহা, কোবাল্ট, নিকেল হলো চৌম্বকীয় পদার্থ।
- চুম্বকের প্রতি আকৃষ্ট হয় না এমন পদার্থগুলিকে অচৌম্বকীয় পদার্থ বলে। উদাহরণস্বরূপ: কাঁচ, প্লাস্টিক, কাঠ ইত্যাদি।
- চুম্বকের যে অংশে আকর্ষণ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি থাকে, তাকে চুম্বকের মেরু বলে। একটি চুম্বকের দুটি মেরু থাকে উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরু। চুম্বক থেকে এই মেরুগুলিকে আলাদা করা যায় না।
- প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন আকারের কৃত্রিম চুম্বক তৈরী করা হয়।
- চুম্বকের সমজাতীয় মেরু একে অপরকে বিকর্ষণ করে। অর্থাৎ, চুম্বকের সমমেরুতে বিকর্ষণ এবং বিজাতীয় মেরুতে আকর্ষণ করে।
- বিভিন্ন ধরনের অনেক উপকরণে চুম্বকের ব্যবহার করা হয়।
- দিক নির্ণয়ের জন্য দিকদর্শক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। একটি ঝুলন্ত চুম্বক সবসময় উত্তর-দক্ষিণ বরাবর স্থির থাকে এই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করেই দিকদর্শক যন্ত্র কাজ করে।

অনুশীলনী

(১) চিন্তা করো এবং সঠিক বিকল্পটি বেছে নাও।

(১) নীচের কোন পদার্থটি চৌম্বকীয় পদার্থ ?

(অ) তামা (ব) লোহা (ক) অ্যালুমিনিয়াম (ড) রূপা

(২) দণ্ড চুম্বক লোহার গুঁড়োর কাছে নিয়ে গেলে, গুঁড়ো সবচেয়ে বেশি কোথায় আটকে থাকবে ?

(অ) মধ্যভাগে (ব) সব জায়গায় সমানভাবে

(ক) দুই প্রান্ত ও মধ্যভাগে (ড) প্রান্তগুলিতে

(৩) ঝুলন্ত চুম্বক .... দিকে স্থির থাকে।

(অ) উত্তর-দক্ষিণ (ব) পূর্ব-পশ্চিম (ক) পশ্চিম-দক্ষিণ (ড) উত্তর-পূর্ব

(৪) চুম্বকের নীচের কোন মেরুদ্বয়ের মধ্যে আকর্ষণ দেখা যাবে ?

(অ) N – S (ব) S – S (ক) N – N (ড) S – N

(১) শুধু ‘অ’ সঠিক (২) শুধু ‘ব’ সঠিক

(৩) ‘ব’ ও ‘ক’ সঠিক (৪) ‘অ’ ও ‘ড’ সঠিক

(৫) একটি দণ্ড চুম্বক কেটে এমন তিনটি টুকরো করা হলো। নীচের কোন অবস্থাটি সঠিক হবে ?

(অ)	N S	S N	S N
(ব)	N		N
(ক)	N S	N S	N S

(ড) উপরের কোনোটিই নয়।

(৬) একটি নাল চুম্বক লোহার গুঁড়োর ওপর দিয়ে ঘোরালে, কোন বিন্দুগুলিতে সবচেয়ে বেশি গুঁড়ো আটকে থাকবে ? কারণ লেখো।

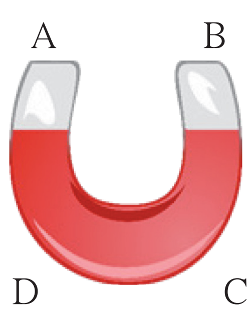

(অ) শুধু A (ব) শুধু B (ক) C ও D (ড) A ও B

(২) নীচের বাক্যগুলি সত্য বা মিথ্যা লেখো, মিথ্যা হলে বাক্যটি সংশোধন করে লেখো।

(১) স্টেইনলেস স্টিল একটি চৌম্বকীয় পদার্থ।

(২) ম্যাগনেটাইট একটি প্রাকৃতিক চুম্বক।

(৩) চেনোতো আমাকে, আমি চৌম্বকীয় না অচৌম্বকীয় ?

(৪) নীচের ছকটিতে কিছু বর্ণ দেওয়া আছে। কিছু বর্ণ একসাথে করলে চুম্বক সংক্রান্ত শব্দ পাওয়া যাবে। একটি শব্দে গোল চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে। অন্য শব্দগুলি খুঁজে বের করে খাতায় লেখো।

ক	স	শ	অ	না	ব্য	ক্ষ	অ	দ
ড	চু	প	চু	ম্ব	ক	সু	চি	ক্ষি
নি	কে	ল	ব	পী	কু	ড	তা	ণো
ফ	পো	ঝ	কী	র	উ	কো	না	ত্ত
আ	ক	র্ষ	ণ	বি	ত্ত	বা	হি	র
হ	পি	ঘ	ণ	বি	র	ল্ট	ফো	নী
লা	শু	ড	চ	জা	মে	ছ	ট	কে
ঘ	খ	বা	ড	তী	রু	লে	গ	ল
স	ম	জা	তী	য়	ভো	প	লা	জি

(৫) নীচের তথ্য উত্তরের জন্য ব্যবহার করতে হবে এই রূপ আধিকাধিক প্রশ্ন তৈরী করো।

চুম্বকের উত্তর ও দক্ষিণ এই দুটি মেরু থাকে। সমমেরু একে অপরকে বিকর্ষণ করে, আর বিষমমেরু একে অপরকে আকর্ষণ করে। চুম্বকের চারপাশে যে স্থানটুকু পর্যন্ত তার শক্তি অনুভূত হয়, তাকে চৌম্বক ক্ষেত্র বলে। লোহা, কোবাল্ট ও নিকেল ব্যবহার করে চুম্বক তৈরী করা যায়। চুম্বকের ব্যবহার দিক নির্ণয় করতে, মোটর ও জেনারেটর চালাতে, লাউডস্পিকার ও হেডফোনে শব্দ তৈরীতে, বৈদ্যুতিক উপকরণে, রেফ্রিজারেটরে করা হয়। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় চৌম্বকীয় ধাতুর বস্তুগুলি আবর্জনা থেকে আলাদা করতে চুম্বক ব্যবহার করা হয়। কম্পিউটারে তথ্য সংরক্ষণের জন্য চৌম্বকীয় ফিতা ব্যবহার করা হয়।

(৬) খেলনার এই গাড়িটি লোহার। চুম্বক ব্যবহার করে তুমি এটিকে কীভাবে গতিমান করবে ? পদ্ধতি লেখো এবং বাস্তবে করে দেখো।

(৭) বিশাল এক খোলা মাঠে রমেশ দিকদর্শক যন্ত্র নিয়ে গিয়েছিল। সেই যন্ত্রটি সঠিক উত্তর দিক দেখিয়েছিল। ওই একই যন্ত্র নিয়ে রমেশ একটি বড়ো ঘরে এল। সেই ঘরে দূরবর্তী এক কোণে একটি লোহার আলমারি ছিল। দিকদর্শক যন্ত্রটি কি সেই ঘরে সঠিক দিক নির্দেশ করবে ? বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নাও, করে দেখো।

(৮) তোমাকে একটি চুম্বক দেওয়া হয়েছে, তাতে মেরুর কোনো চিহ্ন নেই। অন্য একটি চুম্বকের সাহায্যে প্রথম চুম্বকটির মেরু কীভাবে চেনা যাবে ?

(৯) টেবিলের ওপর একটি লোহার পেরেক রাখো। একটি দণ্ডচুম্বক নিয়ে সেটিকে যথাক্রমে ৫০ সেমি, ৩০ সেমি, ১০ সেমি ও ৮ সেমি দূরত্ব পর্যন্ত ধীরে ধীরে পেরেকের কাছে নিয়ে এসো। পর্যবেক্ষণ করো কী ঘটে। এর থেকে চুম্বকের প্রভাব সম্পর্কে কী বলা যায় ?

উপক্রম -

(১) সিরামিক চুম্বক ব্যবহার করে নড়াচড়া করতে পারে এমন খেলনা তৈরী করো।

(২) দিক নির্ণয়ের জন্য নিজে দিকদর্শক যন্ত্র তৈরী করো।

১১ বল এবং চাপ

ছবির প্রত্যেকেই কোনো না কোনো কাজ করছে। সেই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় বলপ্রয়োগ করতে দেখা যাচ্ছে। কোনো বস্তুকে ধাক্কা দেওয়া, টানা, থামানো, ছোঁড়া, তোলা এবং চাপ দেওয়া ইত্যাদি কাজের জন্য আমরা শক্তি প্রয়োগ করি। স্কুল ব্যাগ তোলা, লাইটের বোতাম চাপা, জ্যামিতিক বক্স খোলা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, খেলাধুলা এই ধরনের কাজগুলি করার সময় আমাদের কম-বেশি শক্তি প্রয়োগ করতে হয়, এই প্রয়োগ করা শক্তিকেই **'বল'** বলা হয়। স্থির কোনো বস্তুতে বল প্রয়োগ করলে সেটি তার অবস্থান পরিবর্তন করে। কোনো বস্তু যদি ক্রমাগত অবস্থান পরিবর্তন করে, তবে তাকে **'গতিমান বস্তু'** বলা হয়। **স্থির বস্তুকে গতিবান করার জন্য বল প্রয়োগ করতে হয়। আবার গতিমান বস্তুকে স্থির করার জন্যও বলের প্রয়োজন হয়।**

বলের প্রকারভেদ -

⦿ পেশী বল -

বিভিন্ন কাজ করার সময়, খেলাধুলার সময়, কিংবা কৃষিকাজের সময় আমাদের শরীরের হাড় ও পেশীর সাহায্যে গতিবিধি ঘটে। **পেশীর সাহায্যে যে বল প্রয়োগ করা হয়, তাকে পেশী বল বলা হয়।** মানুষের মতোই প্রাণীরাও পেশী বল ব্যবহার করে।

⦿ যান্ত্রিক বল - **যন্ত্রের মাধ্যমে যে বল প্রয়োগ করা হয়, তাকে যান্ত্রিক বল বলা হয়।** কিছু যন্ত্রের সাহায্যে কাজ করার সময় ও পেশী বল ব্যবহার করতে হয়। তোমার বাড়িতে বিভিন্ন কাজ করার জন্য কোন কোন যন্ত্র রয়েছে? সেগুলির একটি তালিকা তৈরী করো।

উপরের সরঞ্জামগুলি কী কী কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়?

⦿ মহাকর্ষ বল-

সুতা কেটে যাওয়া ঘুড়ি, গাছের ফল বা হাত থেকে ছেড়ে দেওয়া বল সবসময় মাটির দিকেই পড়ে। রবার বা চকের টুকরো উপরের দিকে ছুড়ে দাও, সেগুলি পর্যবেক্ষণ করো? উপরের দিকে ছোড়া বস্তু সবসময় মাটির দিকে কেনো ফিরে আসে? পৃথিবী তার চারপাশের বস্তুকে নিজের কেন্দ্রের দিকে টেনে রাখে। যে বল এই কাজটি করে, তাকে পৃথিবীর **মহাকর্ষীয় বল** বলা হয়। এই বলের কারণেই উপরের দিকে ছোড়া বস্তুর গতি ধীরে ধীরে কমে যায় এবং বস্তুটি আবার নীচে নেমে আসে। এমনকি মাটিতে স্থির হয়ে থাকা বস্তুর ওপরও মহাকর্ষ বল থাকে।

তোমরা জানো কী ?

মহাকর্ষের কথা বললে অনেকেই আইজ্যাক নিউটনের নাম স্মরণ করে। কিন্তু নিউটনেরও ৬০০ বছর আগে, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ৯৫০ বছর আগে, ভারতীয় গণিতজ্ঞ ভাস্করাচার্য (দ্বিতীয়) সিদ্ধান্ত শিরোমণি নামক গ্রন্থটি লিখেছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি লিখেছিলেন যে পৃথিবী বস্তুকে নিজের দিকে টেনে রাখে। যদিও ভাস্করাচার্য মহাকর্ষ শব্দটি ব্যবহার করেননি, তবে সেই সময়েই তিনি এই আকর্ষণের বিষয়ে চিন্তা ও গবেষণা করেছিলেন।

আইজ্যাক নিউটন প্রায় ৩৫০ বছর আগেকার একজন মহান ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত এবং পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা গতি, মহাকর্ষসহ বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছিলেন।

⦿ চৌম্বকীয় বল -

টেবিলের ওপর কিছু পিন, পেরেক, পেন্সিল, পেন, রাবার, চাবি ইত্যাদি বস্তু রাখো। তার কাছে চুম্বক নিলে কোন বস্তুগুলি চুম্বকের দিকে আকৃষ্ট হয় ? লোহার বস্তুগুলি চুম্বকের দিকে আকৃষ্ট হতে দেখা যায়। এই বস্তুগুলিকে টেনে নেওয়ার জন্য বলের প্রয়োজন হবেই। এই বল চুম্বকই প্রয়োগ করে, অর্থাৎ **চুম্বক দ্বারা প্রয়োগ করা বলকে চৌম্বকীয় বল বলা হয়।** বিভিন্ন যন্ত্রপাতিতে চৌম্বকীয় বলের ব্যবহার করা হয়।

ভেবে দেখো।

রেফ্রিজারেটরের (ফ্রিজ) দরজা সামান্য বেশি বল প্রয়োগ করে টানলে তবেই খোলে, কিন্তু বন্ধ করলে আটকে যায় এবং শক্তভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এমনটা কেনো হয় ?

⦿ ঘর্ষণ বল -

কাঠের আসবাবপত্র মসৃণ করার জন্য এর পৃষ্ঠভাগ খসখসে রুক্ষ পুরু কাগজ দিয়ে ঘষা হয়। এর জন্য পলিশ পেপার বা স্যান্ডপেপার নামক কাগজ ব্যবহার করা হয়। স্যান্ডপেপারের দুটি টুকরো নাও এবং তাদের খসখসে পৃষ্ঠগুলি একে অপরের ওপর ঘষো। এবার মসৃণ কাগজের দুটি টুকরো নিয়ে সেগুলির পৃষ্ঠভাগ একে অপরের ওপর ঘষ। কোন কাগজের পৃষ্ঠভাগে ঘর্ষণ বেশি হয়েছে, তা বলো।

ঠেলে দেওয়া বল, মার্বেল বা ক্যারামের গুটিগুলির গতি ধীরে ধীরে কমে যায় এটা আমরা জানি। ক্যারামের গুটির চলাচলের সময় বোর্ডের পৃষ্ঠ এবং গুটির মধ্যে ঘর্ষণ সৃষ্টি হয়। তার ফলেই গুটির গতি কমে যায়। এই থেকে বোঝা যায় যে, ঘর্ষণ থেকে গতির বিরোধী বল তৈরী হয়। একেই **'ঘর্ষণ বল'** বলা হয়।

পেন্সিল দিয়ে কাগজে দাগ কাটা এবং রবার দিয়ে তা মুছে ফেলা এই দুটি ঘটনা ঘর্ষণের কারণেই ঘটে। সাইকেল, স্কুটার, বাসের মতো যানবাহনে ব্রেক থাকে। ব্রেকের সাহায্যে যানবাহনের গতি কম হয়। এটা আমাদের জন্য উপকারী নাকি ক্ষতিকর ?

তোমরা জানো কী ?

ঘর্ষণের ফলে দুর্ঘটনা

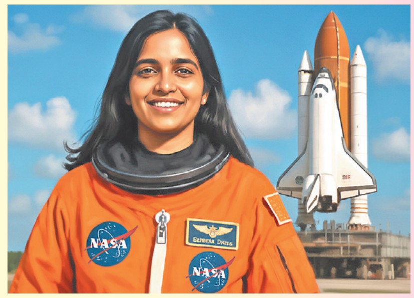

নাসা একটি বিশ্ববিখ্যাত মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। এই সংস্থাটি মহাকাশ অভিযানের জন্য বারবার ব্যবহারযোগ্য কলম্বিয়া নামক একটি মহাকাশযান তৈরী করেছিল। এটি অনেকবার সফলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ১৯৯৭ সালের শেষ দিকে, একটি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ, জীববিজ্ঞান এবং নতুন পদার্থের নির্মিতির পরীক্ষা এইরূপ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য ১৬ দিনের একটি মহাকাশ অভিযান এই যানটির মাধ্যমে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। এই অভিযানে সাতজন নভোচারী অংশ নিয়েছিলেন এবং এই সম্পূর্ণ অভিযানের প্রধান ছিলেন ডা. কল্পনা চাওলা।

১৬ জানুয়ারি ২০০৩-এ কলম্বিয়া আবার নতুন অভিযানের জন্য রওনা হয়। সাতজন নভোচারী ১৬ দিনে মহাকাশে ১০৬৭ লক্ষ কিমি পথ ভ্রমণ করেন। পৃথিবী থেকে অনেক উঁচুতে পৃথিবীকে ২৫২ বার প্রদক্ষিণ করে তারা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করেন। এই অভিযানে পুনরায় একটি বিভাগের প্রধান ছিলেন ডা. কল্পনা চাওলা।

অভিযানের নির্ধারিত কাজগুলি শেষ করে পৃথিবীতে ফিরে আসার যাত্রা শুরু হয়। মহাকাশ থেকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের দিনটি ছিল ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৩। প্রচণ্ড গতিতে মহাকাশযানটি বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই উল্কার মতো জ্বলে ওঠে ও ভস্মীভূত হয়ে যায়!

মহাকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে দ্রুত গতিতে আসা পাথরের টুকরোগুলি বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে এসে কয়েক মুহূর্তেই জ্বলে যায়। তাকেই আমরা উল্কাপাত বলি। উল্কা হোক বা মহাকাশযান, বায়ুমণ্ডলের বাতাসের সাথে ঘর্ষণের কারণেই এমন দহন হয়। ঘর্ষণের ফলে উৎপন্ন তাপ অত্যন্ত প্রচণ্ড! এর আগে অনেক অভিযান সফল হয়েছিল, কিন্তু এবার এই বিপর্যয় কেনো ঘটল ? উড্ডয়নের সময় যানটির তাপ-সুরক্ষাকারী কবচের একটি ছোট অংশ খসে পড়েছিল। এটি তুচ্ছ মনে হওয়া ত্রুটিরই এই ভয়াবহ পরিণাম!

ডা. কল্পনা চাওলা সহ আরও ছয় জন নভোচারী কলম্বিয়ার সাথেই প্রাণ হারান। এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল ঘর্ষণের কারণেই।

এসো করে দেখি।

একটি মার্বেল নাও। সেটি একটি মসৃণ পৃষ্ঠের ওপর রাখো এবং আলতো করে টোকা দাও। মার্বেলটি কতদূর গেল তা মেপে দেখো। এবার খসখসে মেঝের ওপর সেই মার্বেলটি রাখো এবং আগের মতোই আলতো করে টোকা দাও। খসখসে পৃষ্ঠে মার্বেলটি কতদূর গেল তা দেখো। মার্বেলটি একই, দুবারই মার্বেলটিকে ঠেলার জন্য প্রযুক্ত বলও সমান, তবুও দূরত্বের মধ্যে পার্থক্য কেনো দেখা গেল ?

খসখসে পৃষ্ঠে ঘর্ষণ বেশি হয় এবং মসৃণ পৃষ্ঠে ঘর্ষণ কম হয়। যন্ত্রের চাকা ঘোরার সময় ঘর্ষণ কমানোর জন্য লুব্রিকেন্ট, তেল, গ্রিজের মতো পদার্থ ব্যবহার করা হয়। ঘর্ষণ বল কমে যাওয়ার ফলে যন্ত্রের চাকার গতি বৃদ্ধি পায় এবং ক্ষয় ও কম হয়।

⦿ স্থির বিদ্যুৎ বল -

এসো করে দেখি।

কাগজের ছোটো ছোটো টুকরো করো এবং সেগুলি টেবিলের ওপর ছড়িয়ে রাখো। একটি প্লাস্টিকের চিরুনি বা জ্যামিতি বক্সের প্লাস্টিকের স্কেল শুকনো চুলে ঘষে কাগজের টুকরোগুলির কাছে নিয়ে যাও এবং পর্যবেক্ষণ করো। চিরুনির পরিবর্তে একটি ফোলানো বেলুন ব্যবহার করে কৃতিটি করো।

ঘর্ষণের ফলে কাঁচ, প্লাস্টিক, রবার, এবোনাইটের মতো কিছু পদার্থের ঘষা অংশে সাময়িকভাবে বৈদ্যুতিক আধান তৈরী হয়। এই আধান কিছু সময়ের জন্য সেই অংশে স্থায়ী হয়, এটি প্রবাহিত হয় না। এই বৈদ্যুতিক আধানের কারণেই কাগজের টুকরো বা সুতোর মতো হালকা বস্তুগুলি আকৃষ্ট হয়। বৈদ্যুতিক আধানের কারণে সৃষ্ট এই বলকে **'স্থির বিদ্যুৎ বল'** বলা হয়।

তোমরা জানো কী ?

বর্ষাকালে অনেক সময় নাইলন বা টেরিকোটের কাপড় পরার সময় বা খোলার সময় চটচট শব্দ শোনা যায়। কখনো কখনো ছোট নীল রঙের স্ফুলিঙ্গও দেখা যায়। এটি স্থির বিদ্যুৎ আধানের কারণেই ঘটে।

⦿ অসম বল – দড়ি টানাটানি খেলায় দুই পক্ষের দলই সমান বল প্রয়োগ করলে দড়ি কোনো দিকেই সরে না, এমনটা কখন হয় ? কোনো একটি দল কখন জেতে ? সেই সময়ে কি উভয় পক্ষের প্রযুক্ত বল সমান থাকে ?

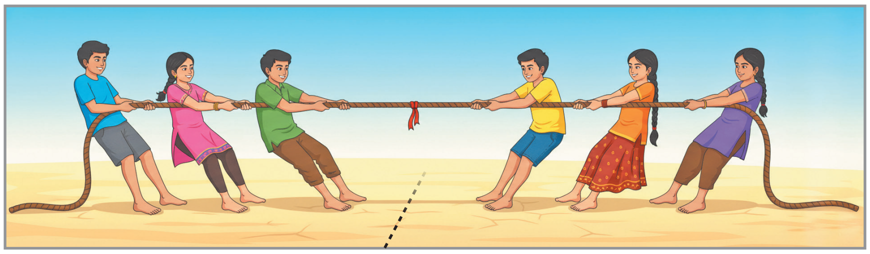

যখন বিপরীত দিক থেকে প্রয়োগ করা বলগুলি সমান হয় না, তখন যার বল বেশি, তার প্রভাবই দেখা যায়। এই অবস্থাকে **'অসম বল'** বলা হয়।

তোমার দেখা অসম বলের উদাহরণগুলি স্মরণ করো এবং তার একটি তালিকা তৈরী করো।

⦿ সুষম বল -

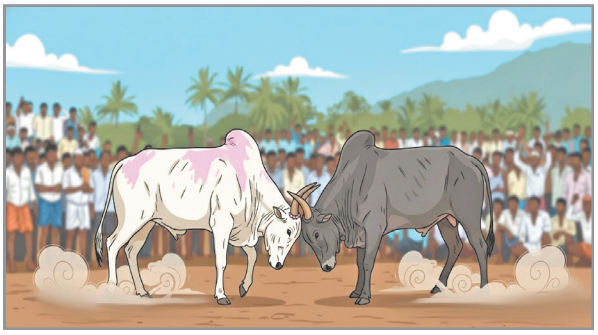

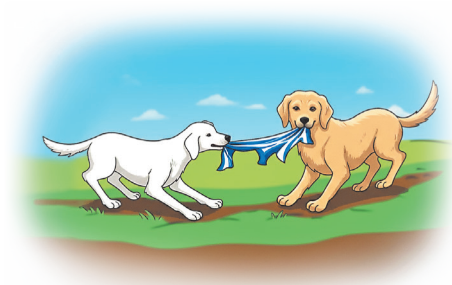

কুকুরের ছানা দুটি কাপড়ের একটি টুকরো বিপরীত দিকে টানছে। কখনও কাপড়ের টুকরোটি প্রথম ছানার দিকে যাবে, আবার কখনও দ্বিতীয় ছানার দিকে যাবে। মাঝে মাঝে তারা কাপড়ের ওপর বিপরীত দিক থেকে সমান বল প্রয়োগ করবে। এর ফলে বলগুলির সম্মিলিত প্রভাব শূন্য হয়ে যাবে। অর্থাৎ, সেই সময় কাপড়ের টুকরোটি স্থির অবস্থায় থাকবে। এই ধরনের বলকে **'সুষম বল'** বলা হয়।

পেরেকটির সুচালো অংশ কাঠের ওপর রেখে যদি হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা হয়, তবে প্রযুক্ত বলের প্রভাব খুব অল্প জায়গায় পড়ে। তখন পেরেকটি কাঠের ভিতরে সহজে ঢুকে যাবে। কিন্তু পেরেকটির মাথা কাঠের ওপর রেখে যদি হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা হয়, তবে কি পেরেকটি কাঠের ভেতরে ঢুকবে? পেরেকের মাথাটি চ্যাপ্টা হওয়ায় প্রযুক্ত বল অনেক বেশি জায়গার ওপর ছড়িয়ে পড়ে, তাই পেরেকটি সহজে কাঠের ভেতরে ঢোকে না। একক ক্ষেত্রফলের ওপর কতো বল প্রয়োগ করা হয়েছে তা গণনা দ্বারা নির্ণয় করা যায়। একক ক্ষেত্রফলের ওপর প্রযুক্ত বলকে **'চাপ'** বলা হয়। চাপ পরিমাপের জন্য নীচের সূত্রটি ব্যবহার করা হয়।

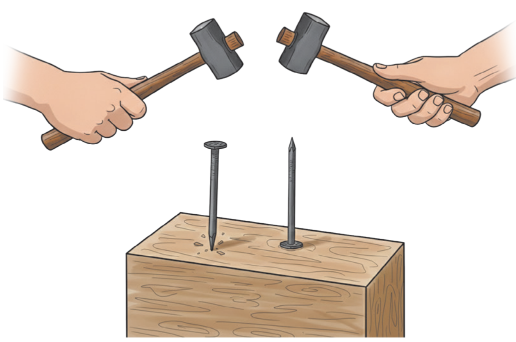

$$\text{চাপ} = \frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}}$$

বড়ো জলাধার, পাম্প, যানবাহনের টায়ারের ভেতরে থাকা বাতাসের চাপ পরিমাপ করা প্রয়োজন হয়। এর জন্য নিউটন/মিটার^2 একক ব্যবহার করা হয়। নিউটন হলো বল পরিমাপের একক এবং বর্গমিটার (m^2) হলো ক্ষেত্রফলের একক।

নিউটন/মিটার^2 এই এককটিকে পাস্কালও বলা হয়। বিজ্ঞানী নিউটন এবং পাস্কালের সম্মানে এই এককগুলির নামকরণ করা হয়েছে।

মেলার মধ্যে একজন শিল্পী কাছাকাছি থাকা অনেকগুলি সুচালো পেরেকের ওপর পা রেখে দাঁড়িয়ে থাকে, কখনও তাদের ওপর দিয়ে হাঁটে। তার পায়ে কি ওই সুচালো পেরেকগুলি ফুটে যায় না? পেরেকগুলি পায়ে না ফোটার কারণ কী হতে পারে? সেই শিল্পী কি বোর্ডের ওপর থাকা শুধুমাত্র একটি তীক্ষ্ণ পেরেকের ওপর পা রেখে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন?

এসো করে দেখি।

ভেজা মাটিতে একটি ইট সামান্য উচ্চতা থেকে ছবিতে দেখানো অনুযায়ী খাড়া এবং আড়া অবস্থায় আলাদাভাবে ফেলো। মাটির ভেতরে ইটের কতটা অংশ দেবে গেছে তা পর্যবেক্ষণ করো।

কোন অবস্থায় ফেলা ইটটি মাটির গভীরে বেশি গেছে? যে অবস্থায় ইটটি কম গভীরে গেছে, তখন তার মাটির সংস্পর্শে থাকা ক্ষেত্রফল কি বেশি না কম? চাপ ক্ষেত্রফলের ওপর নির্ভর করে। **ক্ষেত্রফল কম হলে চাপ বেশি হয়, আর ক্ষেত্রফল বেশি হলে চাপ কম হয়।**

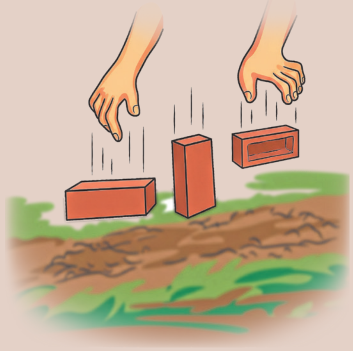

⦿ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ – পৃথিবীর চারপাশে সব দিক থেকে বাতাসের একটি আবরণ আছে। একে বায়ুমণ্ডল বলা হয়। এই বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর ওপর যে চাপ প্রয়োগ করে তাকে পরিমাপ করা যায়। যত উঁচুতে যাওয়া হয়, বায়ুমণ্ডল ততই বিরল হতে থাকে, তাই সেখানে বাতাসের চাপ কম হয়। দুটি স্থানের বায়ুমণ্ডলের চাপে পার্থক্য তৈরী হলে বেশি চাপের অঞ্চল থেকে কম চাপের অঞ্চলের দিকে বাতাস বইতে শুরু করে। বড়ো ঝড়ও এই কারণেই সৃষ্টি হয়।

স্ট্র দিয়ে জল পান করার সময় আমরা স্ট্র-এর ভেতরের বাতাস টেনে নিই। ফলে স্ট্র-এর ভেতরের বাতাসের চাপ কমে যায়। জলের ওপর থাকা বায়ুমণ্ডলীয় চাপ স্ট্র-এর ভেতরের চাপের চেয়ে কিছুটা বেশি হওয়ায় জল স্ট্র-এর নলের ভেতর দিয়ে ওপরের দিকে উঠে আসে।

এসো করে দেখি।

একটি পাতলা প্লাস্টিকের খালি বোতল নাও। সেটির ঢাকনা খুলে কিছুক্ষণ গরম জলে রাখো। এতে বোতলের ভেতরের বাতাস বেরিয়ে যাবে। এরপর বোতলের ঢাকনা শক্ত করে আটকে সেটি ঠান্ডা জলে রাখো। এখন বোতলটি পর্যবেক্ষণ করো। এমন কেনো ঘটলো তা নিয়ে আলোচনা করো।

আমরা কী শিখলাম ?

- কোনো বস্তুকে ধাক্কা দেওয়া বা টানার জন্য প্রয়োগ করা জোর হলো বল।
- পেশীর সাহায্যে যে বল প্রয়োগ করা হয়, তাকে পেশীবল বলে।
- যন্ত্রের মাধ্যমে যে বল প্রয়োগ করা হয়, তাকে যান্ত্রিক বল বলে।
- পৃথিবী তার চারপাশের বস্তুকে নিজের দিকে টেনে রাখে। এই বলকে মহাকর্ষ বল বলে।
- চুম্বকের মাধ্যমে যে বল প্রয়োগ করা হয়, তাকে চৌম্বকীয় বল বলে।
- ঘর্ষণ বল গতির বিরোধিতা করে। ঘর্ষণের ফলে বস্তুর গতি কমে যায়।
- ঘর্ষণের ফলে প্লাস্টিক, রবার, এবোনাইটের মতো পদার্থে বৈদ্যুতিক আধান তৈরী হয়। এই আধানের ফলে যে বল উৎপন্ন হয়, তাকে স্থির বিদ্যুৎ বল বলে।
- কোনো বস্তুর ওপর বিপরীত দিক থেকে প্রযুক্ত বল সমান হলে বস্তুটি স্থির থাকে। এই অবস্থাকে বলের সুষম স্থিতি বলা হয় এবং এই বলগুলিকে সুষম বল বলা হয়।
- যখন কোনো বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বলগুলি সমান হয় না, তখন তাকে অসম বল বলা হয়। তখন অধিক বলের প্রভাব দেখা যায়।
- একক ক্ষেত্রফলের ওপর প্রযুক্ত বল বা জোরকেই চাপ বলে।
- প্রযুক্ত বল সমান থাকলেও, ক্ষেত্রফল কম হলে চাপ বেশি হয় এবং ক্ষেত্রফল বেশি হলে চাপ কম হয়।
- বাতাসের কারণে যে চাপ সৃষ্টি হয়, তাকে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বলা হয়।
- দুটি স্থানের বায়ুমণ্ডলীয় চাপের পার্থক্য হলে বাতাস ও ঝড়ের সৃষ্টি হয়।

অনুশীলনী

(১) বলোতো, আমি কোন বল ?

(অ) সেলাই মেশিন, কুলার, গাড়ির মতো বিভিন্ন যন্ত্রে আমার ব্যবহার হয়।

(আ) ওপরের দিকে ছোড়া সব বস্তু আমার কারণেই পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হয়।

(ই) প্রতিটি খেলার গতিবিধি আমার মাধ্যমেই হয়।

(ঈ) কারখানার লোহার আবর্জনা তোলার জন্য আমার ব্যবহার করা হয়।

(২) সম্পর্ক স্থাপন করো।

(অ) ক্যারাম বোর্ডে টোকা দেওয়া → ঘর্ষণ বল

গাছ থেকে পড়ে যাওয়া ফল → ....

(আ) ক্ষেত্রফল বাড়লে → চাপ কমে যায়

ক্ষেত্রফল কমলে → ....

(৩) নীচের বিবৃতিগুলি সত্য নাকি মিথ্যা লেখো। মিথ্যা হলে তা সংশোধন করে লেখো।

(অ) পৃথিবীর মহাকর্ষ বলের কারণে অন্যান্য গ্রহ তাদের কক্ষপথে থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে।

(আ) সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে গেলে সেখানে বায়ুর চাপ বেড়ে যায়।

(ই) ঘর্ষণ বল কমলে যন্ত্রের চাকার গতি বেড়ে যায়।

(ঈ) চাপের একক হলো পাস্কাল।

(৪) সেলাই মেশিনে কাপড় সেলাই করার সময় কোন কোন বল কী কী কাজ করে, তার একটি তালিকা তৈরী করো।

(৫) প্রাণীদের পেশী বল ব্যবহার করে মানুষ তাদের দিয়ে কী কী কাজ করিয়ে নেয়, তা লেখো।

(৬) তোমার চারপাশের যান্ত্রিক বলের সাহায্যে করা কাজগুলি লেখো।

(৭) ছুরির ধারালো অংশ দিয়ে ফল সহজে কাটা যায়, কিন্তু ভোঁতা অংশ দিয়ে ফল সহজে কাটা যায় না। এমন কেনো হয়, তা স্পষ্ট করো।

(৮) সাইকেলের চেইনে লুব্রিকেন্ট, তেল বা গ্রিজ না লাগালে কী পরিণাম হবে ?

(৯) মসৃণ বা ভেজা মেঝেতে পা যাতে পিছলে না যায়, সেজন্য কী করা যেতে পারে তা বলো।

(১০) কিছুকাল ব্যবহারের পর গাড়ির টায়ার বা চটি জুতোর তলা ক্ষয় হয়ে যেতে দেখা যায়। এর কারণ কী হতে পারে ?

(১১) নীচের পরিস্থিতিগুলিতে কী হবে? তোমার অনুমান বলো।

এই ধরনের জুতো পরে বরফের ওপর হাঁটা।	ব্যাট দিয়ে সুচালো পাথরে আঘাত করা।
কাঁধে চওড়া বেল্টের ভারী ব্যাগ নেওয়া	কাঁধে সরু বেল্টের ভারী ব্যাগ নেওয়া

◉ উপক্রম –

ডা. কল্পনা চাওলার বিষয়ে আরও তথ্য এবং তাঁর মহাকাশ অভিযানের ছবি সংগ্রহ করো। শ্রেণীকক্ষে সেগুলির উপস্থাপনা করো।

১২ গতি ও গতির প্রকার

তোমরা ক্রিকেট খেলো, টিভিতে ক্রিকেট ম্যাচ দেখো। এই খেলায় বিভিন্ন খেলোয়াড় কী করে? প্রথমে বল বোলার-এর হাতে থাকে। তখন বলটি স্থির থাকে। বোলার দৌড়ে এসে বলটি ব্যাট সম্যানের দিকে ছুড়ে দেয়। এখানে বলের স্থান পরিবর্তিত হয়। ব্যাটসম্যান যখন ব্যাটে আঘাত করে, তখন বলটি অন্য দিকে যায়। আবারও বলের স্থান পরিবর্তিত হয়। মাঝে মাঝে বলটি মাঠের উইকেট-রক্ষকের হাতে যায়। সেখানে বলটি উইকেট-রক্ষকের হাতে গিয়ে স্থির হয়। অর্থাৎ বল যখন হাতে থাকে, তখন তা স্থির থাকে,অন্য সময়ে তার স্থানের পরিবর্তন হতে থাকে।

যখন বস্তুর অবস্থান পরিবর্তিত হতে থাকে, তখন সেই বস্তুকে গতিমান বলা হয়।

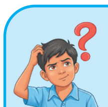

ভেবে দেখো।

তুমি ছুটিতে গ্রামে যাওয়ার জন্য রওনা হয়েছ। বাসে তোমার ব্যাগটি পায়ের কাছে রেখেছ। বাস গ্রামের দিকে রওনা দিল, তুমি বাসে আছ। পুরো যাত্রাপথে তোমার ব্যাগ এবং পাশের যাত্রী বাসের ভেতরে একই জায়গায় আছে। কিছুক্ষণ পর তুমি ব্যাগ সহ সাথে গ্রামে পৌঁছালে। এই যাত্রায় কোন কোন জিনিস গতিমান ছিল? কোন কোন জিনিস স্থির ছিল বলে তোমার মনে হয়? বাসের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে, রাস্তার ধারের গাছপালা, বাড়িঘর পেছনে সরে যেতে দেখা যায়। বলো তো, এই সময়ে কারা গতিমান?

তুমি এবং তোমার ব্যাগ উভয়ই বাসে ছিলে। ব্যাগটি বাসে যেখানে ছিল সেখানেই দেখা যাচ্ছিল। তাই তোমার মনে হবে যে ব্যাগটি তার অবস্থান পরিবর্তন করেনি, সেটি স্থির ছিল। বাসের বাইরে থেকে যে দেখছে তার কী মনে হবে ?

তোমার সাথে ব্যাগটি অন্য গ্রামে পৌঁছাল। অর্থাৎ, এটির অবস্থান পরিবর্তন হয়েছে। বাসটি গতিমান থাকায় ব্যাগটিও গতি পেয়েছে। কোনো বস্তু গতিমান কি না, তা পর্যবেক্ষণ কোথা থেকে এবং কীভাবে করা হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে। একই বস্তুকে একজনের কাছে গতিমান এবং অন্যজনের কাছে স্থির মনে হওয়া সম্ভব।

কোনো বস্তু গতিমান কি না তা নির্ধারণ করার জন্য এমন বস্তুর দিকে তাকাতে হয় যা তার অবস্থান পরিবর্তন করছে না। সেই স্থির বস্তুর স্থানকে **'নির্দেশক বিন্দু'** বলা হয়। কোনো বস্তু স্থির নাকি গতিমান তা নির্ধারণ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট নির্দেশক বিন্দুর প্রয়োজন হয়।

তোমাদের চারপাশের বস্তুগুলি পর্যবেক্ষণ করো। তার মধ্যে কোন বস্তুগুলি গতিমান তা নির্ধারণ করো। এর জন্য নির্দেশক বিন্দু কোনটি তা বল। কোন বস্তুগুলি স্থির তা তুমি কীভাবে নির্ধারণ করলে ?

ভেবে দেখো।

আমাদের চারপাশে গাছপালা, খুঁটি স্থির বলে মনে হয়। কিন্তু পৃথিবী প্রতিনিয়ত নিজের অক্ষের ওপর ঘুরছে। এটি সূর্যের চারপাশ দিয়েও অবিরাম ঘুরছে। এটি বোঝার পর, আমরা এবং পৃথিবীর সমস্ত বস্তু স্থির নাকি গতিমান তা নির্ধারণ করো।

◉ গতির প্রকারভেদ – গতিমান বস্তু ক্রমাগত তার অবস্থান পরিবর্তন করে। বস্তুর স্থান পরিবর্তন যদি ক্রমাগত একটি সরলরেখায় হতে থাকে, তবে সেই গতিকে **'সরলরৈখিক গতি'** বলা হয়। অনেক উচ্চতা থেকে সরাসরি নীচে ফেলা বস্তু, গাছ থেকে পড়া ফল সরলরেখায় গতিমান থাকে। অর্থাৎ, তাদের গতি সরলরৈখিক।

তোমাদের চারপাশে থাকা সরলরৈখিক গতির উদাহরণ বলো। রাস্তা দিয়ে চলা গাড়ি, রেললাইন দিয়ে চলা ট্রেনের গতি কি সর্বদা সরলরৈখিক হয় ?

গোফন, নাগরদোলার (মেরী গো রাউন্ড) সঞ্চালন বৃত্তাকার পথে হয়। এই গতিকে **'বৃত্তাকার গতি'** বলা হয়। তোমার আশেপাশে বৃত্তাকার গতি কোথায় কোথায় দেখা যায় তা পর্যবেক্ষণ করো এবং নোট করো।

ভেবে দেখো।

কখনও কখনও ঘরের মেঝেতে কোনো মিষ্টির টুকরো, মৃত পোকার আশেপাশে অনেক পিঁপড়ে জড়ো হয়। অনেক সময় সেগুলিকে তাড়ানোর জন্য সেখানে কিছু লবণ জল ঢেলে দেওয়া হয়। তখন সেই পিঁপড়েগুলি সব দিকে এলোমেলোভাবে দৌড়াতে শুরু করে। তাদের গতি কি সরলরৈখিক হয় ?

পর্যবেক্ষণ করো।

সেলাই মেশিনে কাপড় সেলাই করার সময় মেশিনের বিভিন্ন অংশের সঞ্চালন হতে থাকে। সেখানে কোন অংশে কী ধরনের গতি দেখা যায় ?

সেলাই মেশিনে কাপড় সেলাই করার সময় কাপড় ক্রমাগত সামনের দিকে এগিয়ে যায়। অর্থাৎ সেখানে কাপড়ের **সরলরৈখিক গতি** দেখা যায়। মেশিনের এক পাশে থাকা চাকার **গতি বৃত্তাকার** হয়। মেশিনের সুঁই ক্রমাগত ওপর-নিচ সঞ্চালন করে। মেশিনের যেখানে পা রাখা হয়, সেই প্যাডেলের ও বড়ো চাকা সংযুক্ত করা দণ্ডের সঞ্চালন ভালোভাবে দেখো। তার দুই প্রান্তে যে গতিবিধি হয় তা কি একই রকম ? প্যাডেলের সঞ্চালন ওপর-নিচ হতে দেখা যায়, কিন্তু বড়ো চাকার কাছাকাছি প্রান্তের গতিবিধি বৃত্তাকার হয়।

দোলনার সঞ্চালন কিছুটা অন্য ধরনের। এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, সেখান থেকে পেছনে, আবার সামনে এমন গতিবিধি হয়।

কোনো বস্তুর ওপর-নিচ বা সামনে-পেছনে ক্রমাগত হতে থাকা সঞ্চালনকে **'দোলন গতি'** বলা হয়। তম্বুরা, সেতার, বীণা এই বাদ্যযন্ত্রগুলিতে টানা তার থাকে। সেই তারগুলিতে আঘাত করলে সেগুলি কাঁপে। সেই গতিও 'দোলন গতি'।

বাগানের ফুলের চারপাশে উড়ন্ত প্রজাপতি নিশ্চয়ই দেখেছ। তারা ওড়ার সময় বিভিন্ন দিকে এলোমেলোভাবে উড়তে থাকে। তাদের গতি ক্রমাগত নির্দিষ্ট সরলরেখায় হয় না, আবার বৃত্তাকারও হয় না। এইভাবে বিভিন্ন দিকে গতিমান বস্তুর গতিকে **'যাদৃচ্ছিক গতি'** বলা হয়।

যাদৃচ্ছিক গতি , বৃত্তাকার গতি, দোলন গতি এগুলি কোনো সরলরেখায় থাকে না, অর্থাৎ এগুলি **'অরৈখিক গতি'**।

এসো করে দেখি।

একটি টেবিলের ওপর ধাতুর একটি পাতলা স্কেল এমনভাবে রাখো যাতে তার অর্ধেক অংশ টেবিলের ওপর এবং অর্ধেক অংশ টেবিলের বাইরে থাকে। টেবিলের ওপর থাকা স্কেলের অংশের ওপর স্কুলব্যাগ থেকে বই বা ইটের মতো ভারী কিছু রাখো। এবার টেবিলের বাইরে থাকা স্কেলের অংশে ওপর থেকে নীচের দিকে হালকা ধাক্কা দাও। কিছুক্ষণ স্কেলের সেই অংশের সঞ্চালন হতে থাকবে। স্কেলের এই গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করো। স্কেলের এই গতি কোন ধরনের তা নির্ধারণ করো।

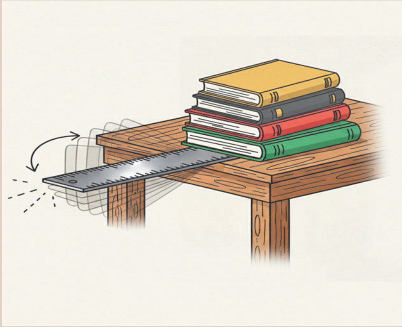

সাইকেল যখন গতিমান থাকে, তখন সাইকেলের চাকা, প্যাডেল এবং চেইনে কোন কোন ধরনের গতি দেখা যায় তা নির্ধারণ করো।

পর্যবেক্ষণ করো।

তোমার চারপাশের এমন উদাহরণ খোঁজ করো যেখানে একই সময়ে বিভিন্ন ধরনের গতি দেখা যায়।

আমরা কী শিখলাম ?

- যখন কোনো বস্তু নিজের অবস্থান পরিবর্তন করে, তখন বলা হয় যে বস্তুটি গতিমান।
- অবস্থান পরিবর্তন দেখার সময় পর্যবেক্ষকের অবস্থান এবং স্থির নির্দেশ বিন্দু গুরুত্বপূর্ণ।
- গাড়ির ভেতরে থাকা পর্যবেক্ষকের কাছে মনে হয় যে পাশের যাত্রী বা বস্তুর অবস্থান পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু গাড়ির বাইরের পর্যবেক্ষকের কাছে মনে হয় যে সেই বস্তুগুলির অবস্থান পরিবর্তন হচ্ছে।

গতির প্রকারভেদ
- সরলরৈখিক গতি
- অরৈখিক গতি
  - বৃত্তাকার গতি
  - দোলন গতি
  - যাদৃচ্ছিক গতি

- কিছু কিছু ঘটনায় একই সময়ে বিভিন্ন ধরনের গতি দেখা যায়।

অনুশীলনী

(১) নীচের গতিগুলিকে সরলরৈখিক গতি ও অরৈখিক গতি এইরূপ দুটি সমূহে ভাগ করো।

(১) আকাশ থেকে পড়া উল্কা।

(২) জমি দিয়ে এঁকেবেঁকে চলা সাপ।

(৩) মাটি থেকে আকাশের দিকে যাওয়া রকেট।

(৪) খো-খো খেলার সময় বসে থাকা খেলোয়াড়দের মাঝখান দিয়ে দৌড়ানো খেলোয়াড়।

(৫) স্লাইড বেয়ে নীচে নামা বন্ধু।

(৬) খেলোয়াড়দের কিছুটা দূরত্ব দৌড়ে এসে উঁচু লাফ দেওয়া।

(২) সত্য না মিথ্যা তা নির্ধারণ করো। মিথ্যা বাক্যগুলি সংশোধন করে লেখো।

(১) সরলরেখায় চলমান কোনো বস্তুর গতি দোলন গতি হয়।

(২) রাস্তায় চলমান সাইকেলের সব অংশের গতি সরলরৈখিক হয়।

(৩) মেলায় থাকা নাগরদোলার গতি সরলরৈখিক হয় ।

(৪) সার্কাসে উঁচুতে দড়ি-দোলনার খেলা শুরু ছিল, শেষে দড়ি ছেড়ে শিল্পীরা নীচে জালের দিকে লাফ দেয়। এই সম্পূর্ণ খেলায় শিল্পীদের গতি হলো দোলন গতি।

(৫) কাঠ বা দেওয়ালে ছিদ্র করার ড্রিল মেশিন শুরু হলে তাতে সরলরৈখিক ও বৃত্তাকার এই দুই ধরনের গতিই দেখা যায়।

(৩) এক বাক্যে উত্তর দাও।

(১) আমরা কখন বলি যে একটি বস্তু গতিমান ?

(২) সরলরৈখিক গতি ও অরৈখিক গতির মধ্যে মূল পার্থক্য কী ?

(৩) সোজা রাস্তায় দৌড়ানো ঘোড়ার ওপর বসা সওয়ারির গতি কোন ধরনের ?

(৪) কোন ধরনের গতির কারণে ঢোল বাজে ?

(৪) তুমি খেলার মাঠে গিয়েছো, সেখানে তোমার দেখা গতির প্রকারগুলি লেখো।

(১) আঁকা সরলরেখা ধরে একটি ছেলে দ্রুত হাঁটছে, তার হাতগুলি সামনে-পেছনে করছে।

(২) একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং সে তার কাঁধ থেকে হাত ঘোরাচ্ছে।

(৩) একটি ছেলে উঁচু লাফ দিচ্ছে।

(৪) দড়ি লাফ খেলছে এমন মেয়ের গতি এবং দড়ির গতি।

(৫) বাতাসে ওড়ার সময় পাখিদের মধ্যে কোন কোন ধরনের গতি দেখা যায় ?

(৬) চিত্রে প্রদর্শিত খেলায় সাইকেলের টায়ার এবং মেয়েটির মধ্যে কোন কোন ধরনের গতি দেখা যায়?

(৭) পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু গতিমান, এই উক্তিটি কি সঠিক?

(৮) ফ্যান চালু থাকলে ফ্যানের কোন কোন অংশে কী ধরনের গতি দেখা যায়?

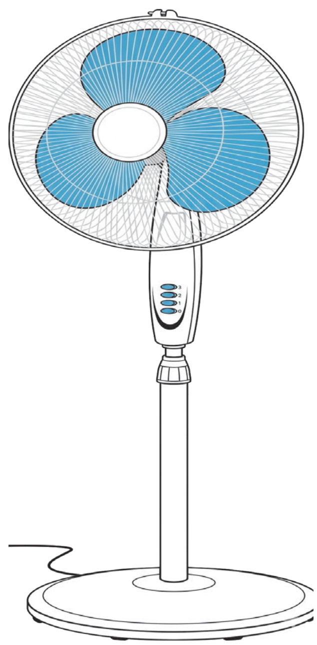

উপক্রম -

তোমার বাড়ির কাছের বাগানে যাও। সেখানে থাকা বিভিন্ন খেলনাগুলি দেখো। সেই খেলনাগুলিতে কোন কোন ধরনের গতি দেখা যায়, তার একটি তালিকা তৈরী করো।

১৩ প্রাকৃতিক সম্পদ

কর্ণাটক, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র এই রাজ্যগুলিতে প্রচুর লাল পাথরের পাহাড় রয়েছে। এই পাহাড়গুলির আশেপাশে বিশাল এলাকা জুড়ে লাল মাটি দেখা যায়। পাহাড়ের এই লাল পাথর থেকে তৈরী মাটি চাষাবাদের জন্য একেবারেই অনুর্বর। এই মাটিতে ফসল জন্মায় না। তাহলে এমন অনুর্বর মাটির কী উপযোগিতা ?

এই মাটি এবং পাথরের লাল রঙের কারণ হলো লোহার খনিজ। এই মাটি প্রক্রিয়া করে তা থেকে লোহা ও ইস্পাত সংগ্রহ করা যায়। দেশের সমস্ত ইস্পাত, কারখানার চাহিদা মেটানোর পরে ও আমাদের কাছে প্রচুর আকরিক লোহা অবশিষ্ট থাকে। বিশ্বের অনেক দেশ প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টন আকরিক লোহা ভারত থেকে কিনে নিয়ে যায় এবং তা থেকে ইস্পাত তৈরী করে। সেই দেশগুলিতে ইস্পাত তৈরীর বিশাল কারখানা আছে, কিন্তু আকরিক লোহা নেই। সেই কারখানাগুলি আমাদের দেওয়া খনিজের ওপরই চলে। এই ব্যবসার মাধ্যমে আমাদের দেশ প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা আয় করে। গত অনেক বছর ধরে এই ব্যবসা চলছে। আগামী একশ, দুশ বছর এভাবেই চলতে থাকবে, কারণ আমাদের দেশে এই খনিজের বিপুল ভাণ্ডার রয়েছে। কৃষির জন্য অনুর্বর এই মাটি প্রকৃতপক্ষে দেশের সম্পদ এবং সমৃদ্ধি।

কোকণ উপকূলীয় অঞ্চল, কোল্হাপুর, রত্নাগিরি এলাকাতেও বিভিন্ন ধরনের লাল পাথর এবং তা থেকে তৈরী মাটির বড়ো বড়ো পাহাড় রয়েছে। এই পাথর ও মাটিতে 'বক্সাইট' নামে একটি খনিজ থাকে। তা থেকে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু পাওয়া যায়। প্রতি বছর আমাদের দেশ লক্ষ লক্ষ টন বক্সাইট অন্যান্য দেশে রপ্তানি করে। বক্সাইটের বড়ো বড়ো পাহাড়ও দেশের সমৃদ্ধি ও সম্পদ। এইরূপ বিভিন্ন ধরনের মাটির বিশেষ গুণ, গুরুত্ব এবং ব্যবহার জানত না, তখন মানুষ এই মাটিকে খুবই তুচ্ছ এবং মূল্যহীন মনে করত। সেখান থেকেই 'মাটির দরে বিক্রি হওয়া,'ভালো জিনিস মাটি হওয়া-এর মতো বাগধারা এসেছে। কিন্তু এখন এই মাটিই মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

◉ মাটি – বিহার ও কেরালা অঞ্চলে পাওয়া চীনামাটি, সৌন্দর্য প্রসাধনী সামগ্রীতে ব্যবহৃত রাজস্থানের মুলতানি মাটি বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত হয়। টেরাকোটা মাটি থেকে শোভনের সামগ্রী ও মূর্তি তৈরী করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে মূল্যহীন মনে করা এই মাটির ভাণ্ডার যে দেশের সম্পদ, তা গত কয়েক বছরে মানুষ বুঝতে পেরেছে। এই সম্পদ মানুষের তৈরী নয়, **এটি প্রকৃতির দেওয়া উপহার।** তাই এই সম্পদকে **'প্রাকৃতিক সম্পদ'** বলা হয়। সম্পদ মানেই সম্পত্তি। ভালো ফসল উৎপাদনকারী কৃষি জমির কালো উর্বর মাটি, নদীর বন্যার সাথে আসা পলি মাটি থেকে তৈরী উর্বর মাটি এগুলিও প্রাকৃতিক সম্পদ।

সব জায়গার মাটি একরকম নয়, সেখানকার ফসলও একরকম হয় না, এটা আমরা সহজেই লক্ষ্য করতে পারি। কিছু ক্ষেতের মাটি লালচে, আবার কিছু জায়গার মাটি কালো। ধূসর সাদা মাটিযুক্ত অনেক ক্ষেতে মরিচ চাষ করা হয়, এটাকি তোমরা দেখেছ ? কালো উর্বর মাটিতে কোন কোন ফসল ভালো হয় ? তথ্য সংগ্রহ করো।

রঙ অনুযায়ী মাটিতে ভিন্নতা দেখা যায়, বিভিন্ন জায়গার মাটির স্পর্শেও পার্থক্য অনুভূত হয়। হাতের তালুতে অল্প মাটি নিয়ে আঙুল দিয়ে ঘষে দেখো। কিছু জায়গার মাটির স্পর্শ বালি বা রঙ্গোলির স্পর্শের মতো খসখসে, আবার পলি মাটি থেকে তৈরী মাটি ময়দার মতো নরম। একেই মাটির বুনট বলা হয়। মাটির মধ্যে থাকা বালুর মতো কণার আকার এবং পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে মাটি খুব খসখসে, মাঝারি খসখসে বা নরম এই ধরনের শ্রেণিবিন্যাস করা যায়। মাটির অন্যান্য ধর্ম ও ব্যবহার মাটির এই বুনটের ওপর নির্ভর করে। ইট তৈরীর জন্য ভালো মাটি দিয়ে কি মূর্তি তৈরী করা যাবে ? টেরাকোটা, চীনামাটি, খড়ি মাটি ব্যবহার করে নির্মিত কোন কোন জিনিস তোমরা দেখেছ ? মুলতানি মাটির রঙ কী এবং এটি কোন কাজে ব্যবহৃত হয় ?

কৃষি ও নির্মাণ কাজের জন্য মাটিতে আর্দ্রতা ধরে রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ। মাটিতে পচা পাতা, গোবর ইত্যাদির পরিমাণ এবং বালুর মতো কণার পরিমাণের ওপর নির্ভর করে মাটির জল ধরে রাখার ক্ষমতা। এই ক্ষমতাকেই মাটির **'জলধারণ ক্ষমতা'** বলা হয়।

ভেবে দেখো।

চা তৈরী করার পর যখন তা ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নেওয়া হয়, তখন ছাঁকনিতে কী অবশিষ্ট থাকে ? ছাঁকনিতে আটকে থাকা পদার্থের ওপর চামচ দিয়ে সামান্য চাপ দিলে কী হবে ?

এসো করে দেখি।

- তিনটি পরিমাপক পাত্র, তিনটি কাঁচের চোঙ, ফিল্টার পেপার এবং জল নেও।
- (অ) এঁটেল মাটি, (ব) দোআঁশ মাটি, (ক) বালি প্রত্যেকটি ১০ গ্রাম পরিমাণ নাও ।
- চিত্রে দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী কাঁচের চোঙে ফিল্টার পেপার বসাও।
- ফিল্টার পেপারের একটিতে (অ) এঁটেল মাটি, দ্বিতীয়টিতে (ব) দোআঁশ মাটি এবং তৃতীয়টিতে (ক) বালি রাখো।
- প্রতিটি চোঙে ২০ মিলি জল ঢালো এবং তার নীচে রাখা পরিমাপক পাত্রে কতটুকু জল জমা হয়েছে তা দেখো। (একসাথে তিনটি পাত্র না থাকলে, ক্রমান্বয়ে একটির পর একটির জন্য একই কৃতি করো এবং পর্যবেক্ষণগুলি নোট করো।)

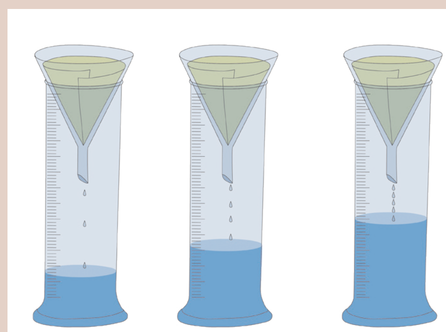

জমা হয়ের জল

এটি থেকে তোমরা কী সিদ্ধান্ত নিলে ?

মাটি ছাড়াও প্রকৃতি আমাদের আরও অনেক সম্পদ দিয়েছে। সেগুলির মধ্যে কিছু সম্পদের গুরুত্ব আমরা বুঝতে পারি না, যে কারণে সেগুলির অবিবেচক ও অত্যধিক ব্যবহার হচ্ছে। সেই সম্পদগুলি যে মূল্যবান, তা বোঝার জন্য আগে তাদের গুরুত্ব বুঝতে হবে। জল আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করি। সেটিও একটি সম্পদ, তা কি আমরা মনে করি ?

◉ জল – জলের ব্যবহারের কথা বললে সবার আগে মনে পড়ে পান করার জন্য, চাষাবাদের জন্য এবং পরিচ্ছন্নতার জন্য ব্যবহার। **জল কেবল তৃষ্ণা মেটানোর জন্য নয়, এটি জীবনের আধার।**

জল কোন কোন কাজে ব্যবহৃত হয়? স্নানের জন্য, রান্নার জন্য, বাগানের জন্য এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য এইরকম অনেকের জবাব থাকবে। আমরা বুঝতেও পারিনা যে এমন অনেক কিছু আছে যা তৈরী করতে প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়, তা কি আমরা কখনো ভেবে দেখেছি?

আক লাগানো থেকে নিয়ে এক কেজি চিনি তৈরী করতে কত লিটার জলের প্রয়োজন হতে পারে ভেবে দেখো। একটি চিনি কারখানায় প্রতিদিন টন টন চিনি তৈরী হয়, তার জন্য কী পরিমাণ জলের প্রয়োজন হয়? কাগজ তৈরীর জন্য কাঠের মণ্ডের ওপর প্রক্রিয়া করতে হয়, তার জন্য বিপুল পরিমাণ জলের প্রয়োজন হয়। এক কেজি কাগজ তৈরী করতে প্রায় ৩৪০ থেকে ৫০০ লিটার জলের প্রয়োজন। বিভিন্ন ওষুধ তৈরীর ক্ষেত্রেও জল অপরিহার্য। শিল্প-বানিজ্যের বস্তু এবং জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুর নির্মিতি জল ছাড়া সম্ভব নয়। এ কারণেই জল একটি অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ। বৃষ্টির জল, ভূগর্ভস্থ জল, ঝরনা, খাল, পুকুর, নদী, সমুদ্র এ সবই জলের উৎস।

সজীবদের শরীরের কোষের কাজ সঠিকভাবে চলার জন্য জলের প্রয়োজন। খাদ্য তৈরীর জন্য উদ্ভিদ জলের ব্যবহার করে। পরিপাক এবং শরীরে পুষ্টি পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রাণীদের জলের প্রয়োজন হয়। ঘামের মাধ্যমে শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত থাকে। শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থ বাইরে বের করে দেওয়ার জন্য জলের প্রয়োজন। সব সজীবদের জন্যই জল প্রয়োজন। পৃথিবীতে সমুদ্রে প্রচুর জল থাকলেও পানযোগ্য জল খুবই কম। কিছু জায়গার জলের উৎসে ক্ষার বেশি থাকে, আবার কোথাও কম থাকে। বৃষ্টির জলে খনিজ ও ক্ষার মিশ্রিত থাকে না। এই জল নদী, পুকুর ও বাঁধের মাধ্যমে জমা হয়। মাটিতে সঞ্চিত এই জলকে **'ভূপৃষ্ঠস্থ জল'** বলা হয়।

মাটিতে জমে থাকা জল চুইয়ে নীচে চলে যায়। এই জলই কুয়া ও নলকূপে পৌছায়। মাটির নীচে জমা এই জলকে **'ভূগর্ভস্থ জল'** বলে।

মাটির ভেতর দিয়ে চুইয়ে যাওয়ার সময় বিভিন্ন ধরনের ক্ষার জলে মিশ্রিত হয়। এ কারণে কিছু কুয়ার জল নোনা হয়। যদি জলে নির্দিষ্ট কিছু লবণ বেশি পরিমাণে থাকে, তবে সেই জলে সাবানের ফেনা তৈরী হয় না। তাই একে **'কঠিন জল'** (অর্থাৎ সাবানের ফেনা তৈরী না হওয়া জল) বলা হয়। এই জলে কাপড় পরিষ্কার হয় না। যে জলে সাবানের প্রচুর ফেনা হয়, তাকে **'মৃদু জল'** বলে।

জল সঠিকভাবে সঞ্চয় করা এবং উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা আমাদের দায়িত্ব। জল সংরক্ষণের জন্য বলা হয়, **"জল বাঁচাও - জীবন বাঁচাও।"** অনেক জায়গায় জলের সংকট থাকে। সেসব জায়গায় বহু আগে থেকেই নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে জল সঞ্চয় করা হয়।

তোমাদের এলাকার জলের উৎসগুলি সম্পর্কে তোমার জানা আছে কি? সেই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করো।

তোমরা জানো কী ?

প্রাচীনকালে জল সংরক্ষণের জন্য জলাধার ব্যবহার করা হতো। এই জলাধারগুলি চারপাশ থেকে পাথর দিয়ে বাঁধানো থাকত এবং এগুলির প্রশস্ততা ও গভীরতা ছিল অনেক বেশি। এমন জলাধারগুলি মূলত পুরনো দিনের বড়ো শহরগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়। এমন কিছু জলাধারের জল আজও ব্যবহার করা হয়। রাজস্থান ও গুজরাটে 'বাবড়ি' নামে পরিচিত, ধাপযুক্ত জলের কুয়ো রয়েছে। এগুলির দেওয়াল পাথরের তৈরী হওয়ায় সঞ্চিত জল দীর্ঘ দিন ভালো থাকে। জলের অভাব রয়েছে এমন অঞ্চলে এই ধরনের জল সঞ্চয় ব্যবস্থা অত্যন্ত উপযোগী ছিল।

রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং হলো বৃষ্টির জল সঞ্চয় করার একটি পদ্ধতি। একে 'পর্জন্য জলসংরক্ষণ'-ও বলা হয়। অট্টালিকার ছাদ, মাঠ থেকে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করে উপযুক্ত ট্যাংকে জমা করে রাখা হয়। কিছু জায়গায় এই জল ট্যাংকে জমা না করে এমন ব্যবস্থা করা হয় যাতে তা মাটির গভীরে চলে যায়। মাটিতে শোষিত এই জলের কারণে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর বৃদ্ধি পায়। এর ফলে আশেপাশের কুয়ো ও নলকূপগুলিতে জলের পরিমাণ বেড়ে যায়।

◉ সাগর সম্পত্তি – মাছ বিশ্বের অনেক মানুষের প্রধান খাদ্য। সমুদ্র থেকে প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যায়। তা ছাড়াও লবণ, অনেক ক্ষার, শঙ্খ-ঝিনুক, সামুদ্রিক উদ্ভিদ পাওয়া যায়। সমুদ্রত লদেশের পলি থেকে মূল্যবান ধাতুও পাওয়া যায়। কিছু জায়গার সমুদ্র সৈকতের বালিতে বিশেষ ধরনের পদার্থ থাকে, যা বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহার করা হয়। এই সমস্ত সামুদ্রিক সম্পদই হলো প্রাকৃতিক সম্পদ। নির্মাণকাজের জন্য, খনিজের জন্য ও ধাতু সংগ্রহের জন্য সমুদ্রের তলদেশের পলি বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়। ভারতের কেরল, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং ওড়িশার উপকূলীয় বালিতে মূল্যবান খনিজের ভাণ্ডার রয়েছে।

এগুলিও সাগর সম্পত্তি

সমুদ্রের তলদেশে এবং মাটির নীচে খুব গভীরে কিছু জায়গায় খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডার থাকে। বিভিন্ন যন্ত্র ব্যবহার করে এই তেল ও গ্যাস আহরণ করা হয়। এগুলি থেকে জ্বালানি পাওয়া যায়। অর্থাৎ, এই তেলের ভাণ্ডার এবং গ্যাসের ভাণ্ডারও প্রাকৃতিক সম্পদ।

সাগর সম্পত্তি

অ. ক্র.	সামুদ্রিক সম্পত্তির প্রকার	সম্পদ	উপযোগিতা/বৈশিষ্ট্য
১	সামুদ্রিক জীবসম্পদ	মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া, শঙ্খ	খাদ্য, ব্যবসা ও পুষ্টির প্রধান উৎস
২	খনিজ	সমুদ্রতলস্থ তামা, লোহা, ম্যাগনেসিয়াম	কারখানা ও শিল্পের জন্য উপযোগী
৩	তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস	সমুদ্রতলস্থ জ্বালানির উৎস	শক্তি উৎপাদন ও পরিবহন
৪	জলজ উদ্ভিদ	সামুদ্রিক শৈবাল, আয়োডিন	ঔষদনির্মাণ, প্রসাধনী এবং খাদ্যদ্রব্য তৈরীতে ব্যবহার
৫	উপযোগী পদার্থ	লবণ ও অন্যান্য কিছু ক্ষার	খাদ্যদ্রব্য ও দৈনন্দিন ব্যবহার

তোমরা জানো কী ?

বিশ্বে এমন অনেক দেশ আছে যেখানে পরিষ্কার নীল আকাশ এবং সূর্যালোকিত দিন খুব কমই পাওয়া যায়। যে দিনে এমন রোদ ওঠে, সেখানকার মানুষ সেই দিনটিকে 'সানি ডে' বা সূর্যালোকে উজ্জ্বল দিন বলে। সেদিন তারা দৈনন্দিন কাজ থামিয়ে সমুদ্রসৈকতে বা খোলা মাঠে ভিড় করে। শরীরে যেন সূর্যালোক লাগে এই জন্য বেশির ভাগ লোক চেষ্টা করে। আমাদের অঞ্চলে পর্যাপ্ত সূর্যালোক পাওয়া যায়। শরীরে রোদ লাগলে তাপ ও ভিটামিন 'ডি' পাওয়া যায়। ভারতের আবহাওয়া গরম। দীর্ঘ সময় ধরে পর্যাপ্ত সূর্যালোক পাওয়ার কারণে আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের ফসল ও উদ্ভিদ খুব ভালো জন্মায়।

সূর্যালোক : প্রকৃতির দান

সারা বছর প্রচুর সূর্যালোক হলো প্রকৃতির দেওয়া এক উপহার। এটিও একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। সূর্য থেকে প্রাপ্ত শক্তিকে **'সৌরশক্তি'** বলা হয়। ক্ষেতে উৎপাদিত শস্য ও ধোয়া কাপড় শুকানো, লবণ চাষে লবণ তৈরী এসব কাজে সূর্যের তাপ ব্যবহার অনেক আগে থেকেই হয়ে আসছে। বিগত কয়েক বছর ধরে সূর্যালোকের সাহায্যে অনেক জায়গায় বিদ্যুৎ তৈরী করা হচ্ছে। কৃষিকাজের পাম্প, ঘরের এবং অনেক অফিসের বাতি, পাখা এগুলি বিদ্যুৎ দ্বারা চালানো হয়। কিছু ক্ষেতে এবং বাড়ির ছাদে এইরূপ বিদ্যুৎ তৈরী করা পাটাতন তোমরা দেখেছ নিশ্চয়ই ? সেগুলিকে **'সোলার প্যানেল'** বলা হয়। অনেক জায়গায় এই পদ্ধতিতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ তৈরী করা হয়। সৌরশক্তি পরিবেশবান্ধব এবং বিনামূল্যে, কোনো দিন শেষ না না হওয়া শক্তি। তাই এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শক্তির উৎস। গত কয়েক বছরে গরম জল পাওয়ার জন্য সোলার হিটার, সোলার স্টোভ, রান্না করার জন্য সোলার কুকারের মতো উপকরণের ব্যবহার বাড়ছে।

সোলার প্যানেল

সৌরশক্তির সাহায্যে চলে এমন বিভিন্ন উপকরণের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করো। সেই উপকরণগুলি কী কাজে ব্যবহৃত হয় তা তোমার বন্ধুদের জানাও।

◉ পবনশক্তি -

পৃথিবীর চারপাশে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুর আবরণ রয়েছে। এর মধ্যে অক্সিজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন এবং অন্যান্য উপাদান থাকে। বাতাস সমস্ত সজীবদের জন্য একটি প্রয়োজনীয় সম্পদ।

কিছু এলাকায় সবসময় বাতাস বয়। এমন জায়গায় বড়ো বড়ো বায়ুকল স্থাপন করা হয়। বাতাসের সাহায্যে বায়ুকলের পাখা ঘোরে। এই শক্তিকে ব্যবহার করে বায়ুকলের সাহায্যে বিদ্যুৎ তৈরী করা যায়। অনেকগুলি বায়ুকল বসিয়ে বড়ো আকারে বিদ্যুৎ তৈরীর প্রকল্পকে **'পবনশক্তি প্রকল্প'** বলা হয়।

মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলার চাড়কেওয়াডিতে একটি বড়ো পবনশক্তি প্রকল্প রয়েছে। এটি এশিয়ার অন্যতম একটি বড়ো প্রকল্প হিসেবে মানা হয়।

◉ বনসম্পদ - বন থেকে আমরা অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস পাই। আসবাবপত্র তৈরীর জন্য কাঠ পাওয়া যায়। নির্দিষ্ট কিছু গাছ কাগজ তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয়, আবার কিছু গাছ ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নতুন রাস্তা তৈরী, নতুন শহর ও কারখানা নির্মাণের জন্য বিগত কয়েক বছরে বিশ্ব জুড়ে প্রচুর বনভূমি উজাড় করা হয়েছে। তখন বন ধ্বংসের পরিণামের কথা বিবেচনা করা হয়নি। বর্তমানে অনেক প্রাণীর আবাসস্থল ধ্বংস হওয়া, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যাওয়ার মতো পরিণাম দেখা দিচ্ছে। এ কারণেই বিশ্বজুড়ে বন বাড়ানোর প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে।

কিছু গাছের ফল, যেমন হরিতকি, বহেড়া, শিকাকাই, আঠা, ভেষজ এমন অনেক উৎপাদ জঙ্গল থেকে পাওয়া যায়। গাছের পাতা, ফুল, মূল এবং ডাল থেকে ঔষধি নির্যাস তৈরী করা হয়, যা থেকে বড়ি ও সিরাপ বানানো হয়। তুলসী নির্যাস, অশ্বগন্ধা, ঘৃতকুমারী, আমলকী, হরিতকি, বহেড়ার মতো অনেক গাছ ঔষধির জন্য ব্যবহৃত হয়।

তোমরা জানো কী ?

ভারতে জঙ্গল ও গাছপালার গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতে জঙ্গল বাঁচানোর জন্য ১৯৭৩ সালে একটি আন্দোলন হয়েছিল। বন ধ্বংসের প্রতিবাদে গৌরাদেবী নামক একজন স্থানীয় মহিলা এবং তার কর্মীরা গাছগুলিকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন,আগে আমাদের কাটো। এই জন্য একে 'চিপকো আন্দোলন' বলা হয়। সুন্দর লাল বহুগুণা এই আন্দোলনকে দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

আজ থেকে প্রায় ২৫০০ বছর আগে ভারতে 'চরক' নামক একজন ঋষি ছিলেন। মানুষের বিভিন্ন রোগ, তার কারণ এবং গাছপালা থেকে তৈরী ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা করার বিষয়ে চরক ঋষি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। সেই জ্ঞান থেকে তিনি চিকিৎসার একটি পদ্ধতি তৈরী করেন, যা 'আয়ুর্বেদ' নামে পরিচিত। চরক ঋষি আয়ুর্বেদের জনক, অর্থাৎ এই পদ্ধতির অন্বেষক। চিকিৎসার এই পদ্ধতি আজও বিশ্বে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

ঔষধি গাছের গুণাগুণ, রোগের চিকিৎসায় সেগুলির ব্যবহার, এই গাছগুলির চাষাবাদ, বিভিন্ন ওষুধ তৈরীর সময় কোন গাছের পরিমাণ কতটুকু হওয়া উচিত এই সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত 'চরকসংহিতা' নামক গ্রন্থটি চরক ঋষি লিখেছিলেন।

তোমার পরিবেশে পাওয়া যায় এমন ঔষধি উদ্ভিদ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করো। তা নিয়ে শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করো।

◉ জীবাশ্ম জ্বালানি – বহু বছর আগে পৃথিবীতে ঘন জঙ্গল, জলাভূমি এবং বিশাল সমুদ্র ছিল। সেই সময়ে মৃত জীবদেহের অবশিষ্টাংশের ওপর কাদা ও বালির স্তর জমতে থাকে। ধীরে ধীরে সেগুলি মাটির অনেক গভীরে চাপা পড়ে যায়। সেখানকার প্রচণ্ড উত্তাপ এবং চাপে লাখ লাখ বছর ধরে সেই অবশিষ্টাংশগুলি কয়লা, পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাসে রূপান্তরিত হয়। যানবাহন এবং শিল্পকারখানা চালানোর জন্য এগুলি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই কারণেই এদের 'জীবাশ্ম জ্বালানি' বলা হয়।

জীবাশ্ম জ্বালানি মূলত তিন প্রকারের হয়: পাথুরে কয়লা, অপরিশোধিত তেল (Crude oil) এবং প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural Gas)। কয়লা প্রাচীন উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশ থেকে তৈরী হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বিভিন্ন শিল্পকারখানায় এটিকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সমুদ্রের তলদেশে এবং মাটির অনেক গভীরে থাকা অপরিশোধিত তেল উত্তোলন করা তেলকূপ কিছু স্থানে রয়েছে। এই তেল থেকে পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন এবং আলকাতরার মতো পদার্থ পাওয়া যায়। পেট্রোল, ডিজেল, প্রাকৃতিকগ্যাস যানবাহনে এবং কিছু যন্ত্রপাতিতে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস হলো মিথেন ও অন্যান্য গ্যাসের মিশ্রণ। রান্নার কাজে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের জ্বালানি হিসেবে এর ব্যবহার করা হয়।

সমুদ্রের তলদেশ থেকে তেল ও গ্যাস প্রাপ্ত করা তেলকূপ

মাটির নীচে এই ধরনের জ্বালানি তৈরী হতে লক্ষ লক্ষ বছর সময় লাগে। বর্তমানে সারা বিশ্বে যে জ্বালানি ব্যবহৃত হচ্ছে, পৃথিবীতে তা লক্ষ লক্ষ বছর আগে তৈরী হয়েছিল। এই জ্বালানিগুলির অত্যধিক ব্যবহারের ফলে বায়ুমণ্ডলে ক্ষতিকারক পদার্থ মিশছে। তাছাড়া, বর্তমান ভাণ্ডার যেকোনো সময় ফুরিয়ে যেতে পারে। তাই এগুলির ব্যবহার ভেবেচিন্তে করা উচিত।

তোমরা জানো কী?

যানবাহনের ইঞ্জিনে জ্বালানি পোড়ানোর ফলে কিছু ক্ষতিকারক গ্যাস তৈরী হয়। যানবাহনের ধোঁয়ার সাথে সেগুলি বাতাসে মিশে যায়। মুম্বাই, পুণে এবং নাগপুরের মতো বড়ো শহরগুলিতে যানজটপূর্ণ এলাকায় বাতাসের মান কেমন, তা দেখানোর জন্য বিশেষ ধরনের বোর্ড লাগানো হয়েছে। এই বোর্ডগুলি থেকে ওই এলাকার বাতাসের ক্ষতিকারক উপাদানের পরিমাণ, তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতার তথ্য পাওয়া যায়।

তোমার পরিবারে এবং আশেপাশে কোনকোন জ্বালানি চালিত যানবাহন আছে? কোন জ্বালানি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়, তা নিয়ে আলোচনা করো।

প্রাকৃতিক সম্পদ তিন প্রকারের হয়। নবীকরণযোগ্য, অনবীকরণযোগ্য এবং শাশ্বত সম্পদ। **নবীকরণযোগ্য সম্পদ** প্রকৃতির সাহায্যে বারবার তৈরী হয়। যেমন - জল, মাটি, ফসল। **অনবীকরণযোগ্য সম্পদ** অর্থাৎ সম্পদ সীমিত আকারে পাওয়া যায় এমন সম্পদ। অনবীকরণযোগ্য সম্পদ পুনরায় তৈরী হতে লক্ষ লক্ষ বছর সময় লাগে, যেমন - পেট্রোল, কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি। সূর্যালোক, বাতাস এবং সমুদ্রের ঢেউ কখনো শেষ হয় না। প্রকৃতিতে সব সময় উপলব্ধ এই সম্পদগুলিকে **'শাশ্বত সম্পদ'** বলা হয়।

আমরা কী শিখলাম ?

- মাটি, জল, সমুদ্র, সূর্য, বাতাস, জঙ্গল এবং জীবাশ্ম জ্বালানির মতো অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে।
- জীবজগতের জন্য জল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৃষ্টির জল, ভূগর্ভস্থ জল, ঝরনা, খাল, পুকুর, নদী ও সমুদ্র হলো জলের উৎস।
- সমুদ্র থেকে আমরা খাদ্য, খনিজ এবং ওষুধ তৈরীর উপযোগী সম্পদ পাই।
- সূর্যের আলো থেকে সৌরশক্তি এবং বাতাস থেকে পবনশক্তি পাওয়া যায়।
- জঙ্গল আমাদের জীবন ধারণের খাদ্য, ওষুধ, আঠা এবং আরও অনেক প্রয়োজনীয় বস্তুর উৎস।
- জীবাশ্ম জ্বালানি মূলত তিন প্রকারের: কয়লা, পেট্রোল/ডিজেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস।
- প্রাকৃতিক সম্পদ তিন প্রকারের: নবীকরণযোগ্য, অনবীকরণযোগ্য এবং শাশ্বত সম্পদ।

অনুশীলনী

(১) সঠিক বিকল্প খুঁজে বাক্যটি পুনরায় লেখো।

(১) .... চাষাবাদের জন্য অধিক উর্বর।

(অ) কালো মাটি (ব) চিনা মাটি (ক) লাল মাটি (ড) মুলতানি মাটি

(২) .... হলো একটি জীবাশ্ম জ্বালানি।

(অ) সূর্যের আলো (ব) বাতাস (ক) পেট্রোল (ড) জল

(৩) .... হলো শাশ্বত শক্তির উৎস।

(অ) কয়লা (ব) পেট্রোল (ক) প্রাকৃতিক গ্যাস (ড) সূর্য

(২) **নীচের বাক্যগুলি সত্য নাকি মিথ্যা তা কারণসহ বলো।**

(১) পৃথিবীতে জল প্রচুর পরিমাণে আছে বলে তা অপচয় করে ব্যবহার করবে।

(২) নবীকরণযোগ্য সম্পদ প্রকৃতিতে বারবার তৈরি হয়।

(৩) পেট্রোল, কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস আমরা সহজে পেয়ে যাই।

(৩) **জোড়া মেলাও।**

সম্পদ (অ)সমূহ	বৈশিষ্ট্য (ব) সমূহ	উদাহরণ (ক) সমূহ
(অ) জীবাশ্ম জ্বালানি	(i) চাষাবাদের জন্য উপযোগী	(১) হলুদ
(ব) সৌর শক্তি	(ii) স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ	(২) ডিজেল
(ক) কালো মাটি	(iii) অনবীকরণযোগ্য	(৩) সৌর কুকার
(ড) ঔষধি উদ্ভিদ	(iv) শাশ্বত সম্পদ	(৪) কাপাস

(৪) **নিম্ন তালিকা পূর্ণ করো।**

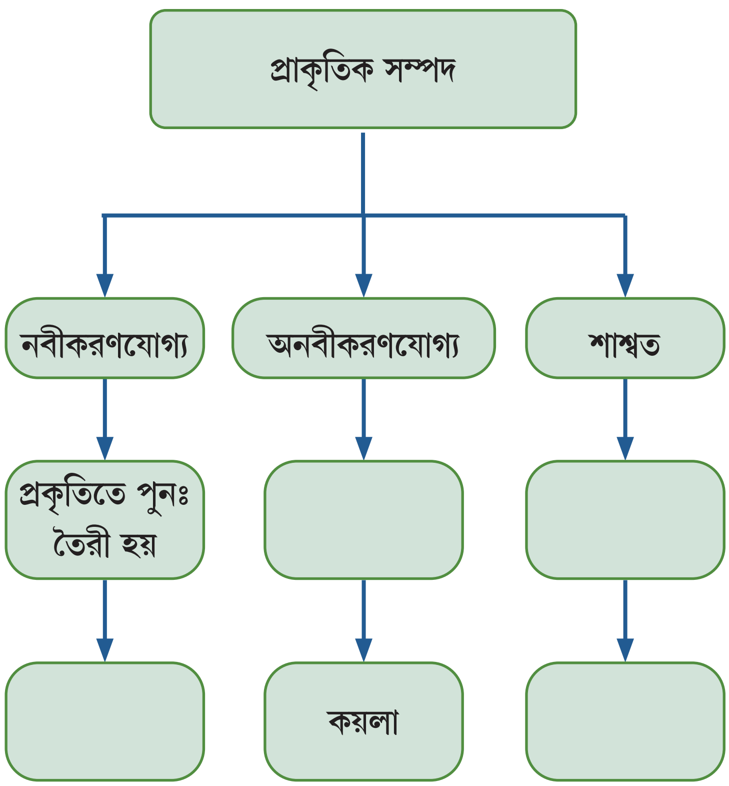

(৫) কারণ দাও।

(১) বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

(২) সৌরশক্তিকে অক্ষয় শক্তির উৎস বলা হয়।

(৩) জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার সাশ্রয়ীভাবে করা উচিত।

(৬) সংক্ষেপে উত্তর লেখো।

(১) জলের গুরুত্ব এবং জলসংরক্ষণের উপায়গুলি লেখো।

(২) প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে কী বোঝায় ?

(৩) সৌরশক্তির লাভ কী কী এবং এই শক্তির ব্যবহার কীভাবে বাড়ানো যায় ?

(৪) সামুদ্রিক সম্পদের প্রকারভেদ এবং মানবজীবনে সেগুলির উপযোগিতা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।

(৭) নবীকরণযোগ্য এবং অনবীকরণযোগ্য শক্তির মধ্যে ভবিষ্যতে আমাদের কোন শক্তি ব্যবহার করা লাভজনক হবে ? কেনো ?

(৮) আশেপাশের গাছপালা ও গুল্ম সংরক্ষণের জন্য এবং তাদের দেখাশোনার জন্য কী করা প্রয়োজন ?

(৯) জীবাশ্ম জ্বালানি শেষ হয়ে গেলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কী প্রভাব পড়বে ? সম্ভাব্য সব পরিণতির একটি তালিকা তৈরী করো।

⦿ উপক্রম -

(১) বিজ্ঞান প্রকল্পের জন্য ছোট সোলার প্যানেল পাওয়া যায়। সেগুলির সাহায্যে কোনো খেলনা, উপকরণ তৈরী করো।

(২) তোমার আশেপাশের ‘ঔষধি উদ্ভিদ এবং তাদের ব্যবহার’ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করো।

(৩) তথ্য সংগ্রহ করো।

ক্লাসের বন্ধুদের তিনটি দলে ভাগ করো। প্রত্যেকটি দলকে আলাদা নাম দাও।

আহার সমূহ - সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত খাদ্য সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করবে।

খনিজ সমূহ - সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন খনিজ পদার্থ সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করবে।

ঔষধ সমূহ - ঔষধ উৎপাদন সহ সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য উপযোগী পদার্থ সম্পর্কে প্রত্যেক দলের প্রাপ্ত তথ্য ক্লাসে উপস্থাপন করবে।

(৪) মাটি দিয়ে কোনো শোভনের ও উপযোগী বস্তু তৈরী করো।

(৫) তোমার ঘর এবং প্রতিবেশী পরিবারগুলি থেকে বিভিন্ন রকমের বীজ সংগ্রহ করা যায়। মাটির গোলার ভেতর বিভিন্ন ধরনের বীজ রেখে শুকানো গোল অর্থাৎ ‘বীজগোলক’। কিছু বন্ধুদের সাথে এমন ধরনের বীজগোলক তৈরী করো। বর্ষাকালে বিদ্যালয়ে, গ্রামের আশেপাশে এগুলি ছড়িয়ে সেখানে জঙ্গল তৈরীর চেষ্টা করো।

সাধারণ বিজ্ঞান - ষষ্ঠ শ্রেণী

প্রায়োগিক কাজ

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এই পূর্ব মাধ্যমিক পর্যায়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়টি আলাদাভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি হয়ে তাদের মধ্যে পরীক্ষণ মূলক দক্ষতা উন্নয়নের প্রতি লক্ষ্য রেখে নীচে প্রায়োগিক কাজের তালিকা দেওয়া হলো। বিদ্যালয়ের স্তরে এই পরীক্ষণগুলি সম্পন্ন করা আবশ্যক।

অ.ক্র.	প্রায়োগিক কাজের নাম
১	তালিকার সাহায্যে মশার জীবনচক্রের ধাপগুলি অধ্যয়ন করা।
২	থার্মোমিটারের সাহায্যে জলের তাপমাত্রা পরিমাপ করা।
৩	পরিমাপক পাত্রের সাহায্যে তরলের আয়তন পরিমাপ করা।
৪	স্প্রিং ব্যালেন্স এর সাহায্যে বিভিন্ন বস্তুর ওজন পরিমাপ করা।
৫	বাষ্পীভবন, পরিস্রবন ও চৌম্বকীয় পৃথকীকরণ পদ্ধতির সাহায্যে মিশ্রণ থেকে উপাদান পৃথক করা।
৬	বিভিন্ন উদ্ভিদের বীজ পর্যবেক্ষণ করে সেগুলির শ্রেণীবিন্যাস করা।
৭	বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সম্ভাব্য দুর্যোগগুলি নিয়ে চিন্তা করে তার প্রতিকারের উপায়গুলি নিয়ে অধ্যয়ন করা।
৮	জলের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে অধ্যয়ন করা।
৯	পদার্থের ঘনত্ব নির্ণয় করা।
১০	স্বচ্ছ, অর্ধস্বচ্ছ এবং অস্বচ্ছ বস্তুর শ্রেণীবিন্যাস করা।
১১	আলোর প্রতিফলনের নিয়মের অধ্যয়ন করা।
১২	বলের বিভিন্ন প্রকারভেদ শনাক্ত করা।
১৩	বায়ুগুলীয় চাপের অস্তিত্ব শনাক্ত করা।
১৪	মাটির বিভিন্ন নমুনার বৈশিষ্ট্য অধ্যয়ন করা।

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা,

যদি কেউ তোমার অনুমতি ছাড়া তোমাকে ছোঁয় অথবা এমনভাবে স্পর্শ করে যাতে তুমি অস্বস্তিকর বা খারাপ অনুভব করো, তাহলে চুপ থেকো না। এমন পরিস্থিতিতে তোমার জন্য নীচের কথাগুলো জানা জরুরি। ...

১. নিজেকে দোষ দিও না।

২. যাদের ওপর তুমি বিশ্বাস করো, তাদেরকে এই ঘটনার কথা বলো।

৩. তুমি POCSO e-box/ পক্সো ই-বক্সের মাধ্যমে তোমার অধিকার রক্ষার জন্য জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনে অভিযোগ জানাতে পারো।

যখন কেউ তোমার অনুমতি ছাড়া স্পর্শ করে, তখন তোমার খারাপ লাগতে পারে। তোমার অস্বস্তি বা ভয় লাগতে পারে। তুমি নিজেকে অসহায় মনে করতে পারো কিন্তু খারাপ লাগার কোনো কারণ নেই যেহেতু এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার জন্য তোমার কোনো দোষ নেই।

এই বোতামটি চাপো।

POCSO e-box এটা NCPCR@gov.in এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

যদি তোমার বয়স ১৮ বছরের কম হয় এবং তুমি কোনো কারণে নিরাপদ বোধ না করো অথবা এধরণের সমস্যাজড়িত ছেলে / মেয়েকে জানো, তাহলে তুমি ১০৯৮ (দশ নয় আট) নম্বরে ফোন করতে পারো। এটা করলে তোমার এবং তোমার বন্ধুর জীবন আরও নিরাপদ হতে পারে।

চাইল্ড লাইন - ১০৯৮ - : এই নম্বরটি ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে এবং এটি একটি জাতীয় হেল্পলাইন নম্বর যা মহিলা এবং শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের সহায়তায় পরিচালিত হয়।

এক উন্নত সমাজের দিকে।
Towards a new dawn

মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে।

सामान्य विज्ञान इयत्ता सहावी (बंगाली माध्यम)

₹ 87.00